চিরায়ত উপন্যাস

# পথের পাঁচালী

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

# পথের পাঁচালী

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

# সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ....4
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ....10
তৃতীয় পরিচ্ছেদ....13
চতুর্থ পরিচ্ছেদ....18
পঞ্চম পরিচ্ছেদ....24
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ....26
সপ্তম পরিচ্ছেদ....33
অষ্টম পরিচ্ছেদ....39
নবম পরিচ্ছেদ....45
দশম পরিচ্ছেদ....51
একাদশ পরিচ্ছেদ....61
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ....67
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ....72
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ....79
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ....87
ষোড়শ পরিচ্ছেদ....97
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ....122
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ....130
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ....147
বিংশ পরিচ্ছেদ....151
একবিংশ পরিচ্ছেদ....158
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ....164
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ....170
চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ....177
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ....183
ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ....193
সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ....198
অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ....217
ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ....226

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ........ 236
একত্রিংশ পরিচ্ছেদ........ 247
দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ........ 260
ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ........ 268
চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ........ 273
পঞ্চস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ........ 281

বল্লারী বালাই

# প্রথম পরিচ্ছেদ

নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের একেবারে উত্তরপ্রান্তে হরিহর রায়ের ক্ষুদ্র কোঠাবাড়ী। হরিহর সাধারণ অবস্থার গৃহস্থ, পৈতৃক আমলের সামান্য জমিজমার আয় ও দু-চার ঘর শিষ্য সেবকের বার্ষিকী প্রণামীর বন্দোবস্ত হইতে সাদাসিধাভাবে সংসার চালাইয়া থাকে।

পূর্বদিন ছিল একাদশী। হরিহরের দূরসম্পর্কীয় দিদি ইন্দির ঠাক্‌রুণ সকালবেলা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া চালভাজার গুঁড়া জলখাবার খাইতেছে। হরিহরের ছয় বৎসরের মেয়েটি চুপ করিয়া পাশে বসিয়া আছে ও পাত্র হইতে তুলিবার পর হইতে মুখে পুরিবার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিমুঠা ভাজার গুঁড়ার গতি অত্যন্ত করুণভাবে লক্ষ্য করিতেছে এবং মাঝে মাঝে ক্রমশূন্যায়মান কাঁসার জামবাটির দিকে হতাশভাবে চাহিতেছে। দু-একবার কি বলি বলি করিয়াও যেন বলিতে পারিল না। ইন্দির ঠাক্‌রুণ মুঠার পর মুঠা উঠাইয়া পাত্র নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া খুকীর দিকে চাহিয়া বলিল, ও মা, তোর জন্যে দুটো রেখে দেলাম না? — ওই দ্যাখো!

মেয়েটি করুণ চোখে বলিল, তা হোক পিতি, তুই খা —

দুটো পাকা বড় বীচে-কলার একটা হইতে আধখানা ভাঙ্গিয়া ইন্দির ঠাক্‌রুণ তাহার হাতে দিল। এবার খুকীর চোখ-মুখ উজ্জ্বল দেখাইল—সে পিসিমার হাত হইতে উপহার লইয়া মনোযোগের সহিত ধীরে ধীরে চুষিতে লাগিল।

ও ঘর হইতে তাহার মা ডাকিল, আবার ওখানে গিয়া ধন্না দিয়ে বসে আছে? উঠে আয় ইদিকে!

ইন্দির ঠাক্‌রুণ বলিল, থাক বৌ — আমার কাছে বসে আছে, ও কিছু করচে না। থাক্ বসে—

তবুও তাহার মা শাসনের সুরে বলিল, না। কেনই বা খাবার সময় ওরকম বসে থাকবে? ওসব আমি পছন্দ করি নে; চলে আয় বল্‌চি উঠে—

খুকী ভয়ে ভয়ে উঠিয়া গেল।

ইন্দির ঠাক্‌রুণের সঙ্গে হরিহরের সম্পর্কটা বড় দূরের। মামার বাড়ীর সম্পর্কে কি রকমের বোন। হরিহর রায়ের পূর্বপুরুষের আদি বাড়ী ছিল পাশের গ্রামে যশড়া-

বিষ্ণুপুর। হরিহরের পিতা রামচাঁদ রায় মহাশয় অল্প-বয়সে প্রথমবার বিপত্নীক হইবার পরে অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত লক্ষ্য করিলেন যে দ্বিতীয়বার তাঁহার বিবাহ দিবার দিকে পিতৃদেবের কোন লক্ষ্যই নাই। বছরখানেক কোনরকমে চক্ষুলজ্জায় কাটাইয়া দেওয়ার পরও যখন পিতার সেদিকে কোন উদ্যম দেখা গেল না, তখন রামচাঁদ মরীয়া হইয়া প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে নানারূপ অস্ত্র ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলেন। দুপুরবেলা কোথাও কিছু নাই, সহজ মানুষ রামচাঁদ আহারাদি করিয়া বিছানায় ছটফট করিতেছেন — কেহ নিকটে বসিয়া কি হইয়াছে জানিতে চাহিলে রামচাঁদ সুর ধরিতেন, তাঁহার আর কে আছে, কে-ই বা আর তাঁহাকে দেখিবে—এখন তাঁহার মাথা ধরিলেই বা কি—ইত্যাদি। ফলে এই নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে রামচাঁদের দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ হয়, এবং বিবাহের অল্পদিন পরে পিতৃদেবের মৃত্যু হইলে যশড়া-বিষ্ণুপুরের বাস উঠাইয়া রামচাঁদ স্থায়ীভাবে এখানেই বসবাস শুরু করেন। ইহা তাঁহার অল্প বয়সের কথা—রামচাঁদ এ গ্রামে আসিবার পর শ্বশুরের যত্নে টোলে সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন, এবং কালে এ অঞ্চলের মধ্যে ভাল পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তবে কোন বিষয়কর্ম কোনদিন তিনি করেন নাই, করার উপযুক্ত তিনি ছিলেন কিনা, সে বিষয়েও ঘোরতর সন্দেহের কারণ আছে। বৎসরের মধ্যে নয় মাস তাঁহার স্ত্রী-পুত্র শ্বশুরবাড়িতেই থাকিত। তিনি নিজে পাড়ার পতিরাম মুখুয্যের পাশার আড্ডায় অধিকাংশ সময় কাটাইয়া দুইবেলা ভোজনের সময় শ্বশুরবাড়ী হাজির হইতেন মাত্র; যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত—পণ্ডিতমশায়, বৌটা ছেলেটা আছে, আখেরটা তো দেখতে হবে? রামচাঁদ বলিতেন—কোন ভাবনা নেই ভায়া, ব্রজো চক্কোত্তির ধানের মরাই-এর তলা কুড়িয়ে খেলেও এখন ওদের দু-পুরুষ হেসে-খেলে কাটবে। পরে তিনি ছক্কা ও পঞ্জুড়ির জোড় কি ভাবে মিলাইলে ঘর ভাঙিতে পারিবেন, তাহাই একমনে ভাবিতেন।

ব্রজ চক্রবর্তীর ধানের মরাই-এর নিত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার আস্থা যে কতটা বে-আন্দাজী ধরনের হইয়াছিল, তাহা শ্বশুরের মৃত্যুর পরে রামচাঁদের বুঝিতে বেশি বিলম্ব হয় নাই। এ গ্রামে তাঁহার জমিজমাও ছিল না, নগদ টাকাও বিশেষ কিছু নয়। দুই চারিটি শিষ্য-সেবক এদিকে ওদিকে জুটিয়াছিল, তাহাদের দ্বারা কোন রকমে সংসার চালাইয়া পুত্রটিকে মানুষ করিতে থাকেন। তাঁহার পূর্বে তাঁহার এক জ্ঞাতি-ভ্রাতার বিবাহ তাঁহার শ্বশুরবাড়ীতেই হয়। তাহারাও এখানেই বাস করিয়াছিল। তাহাদের দ্বারাও রামচাঁদের অনেক সাহায্য হইত। জ্ঞাতি-ভ্রাতার পুত্র নীলমণি রায় কমিসেরিয়েটে চাকরি করিতেন, কিন্তু কর্ম উপলক্ষে তাঁহাকে বরাবর বিদেশে থাকিতে হইত বলিয়া তিনি শেষকালে এখানকার বাস একরূপ উঠাইয়া বৃদ্ধা মাতাকে লইয়া কর্মস্থলে চলিয়া যান। এখন তাঁহাদের ভিটাতে আর কেহ নাই।

শোনা যায়, পূর্বদেশীয় এক নামজাদা কুলীনের সঙ্গে ইন্দির ঠাক্‌রুণের বিবাহ হইয়াছিল। স্বামী বিবাহের পর কালেভদ্রে এ গ্রামে পদার্পণ করিতেন। এক-আধ রাত্রি কাটাইয়া পথের খরচ ও কৌলীন্য সম্মান আদায় করিয়া লইয়া, খাতায় দাগ আঁকিয়া পরবর্তী নম্বরের শ্বশুরবাড়ী অভিমুখে তল্‌পী-বাহক সহ রওনা হইতেন, কাজেই স্বামীকে ইন্দির ঠাক্‌রুণ ভাল মনে করিতেই পারে না। বাপ-মায়ের মৃত্যুর পর ভাই-এর আশ্রয়ে দু-মুঠা অন্ন পাইয়া আসিতেছিল, কপালক্রমে সে ভাইও অল্প বয়সে মারা গেল। হরিহরের পিতা রামচাঁদ অল্প পরেই এ ভিটাতে বাড়ী তুলিলেন এবং সেই সময় হইতেই ইন্দির ঠাক্‌রুণের এ সংসারে প্রথম প্রবেশ। সে সকল আজিকার কথা নহে।

তাহার পর অনেকদিন হইয়া গিয়াছে; শাঁখারীপুকুরে নাল ফুলের বংশের পর বংশ কত আসিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে। চক্রবর্তীদের ফাঁকা মাঠে সীতানাথ মুখুয্যে নতুন কলমের বাগান বসাইল এবং সে সব গাছ আবার বুড়া হইতেও চলিল। কত ভিটায় নতুন গৃহস্থ বসিল। কত জনশূন্য হইয়া গেল, কত গোলোক চক্রবর্তী, ব্রজ চক্রবর্তী মরিয়া হাজিয়া গেল, ইছামতীর চলোর্মি-চঞ্চল স্বচ্ছ জলধারা অনন্ত কালপ্রবাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়া কুটার মত, ঢেউয়ের ফেনার মত, গ্রামের নীলকুঠির কত জন্‌সন টম্‌সন সাহেব, কত মজুরদারকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল!

শুধু ইন্দির ঠাক্‌রুণ এখনও বাঁচিয়া আছে। ১২৪০ সালের সে ছিপ্‌ছিপে চেহারার হাস্যমুখী তরুণী নহে, পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধা, গাল তোব্‌ড়াইয়া গিয়াছে, মাজা ঈষৎ ভাঙিয়া শরীর সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, দূরের জিনিস আগের মত চোখে ঠাহর হয় না, হাত তুলিয়া যেন রৌদ্রের ঝাঁজ হইতে বাঁচাইবার ভঙ্গিতে চোখ ঢাকিয়া বলে, কে আসে? নবীন? বেহারী? না, ও, তুমি রাজু. . . .

এই ভিটারই কি কম পরিবর্তনটা ইন্দির ঠাক্‌রুণের চোখের উপর ঘটিয়া গেল! ঐ ব্রজ চক্রবর্তীর যে ভিটা আজকাল জঙ্গল হইয়া পড়িয়া আছে, কোজাগরী লক্ষ্মী-পূর্ণিমার দিন গ্রামসুদ্ধ লোক সেখানে পাত পাড়িত। বড় চণ্ডীমণ্ডপে কি পাশার আড্ডাটাই বসিত সকালে বিকালে! তখন কি ছিল ঐ রকম বাঁশবন! পৌষ-পার্বণের দিন ঐ ঢেঁকিশালে একমণ চাল কোটা হইত পৌষ-পিঠার জন্য—চোখ বুজিয়া ভাবিলেই ইন্দির ঠাক্‌রুণ সে সব এখনও দেখিতে পায় যে! ঐ রায় বাড়ীর মেজবৌ লোকজন সঙ্গে করিয়া চাল কুটাইতে আসিয়াছেন, ঢেঁকিতে দমাদম পাড় পড়িতেছে, সোনার বাউটি রাঙা হাতে একবার সামনে সরিয়া আসিতেছে আবার পিছাইয়া যাইতেছে, জগদ্ধাত্রীর মত রূপ, তেমনি স্বভাবচরিত্র। নতুন যখন ইন্দির ঠাক্‌রুণ বিধবা হইল, তখন প্রতি দ্বাদশীর দিন প্রাতঃকালে নিজের হাতে জলখাবার গোছাইয়া আনিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া যাইতেন। কোথায় গেল কে! সেকালের আর কেহ বাঁচিয়া নাই যার সঙ্গে সুখদুঃখের দুটো কথা কয়।

তারপর ঐ সংসারে আশ্রয়দাতা রামচাঁদ মারা গেলেন, তাঁর ছেলে হরিহর তো হইল সেদিন। ঘাটের পথে লাফাইয়া লাফাইয়া খেলিয়া বেড়াইত, মুখুয্যেদের তেঁতুল গাছে ডাঁশা তেঁতুল খাইতে গিয়া পড়িয়া হাত ভাঙিয়া দুই-তিন মাস শয্যাগত ছিল; সেদিনের কথা। ধূমধাম করিয়া অল্প বয়সে তাহার বিবাহ হইল— পিতার মৃত্যুর পর দশ বৎসরের নববিবাহিতা পত্নীকে বাপের বাড়ী ফেলিয়া রাখিয়া দেশছাড়া হইয়া গেল। আট দশ বছর প্রায় কোন খোঁজখবর ছিল না—কালেভদ্রে এক-আধখানা চিঠি দিত, কখনো কখনো দু' পাঁচ টাকা বুড়ীর নামে মনি অর্ডার করিয়া পাঠাইত। এই বাড়ী আগুলিয়া কত কষ্টে, কতদিন না খাইয়া প্রতিবেশীর দুয়ারে চাহিয়া চিন্তিয়া তাহার দিন গিয়াছে।

অনেকদিন পরে হরিহর আজ ছয় সাত বৎসর আসিয়া ঘর-সংসার পাতিয়াছে, তাহার একটি মেয়ে হইয়াছে— সেও প্রায় ছয় বৎসরেরটি হইতে চলিল। বুড়ী ভাবিয়াছিল এতদিনে সেই ছেলেবেলার ঘর-সংসার আবার বজায় হইল। তাহার সঙ্কীর্ণ জীবনে সে অন্য সুখ চাহে নাই, অন্য প্রকার সুখ-দুঃখের ধারণাও সে করিতে অক্ষম— আশৈশব-অভ্যস্ত জীবনযাত্রার পুরাতন পথে যদি গতির মোড়টা ঘুরিয়া দাঁড়ায় তাহ হইলেই সে খুশী, তাহার কাছে সেইটাই চরম সুখের কাহিনী।

হরিহরের ছোট্ট মেয়েটাকে সে একদণ্ড চোখের আড়াল করিতে পারে না — তাহার নিজেরও এক মেয়ে ছিল, নাম ছিল তার বিশ্বেশ্বরী। অল্প বয়সেই বিবাহ হয় এবং বিবাহের অল্প পরেই মারা যায়। হরিহরের মেয়ের মধ্যে বিশ্বেশ্বরী মৃত্যুপারের দেশ হইতে চল্লিশ বছর পরে তাহার অনাথা মায়ের কোলে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। চল্লিশ বছরের নিভিয়া-যাওয়া ঘুমন্ত মাতৃত্ব মেয়েটার মুখের বিপন্ন অপ্রতিভ ভঙ্গিতে, অবোধ চোখের হাসিতে—একমুহূর্তে সচকিত আগ্রহে, শেষ-হইতে চলা জীবনের ব্যাকুল ক্ষুধায় জাগিয়া উঠে।

কিন্তু যাহা সে ভাবিয়াছিল তাহা হয় নাই। হরিহরের বৌ দেখিতে টুকটুকে সুন্দরী হইলে কি হইবে, ভারী ঝগড়াটে, তাহাকে তো দুই চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারে না। কোথাকার কে তার ঠিকানা নাই, কি তাহার সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজিয়া মেলে না, বসিয়া বসিয়া অন্নধ্বংস করিতেছে!

সে খুঁটিনাটি লইয়া বুড়ীর সঙ্গে দু' বেলায় ঝগড়া বাধায়। অনেকটা ঝগড়া চলিবার পর বুড়ী নিজস্ব একটি পিতলের ঘটী কাঁখে ও ডান হাতে একটা কাপড়ের পটুলি ঝুলাইয়া বলিত—চল্লাম নতুন বৌ, আর যদি কখনো ও বাড়ীর মাটি মাড়াই, তবে আমার—। বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গিয়া বুড়ী মনের দুঃখে বাঁশবাগানে সারাদিন বসিয়া কাটাইত। বৈকালের দিকে সন্ধান পাইয়া হরিহরের ছোট মেয়েটা তাহার কাছে গিয়া তাহার আঁচল ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিত— ওঠ্ পিতিমা, মাকে বল্‌বো আল্ তোকে বক্

বে না, আয় পিতিমা। তাহার হাত ধরিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে বুড়ী বাড়ী ফিরিত। সর্বজয়া মুখ ফিরাইয়া বলিত, ঐ এলেন! যাবেন আর কোথায়। যাবার কি আর চুলো আছে এই ছাড়া? . . . তেজটুকু আছে এদিকে ষোল আনা!

এ রকম উহারা বাড়ী আসার বৎসর-খানেকের মধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে—বহুবার হইয়া গিয়াছে এবং মাঝে মাঝে প্রায়ই হয়।

হরিহরের পূর্বের ভিটায় খড়ের ঘরখানা অনেকদিন বে-মেরামতি অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই ঘরটাতেই বুড়ী থাকে। একটা বাঁশের আলনায় খান দুই ময়লা ছেঁড়া থান ছেঁড়া জায়গাটার দুই প্রান্ত একসঙ্গে করিয়া গেরো বাঁধা। বুড়ী আজকাল ছুঁচে সুতা পরাইতে পারে না বলিয়া কাপড় সেলাই করিবার সুবিধা নাই, বেশি ছিঁড়িয়া গেলে গেরো বাঁধে। একপাশে একখানা ছেঁড়া মাদুর ও কতকগুলি ছেঁড়া কাঁথা। একটা পুঁট্লিতে রাজ্যের ছেঁড়া কাপড় বাঁধা। মনে হয় কাঁথা বুনিবার উপকরণ স্বরূপ সেগুলি বহুদিন হইতে সযত্নে সঞ্চিত আছে, কখনও দরকার হয় নাই, বর্তমানে দরকার হইলেও কাঁথা বুনিবার মত চোখের তেজ আর তাহার নাই। তবুও সেগুলি পরম যত্নে তোলা থাকে, ভাদ্রমাসে বর্ষার পর রৌদ্র ফুটিলে বুড়ী সেগুলি খুলিয়া মাঝে মাঝে উঠানে রৌদ্রে দেয়। বেতের পেট্‌রাটার মধ্যে একটা পঁটুলি বাঁধা কতকগুলো ছেঁড়া লালপাড় শাড়ী—সেগুলি তাহার মেয়ে বিশ্বেশ্বরীর; একটা পিতলের চাদরের ঘটী, একটা মাটির ছোবা, গোটা দুই মাটির ভাঁড়। পিতলের ঘটীতে চালভাজা ভরা থাকে, রাত্রে হামানদিস্তা দিয়া গুঁড়া করিয়া তাই মাঝে মাঝে খায়। মাটির ভাঁড়গুলার কোনটাতে একটুখানি তেল, কোনটাতে একটু নুন, কোনটাতে সামান্য একটু খেজুরের গুড়। সর্বজয়ার কাছে চাহিলে সব সময় মেলে না বলিয়া বুড়ী সংসার হইতে লুকাইয়া আনিয়া সেগুলি বিবাহের বেতের পেঁট্‌রার মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দেয়।

সর্বজয়া এ ঘরে আসে ক্বচিৎ কালেভদ্রে কখনো। কিন্তু সন্ধ্যার সময় তার মেয়ে ঘরের দাওয়ায় ছেঁড়া-কাঁথা-পাতা বিছানায় বসিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত একমনে পিসিমার মুখে রূপকথা শোনে। খানিকক্ষণ এ গল্প ও গল্প শুনিবার পর খুকী বলে,—পিতি, সেই ডাকাতের গল্পটা বল্ তো! গ্রামের একঘর গৃহস্থবাড়ীতে পঞ্চাশ বছর আগে ডাকাতি হইয়াছিল, সেই গল্প। ইতিপূর্বে বহুবার বলা হইয়া গেলেও কয়েকদিনের ব্যবধানে উহার পুনরাবৃত্তি করিতে হয়, খুকী ছাড়ে না। তাহার পর সে পিসিমার মুখে ছড়া শোনে। সেকালের অনেক ছড়া ইন্দির ঠাক্‌রুণের মুখস্থ ছিল। অল্পবয়সে ঘাটে পথে সমবয়সী সঙ্গিনীদের কাছে ছড়া মুখস্থ বলিয়া তখনকার দিনে ইন্দির ঠাক্‌রুণ কত প্রশংসা আদায় করিয়াছে। তাহার পর অনেক দিন সে এরকম ধৈর্যশীল শ্রোতা পায় নাই; পাছে মরিচা পড়িয়া যায়, এইজন্য তাহার জানা সব ছড়াগুলিই আজকাল প্রতি

সন্ধ্যায় একবার ক্ষুদ্র ভাইঝিটির কাছে আবৃত্তি করিয়া ধার শানাইয়া রাখে। টানিয়া টানিয়া আবৃত্তি করে —

ও ললিতে চাঁপকলিতে একটা কথা শুনসে,
রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে—
এই পর্যন্ত বলিয়া সে হাসি-হাসি মুখে প্রতীক্ষার দৃষ্টিতে ভাইঝির দিকে চাহিয়া থাকে। খুকী উৎসাহের সঙ্গে বলে—চূড়োবাঁধা এক-মিন্‌সে।— 'মি' অক্ষরটার উপরঅকারণ জোর দিয়া ছোট মাথাটি সামনে তাল রাখিবার ভাবে ঝুঁকাইয়া পদটার উচ্চারণ শেষ করে। ভারি আমোদ লাগে খুকীর।
তাহার পিসি ভাইঝিকে ঠকাইবার চেষ্টায় এমন সব ছড়া আবৃত্তি করে ও পদপূরণের জন্য ছাড়িয়া দেয়, যাহা হয়তো দশ পনেরো দিন বলা হয় নাই—কিন্তু খুকী ঠিক মনে রাখে, তাহাকে ঠকানো কঠিন।

খানিক রাত্রে তাহার মা খাইতে ডাকিলে সে উঠিয়া যায়।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হরিহর রায়ের আদি বাসস্থান যশড়া-বিষ্ণুপুরের প্রাচীন ধনী বংশ চৌধুরীরা নিষ্কর ভূমি দান করিয়া যে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণকে সেকালে গ্রামে বাস করাইয়া ছিলেন, হরিহরের পূর্বপুরুষ বিষ্ণুরাম রায় তাহাদের মধ্যে একজন।

বৃটিশ শাসন তখনও দেশে বদ্ধমূল হয় নাই। যাতায়াতের পথ সকল ঘোর বিপদসঙ্কুল ও ঠগী, ঠ্যাঙাড়ে, জলদস্যু প্রভৃতিতে পূর্ণ থাকিত। এই ডাকাতের দল প্রায়ই গোয়ালা, বাগ্‌দী, বাউরী শ্রেণীর লোক। তাহারা অত্যন্ত বলবান — লাঠি এবং সড়কী চালানোতে সুনিপুণ ছিল। বহু গ্রামের নিভৃত প্রান্তে ইহাদের স্থাপিত ডাকাতে-কালীর মন্দিরের চিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। দিনমানে ইহারা ভালমানুষ সাজিয়া বেড়াইত, রাত্রে কালীপূজা দিয়া দূর পল্লীতে গৃহস্থ-বাড়ী লুঠ করিতে বাহির হইত। তখনকার কালে অনেক সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থও ডাকাতি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতেন। বাংলাদেশে বহু জমিদার ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থের অর্থের মূলভিত্তি যে এই পূর্বপুরুষ-সঞ্চিত লুণ্ঠিত ধনরত্ন, যাঁহারাই প্রাচীন বাংলার কথা জানেন, তাঁহারা ইহাও জানেন।

বিষ্ণুরাম রায়ের পুত্র বীরু রায়ের এইরূপ অখ্যাতি ছিল। তাঁহার অধীনে বেতনভোগী ঠ্যাঙাড়ে থাকিত। নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের উত্তরে যে কাঁচা সড়ক ওদিকে চুয়াডাঙা হইতে আসিয়া নবাবগঞ্জ হইয়া টাকী চলিয়া গিয়াছে, ওই সড়কের ধারে দিগন্তবিস্তৃত বিশাল সোনাডাঙ্গার মাঠের মধ্যে, ঠাকুরঝি পুকুর নামক সেকালকার এক বড় পুকুরের ধারে ছিল ঠ্যাঙাড়েদের আড্ডা। পুকুরের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছের তলে তাহারা লুকাইয়া থাকিত এবং নিরীহ পথিককে মারিয়া তাহার যথাসর্বস্ব অপহরণ করিত। ঠ্যাঙাড়েদের কার্যপ্রণালী ছিল অদ্‌ভুত ধরনের। পথ-চলতি লোকের মাথায় লাঠির আঘাত করিয়া আগেই তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া তবে তাহার কাছে অর্থান্বেষণ করিত— মারিয়া ফেলিবার পর এরূপ ঘটনাও বিচিত্র ছিল না যে, দেখা গেল নিহত ব্যক্তির কাছে সিকি পয়সাও নাই। পুকুরের মধ্যে লাশ গুঁজিয়া রাখিয়া ঠ্যাঙাড়েরা পরবর্তী শিকারের উপর দিয়া এ বৃথা শ্রমটুকু পোষাইয়া লইবার আশায় নিরীহমুখে পুকুরপাড়ের গাছতলায় ফিরিয়া যাইত। গ্রামের উত্তরে এই বিশাল মাঠের মধ্যে সেই বটগাছ আজও আছে, সড়কের ধারের একটা অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিকে আজও ঠাকুরঝি পুকুর বলে। পুকুরের বিশেষ চিহ্ন নাই, চৌদ্দ আনা ভরাট্ হইয়া গিয়াছে— ধান আবাদ করিবার সময় চাষীদের লাঙলের ফালে সেই নাবাল জমিটুকু হইতে আজও মাঝে মাঝে নরমুণ্ড উঠিয়া থাকে।

শোনা যায় পূর্বদেশীয় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বালক-পুত্রকে সঙ্গে করিয়া কালীগঞ্জ অঞ্চল হইতে টাকী শ্রীপুরের ওদিকে নিজের দেশে ফিরিতেছিলেন। সময়টা কার্তিক মাসের শেষ, কন্যার বিবাহের অর্থসংগ্রহের জন্য ব্রাহ্মণ বিদেশে বাহির হইয়াছিলেন, সঙ্গে

কিছু অর্থ ও জিনিসপত্র ছিল। হরিদাসপুরের বাজারে চটিতে রন্ধন-আহারাদি করিয়া তাঁহারা দুপুরের কিছু পরে পুনরায় পথে বাহির হইয়া পড়িলেন, ইচ্ছা রহিল যে সম্মুখে পাঁচক্রোশ দূরের নবাবগঞ্জ বাজারের চটিতে রাত্রি যাপন করিবেন। পথের বিপদ তাঁহাদের অবিদিত ছিল না, কিন্তু আন্দাজ করিতে কিরূপ ভুল হইয়াছিল— কার্তিক মাসের ছোট দিন, নবাবগঞ্জের বাজারে পৌঁছিবার অনেক পূর্বে সোনাডাঙ্গা মাঠের মধ্যে সূর্যকে ডুবুডুবু দেখিয়া তঁহারা দ্রুতপদে হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ঠাকুরঝি পুকুরের ধারে আসিতেই তাঁহারা ঠ্যাঙাড়েদের হাতে পড়েন।

দস্যুরা প্রথম ব্রাহ্মণের মাথায় এক ঘা লাঠি বসাইয়া দিতেই তিনি প্রাণভয়ে চীৎকার করিতে করিতে পথ ছাড়িয়া মাঠের দিকে ছুটিলেন, ছেলেও বাবার পিছু পিছু ছুটিল। কিন্তু একজন বৃদ্ধ ঠ্যাঙাড়েদের সঙ্গে কতক্ষণ দৌড়পাল্লা দিবে? অল্পক্ষণেই তাহারা আসিয়া শিকারের নাগাল ধরিয়া ঘেরাও করিয়া ফেলিল। নিরূপায় ব্রাহ্মণ নাকি প্রস্তাব করেন যে, তাঁহাকে মারা হয় ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্রের জীবনদান—বংশের একমাত্র পুত্র—পিণ্ডলোপ ইত্যাদি। ঘটনাক্রমে বীরু রায়ও নাকি সেদিনের দলের মধ্যে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ বলিয়া চিনিতে পারিয়া প্রাণভয়ার্ত বৃদ্ধ তাঁহার হাতে-পায়ে পড়িয়া অন্তত পুত্রটির প্রাণরক্ষার জন্য বহু কাকুতি-মিনতি করেন — কিন্তু সরল ব্রাহ্মণ বুঝেন নাই, তাঁহার বংশের পিণ্ডলোপের আশঙ্কায় অপরের মাথাব্যথা হইবার কথা নহে, বরং তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে ঠ্যাঙাড়ে দলের অন্যরূপ আশঙ্কার কারণ আছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে হতভাগ্য পিতাপুত্রের মৃতদেহ একসঙ্গে ঠাণ্ডা হেমন্ত রাতে ঠাকুরঝি পুকুরের জলে টোকাপানা ও শ্যামাঘাসের দামের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়া বীরু রায় বাটী চলিয়া আসিলেন।

এই ঘটনার বেশী দিন পরে নয়, ঠিক পর বৎসর পূজার সময়। বাংলা ১২৩৮ সাল। বীরু রায় সপরিবারে নৌকাযোগে তাঁহার শ্বশুরবাড়ী হলুদবেড়ে হইতে ফিরিতেছিলেন। নকীপুরের নীচের বড় নোনা গাঙ পার হইয়া মধুমতীতে পড়িবার পর দুই দিনের জোয়ার খাইয়া তবে আসিয়া দক্ষিণ শ্রীপুরের কাছে ইছামতীতে পড়িতে হইত। সেখান হইতে আর দিন-চারেকের পথ আসিলেই স্বগ্রাম।

সারাদিন বাহিয়া আসিয়া অপরাহ্নে টাকীর ঘাটে নৌকা লাগিল। বাড়ীতে পূজা হইত। টাকীর বাজার হইতে পূজার দ্রব্যাদি কিনিয়া রাত্রিতে সেখানে অবস্থান করিবার পর প্রত্যূষে নৌকা ছাড়িয়া সকলে দেশের দিকে রওনা হইলেন। দিন দুই পরে সন্ধ্যার দিকে ধবলচিতের বড় খাল ও ইছামতীর মোহনায় একটা নির্জন চরে জোয়ারের অপেক্ষায় নৌকা লাগাইয়া রন্ধনের যোগাড় হইতে লাগিল। বড় চর, মাঝে মাঝে কাশঝোপ ছাড়া অন্য গাছপালা নাই। একস্থানে মাঝিরা ও অন্যস্থানে বীরু রায়ের স্ত্রী

রন্ধন চড়াইয়াছিলেন। সকলেরই মন প্রফুল্ল, দুইদিন পরেই দেশে পৌঁছানো যাইবে। বিশেষত পূজা নিকটে, সে আনন্দ তো আছেই।

জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। নোনা গাঙের জল চক্‌চক্ করিতেছিল। হু-হু হাওয়ায় চরের কাশফুলের রাশি আকাশ, জ্যোৎস্না, মোহনার জল একাকার করিয়া উড়িতেছিল। হঠাৎ কিসের শব্দ শুনিয়া দু-একজন মাঝি রন্ধন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কাশঝোপের আড়ালে যেন একটা হুটপাট্ শব্দ, একটা ভয়ার্ত কণ্ঠ একবার অস্‌ফুট চীৎকার করিয়া উঠিয়াই তখনি থামিয়া যাইবার শব্দ। কৌতূহলী মাঝিরা ব্যাপার কি দেখিবার জন্য কাশঝোপের আড়ালটা পার হইতে না হইতে কি যেন একটা হুড়ুম করিয়া চর হইতে জলে গিয়া ডুব দিল। চরের সেদিকটা জনহীন— কিছু কাহারও চোখে পড়িল না।

কি ব্যাপার ঘটিয়াছে, কি হইল, বুঝিবার পূর্বেই বাকি দাঁড়ি-মাঝি সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। গোলমাল শুনিয়া বীরু রায় আসিলেন, তাঁহার চাকর আসিল। বীরু রায়ের একমাত্র পুত্র নৌকাতে ছিল, সে কই? জানা গেল রন্ধনের বিলম্ব দেখিয়া সে খানিকক্ষণ আগে জ্যোৎস্নায় চরের মধ্যে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। দাঁড়ি-মাঝিদের মুখ শুকাইয়া গেল, এ দেশের নোনা গাঙ সমূহের অভিজ্ঞতায় তাহারা বুঝিতে পারিল কাশবনের আড়ালে বালির চরে বৃহৎ কুমীর শুইয়া ওৎ পাতিয়া ছিল। ডাঙা হইতে বীরু রায়ের পুত্রকে লইয়া গিয়াছে।

তাহার পর অবশ্য যাহা হয় হইল। নৌকার লগি লইয়া এদিকে ওদিকে খোঁজা-খুঁজি করা হইল, নৌকা ছাড়িয়া মাঝনদীতে গভীর রাত্র পর্যন্ত সকলে সন্ধান করিয়া বেড়াইল— তাহার পর কান্নাকাটি, হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি। গত বৎসর দেশের ঠাকুরঝি পুকুরের মাঠে প্রায় এই সময়ে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, যেন এক অদৃশ্য বিচারক এ বৎসর ইছামতীর নির্জন চরে তাহার বিচার নিষ্পন্ন করিলেন। মূর্খ বীরু রায় ঠেকিয়া শিখিলেন যে সে অদৃশ্য ধর্মাধিকরণের দণ্ডকে ঠাকুরঝি পুকুরের শ্যামাঘাসের দামে প্রতারিত করিতে পারে না, অন্ধকারেও তাহা আপন পথ চিনিয়া লয়।

বাড়ী আসিয়া বীরু রায় আর বেশি দিন বাঁচেন নাই। এইরূপে তাঁহার বংশে এক অদ্‌ভুত ব্যাপারের সূত্রপাত হইল। নিজের বংশ লোপ পাইলেও তাঁহার ভাইয়ের বংশাবলী ছিল। কিন্তু বংশের জ্যেষ্ঠ সন্তান কখনও বাঁচিত না, সাবালক হইবার পূর্বেই কোন-না কোন রোগে মারা যাইত। সকলে বলিল, বংশে ব্রহ্মশাপ ঢুকিয়াছে। হরিহর রায়ের মাতা তারকেশ্বর দর্শনে গিয়া এক সন্ন্যাসীর কাছে কাঁদাকাটা করিয়া একটি মাদুলি পান। মাদুলির গুণেই হৌক বা ব্রহ্মশাপের তেজ দুই পুরুষ পরে কর্পূরের মত উবিয়া যাওয়ার ফলেই হৌক, এত বয়সেও হরিহর আজও বাঁচিয়া আছে।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দিন কতক পরে।

খুকী সন্ধ্যার পর শুইয়া পড়িয়াছিল। বাড়ীতে তাহার পিসীমা নাই, অদ্য দুই মাসের উপর হইল একদিন তাহার মায়ের সঙ্গে কি ঝগড়া-ঝাঁটি হওয়ার পর রাগ করিয়া দূর গ্রামে কোন এক আত্মীয়বাড়ীতে গিয়া আছে। মায়েরও শরীর এতদিন বড় অপটু ছিল বলিয়া তাহাকে দেখিবারও কোন লোক নাই। সম্প্রতি মা কাল হইতে আঁতুড় ঘরে ঢোকা পর্যন্ত সে কখন খায় কখন শোয় তাহা কেহ বড় দেখে না।

খুকী শুইয়া শুইয়া যতক্ষণ পর্যন্ত ঘুম না আসিল, ততক্ষণ পিসিমার জন্য কাঁদিল। রোজ রাত্রে সে কাঁদে। তাহার পর খানিক রাত্রে কাহাদের কথাবার্তা শুনিয়া জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, কুড়নীর মা দাই রান্নাঘরের ছেঁচতলায় দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে, পাড়ার নেড়ার ঠাকুরমা, আরও কে কে উপস্থিত আছেন। সকলেই যেন ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন। খুকী খানিকটা জাগিয়া থাকিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

বাঁশবনে হাওয়া লাগিয়া শির্‌শির শব্দ হইতেছে, আঁতুড় ঘরে আলো জ্বলিতেছে ও কাহারা কথাবার্তা কহিতেছে। দাওয়ায় জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু পরে সে ঘুমাইয়া পড়িল। খানিক রাত্রে ঘুমের ঘোরে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ ও গোলমাল শুনিয়া আবার তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাহার বাবা ঘর হইতে বাহির হইয়া আঁতুড় ঘরের দিকে দৌড়িয়া ব্যস্তভাবে বলিতে বলিতে যাইতেছে— কেমন আছে খুড়ী? কি হয়েচে? আঁতুড় ঘরের ভিতর হইতে কেমন ধরণের গলার আওয়াজ সে শুনিতে পাইল। গলার আওয়াজটা তার মায়ের। অন্ধকারের মধ্যে ঘুমের ঘোরে সে কিছু বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। তাহার কেমন ভয়-ভয় করিতেছিল। মা ও-রকম করিতেছে কেন? কি হইয়াছে মায়ের?

সে আরও খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া শুইয়া পড়িল এবং একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িল। কতক্ষণ পরে সে জানে না — কোথায় যেন বিড়াল ছানার ডাকে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। চট করিয়া তাহার মনে পড়িল পিসিমার ঘরের দাওয়ায় ভাঙা উনুনের মধ্যে মেনী বিড়ালের ছানাগুলো সে বৈকালবেলা লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে — ছোট তুলতুলে ছানা কয়টি, এখনও চোখ ফুটে নাই। ভাবিল — ঐ যাঃ- ওদের হুলো বেড়ালটা এসে বাচ্চাগুলোকে সব খেয়ে ফেললে . . . . ঠিক্।

ঘুমচোখে উঠিয়া তাড়াতাড়ি সে অন্ধকারের মধ্যে পিসিমার দাওয়ায় গিয়া উনুনের মধ্যে হাত পুরিয়া দেখিল বাচ্চা কয়টি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছে। হুলো বেড়ালের

কোন চিহ্ন নাই কোনও দিকে। পরে সে অবাক্ হইয়া আসিয়া শুইয়া পড়িল এবং একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমের ঘোরে আবার কিন্তু কোথায় বিড়ালছানা ডাকিতেছিল।

পরদিন উঠিয়া সে চোখ মুছিতেছে, কুড়নীর মা দাই বলিল, ও খুকী, কাল রাত্তিরে তোমার একটা ভাই হয়েচে দেখবা না? ওমা, কাল রাত্তিরে এত চেঁচামেচি, এত কাণ্ড হয়ে গেল— কোথায় ছিলে তুমি? যা কাণ্ড হয়েলো, কালপুরের পীরির দরগায় সিন্নি দেবানে— বড্ডো রক্ষে করেছেন রাত্তিরে।

খুকী এক দৌড়ে ছুটিয়া আঁতুড় ঘরের দুয়ারে গিয়া উঁকি মারিল। তাহার মা আঁতুড়ের খেজুর পাতার বেড়ার গা ঘেঁষিয়া শুইয়া ঘুমাইতেছে। একটি টুকটুকে অসম্ভব রকমের ছোট্ট, প্রায় একটা কাচের বড় পুতুলের চেয়ে কিছু বড় জীব কাঁথার মধ্যে শুইয়া— সেটিও ঘুমাইতেছে। গুলের আগুনের মন্দ মন্দ ধোঁয়ায় ভালো দেখা যায় না। সে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতেই জীবটা চোখ মেলিয়া মিট্‌মিট্ করিয়া চাহিয়া অসম্ভব রকমের ছোট্ট হাত দুটি নাড়িয়া নিতান্ত দুর্বলভাবে অতি ক্ষীণ সুরে কাঁদিয়া উঠিল। এতক্ষণ পরে খুকী বুঝিল রাত্রিতে বিড়ালছানার ডাক বলিয়া যাহা মনে করিয়াছিল তাহা কি। অবিকল বিড়ালছানার ডাক— দূর হইতে শুনিলে কিছু বুঝিবার জো নাই। হঠাৎ অসহায়, অসম্ভব রকমের ছোট্ট নিতান্ত ক্ষুদে ভাইটির জন্য দুঃখে, মমতায়, সহানুভূতিতে খুকীর মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নেড়ার ঠাকুরমা ও কুড়নীর মা দাই বারণ করাতে সে ইচ্ছা সত্ত্বেও আঁতুড় ঘরে ঢুকিতে পারিল না।

মা আঁতুড় হইতে বাহির হইলে খোকার ছোট্ট দোলাতে দোল দিতে দিতে খুকী কত কি ছড়া গান করে। সঙ্গে সঙ্গে কত সন্ধ্যাদিনের কথা, পিসিমার কথা মনে আসিয়া তাহার চোখ জলে ভিজিয়া যায়। এই রকমের কত ছড়া যে পিসিমা বলিত! খোকা দেখিতে পাড়ার লোক ভাঙ্গিয়া আসে। সকলে দেখিয়া বলে, ঘর-আলো-করা খোকা হয়েছে, কি মাথায় চুল, কি রং! বলাবলি করিতে করিতে যায় — কি হাসি দেখেচ ন'দি?

খুকী কেবল ভাবে, তাহার পিসিমা একবার যদি আসিয়া দেখিত! সবাই দেখিতেছে, আর তাদের পিসিমাই কোথায় গেল চলিয়া— আর কখনো ফিরিয়া আসিবে না? সে ছেলেমানুষ হইলেও এটুকু বুঝিয়াছে যে, এ বাড়ীতে বাবা কি মা কেহই পিসিমাকে ভালবাসে না, তাহাকে আনিবার জন্য কেহ গা করিবে না। দিনমানে পিসির ঘরের দিকে চাহিলে মন কেমন করে, ঘরের কবাটটা এক এক দিন খোলাই পড়িয়া থাকে। দাওয়ায় চামচিকার নাদি জমিয়াছে। উঠানে সে-রকম আর ঝাঁট পড়ে না, এখানে শেওড়ার চারা, ওখানে কচু গাছ — পিসিমা বুঝি হইতে দিত? খুকীর বড় বড় চোখ জলে ভরিয়া যায় — সেই ছড়া, সেই সব গল্প খুকী কি করিয়া ভোলে।

সেদিন হরি পালিতের মেয়ে আসিয়া তাহার মাকে বলিল, তোমাদের বুড়ী ঘাটের পথে দেখি মাঠের দিক থেকে একটা ঘটী আর পুঁটুলি হাতে করে আসছে— এসে চক্কোত্তি মশায়দের বাড়ীতে ঢুকে বসে আছে, যাও দুগ্‌গাকে পাঠিয়ে দাও, হাত ধরে ডেকে আনুক, তাহা' লে রাগ পড়বে এখন—

হরি পালিতেরই বাড়ী বসিয়া বুড়ী তখন পাড়ার মেয়েদের মুখে হরিহরের ছেলে হওয়ার গল্প শুনিতেছিল।

ও পিতি!

বুড়ী চমকিয়া চাহিয়া দেখিল দুর্গা হাঁপাইতেছে, যেন অত্যন্ত ছুটিয়া আসিয়াছে। বুড়ী ব্যগ্রভাবে দুর্গাকে হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেল— সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা ঝাঁপাইয়া বুড়ীর কোলে পড়িল— তাহার মুখে হাসি অথচ চোখে জল — উঠনে ঝি-বউ যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, অনেকের চোখে জল আসিল। প্রবীণা হরি পালিতের স্ত্রী বলিলেন— নেও ঠাকুরঝি, ও তোমার আর জন্মে মেয়ে ছিল, সেই মেয়েই তোমার আবার ফিরে এসেছে—

বাড়ী আসিলে খোকাকে দেখিয়া তো বুড়ী হাসিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। কতদিন পরে ভিটায় আবার চাঁদ উঠিয়াছে।

বুড়ী সকালে উঠিয়া মহা খুশীতে ভিতর উঠান ঝাঁট দেয়। আগাছার জঙ্গল পরিষ্কার করে। দুর্গার মনে হয় এতদিন আবার সংসারটা যেন ঠিকমত চলিতেছে, এতদিন যেন কেমন ঠিক ছিল না।

দুপুরে আহার করিয়া বুড়ী খিড়কির পিছনে বাঁশবনের উপর বসিয়া কঞ্চি কাটে। সেদিকে আর নদীর ধার পর্যন্ত লোকজনের বাস নাই, নদী অবশ্য খুব নিকটে নয়, প্রায় একপোয়া পথ— এই সমস্তটা শুধু বড় বড় আমবাগান ও ঝুপসি বাঁশবন ও অন্যান্য জঙ্গল। কঞ্চি কাটার সময় দুর্গা আসিয়া কাছে বসে, আবোল-তাবোল বকে। ছোট এক বোঝা কাটা কঞ্চি জড়ো হইলে দুর্গা সেগুলি বহিয়া বাড়ীর মধ্যে রাখিয়া আসে। কঞ্চি কাটিতে কাটিতে মধ্যাহ্নের অলস আমেজে শীতল বাঁশবনের ছায়ায় বুড়ীর নানা কথা মনে আসে।

সেই কতকাল আগের কথা সব!

সেই তিনি বার তিনেক আসিয়াছিলেন — স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। একবার তিনি পুঁটুলির মধ্যে কি খাবার আনিয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বরী তখন দুই বৎসরের। সকলে বলিল,

ওলা-চিনির ডেলার মত। ঘটীর জলে গুলিয়া সেও একটু খাইয়াছিল। সেই একজন লোক আসিল — পুরানো সেই পেয়ারা গাছটার কাছে ঠিক সন্ধ্যার সময় আসিয়া দাঁড়াইল, শ্বশুরবাড়ীর দেশ হইতে আসিয়াছে, একখানা চিঠি। চিঠি পড়িবার লোক নাই, ভাই গোলোকও পূর্ব বৎসর মারা গিয়াছে— ব্রজকাকার চণ্ডীমণ্ডপে পাশার আড্ডায় সে নিজে পত্তরখানা লইয়া গেল। সেদিনের কথা আজ স্পষ্ট মনে হয় — ন-জ্যেঠা, মেজ জ্যেঠা, ব্রজ কাকা, ও-পাড়ার পতিত রায়ের ভাই যদু রায়, আর ছিল গোলোকের সম্বন্ধী ভজহরি। পত্তর পড়িলেন সেজ জ্যেঠা। অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— কে আনলে এ চিঠি রে ইন্দর? তাহার পর ইন্দির ঠাক্‌রুণকে বাড়ী আসিয়া তখনই হাতের নোয়া ও প্রথম যৌবনের সাধের জিনিস বাপ-মায়ের দেওয়া রূপার পৈছেজোড়া খুলিয়া রাখিয়া কপালের সিঁদূর মুছিয়া নদীতে স্নান করিয়া আসিতে হইল। কত কালের কথা — সে সব স্বপ্ন হইয়া গিয়াছে, তবু যেন মনে হয় সেদিনের . . . . .!

নিবারণের কথা মনে হয়— নিবারণ, নিবারণ! ব্রজ কাকার ছেলে নিবারণ। ষোল বৎসরের বালক, কি টক্‌টকে গায়ের রং, কি চুল! ঐ চণ্ডীমণ্ডপের পোতা জঙ্গলে ঢাকা পড়িয়া আছে, বাঁশবনের মধ্যে—ওই ঘরে সে কঠিন জ্বররোগে শয্যাগত হইয়া যায়-যায় হইয়াও দুই-তিন-দিন রহিল। আহা, বালক সর্বদা জল জল করিত কিন্তু ঈশান কবিরাজ জল দিতে বারণ করিয়াছিলেন— মৌরীর পুঁটুলি একটু করিয়া চুষানো হইতেছিল। নিবারণ চতুর্থ দিন রাতে মারা গেল, মৃত্যুর একটু আগেও সেই জল জল তার মুখে বুলি—তবুও একবিন্দু জল তাহার মুখে ঠেকানো হয় নাই। সেই ছেলে মারা যাওয়ার পর পাঁচদিনের মধ্যে বড় খুড়ীর মুখে কেউ জল দেওয়াইতে পারে নাই— পাঁচদিনের পর ভাশুর রামচাঁদ চক্কোত্তি নিজে ভ্রাতৃবধূর ঘরে গিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন, তুই চলে গেলে আমার কি দশা হবে? এ বুড়ো বয়সে কোথায় যাব মা? বড় খুড়ী বনিয়াদী ধনী ঘরের মেয়ে ছিলেন — জগদ্ধাত্রীর মত রূপ, অমন রূপসী বধূ এ অঞ্চলে ছিল না। স্বামীর পাদোদক না খাইয়া কখনও জল খান নাই — সেকালের গৃহিণী, রন্ধন করিয়া আত্মীয়পরিজনকে খাওয়াইয়া নিজে তৃতীয় প্রহরে সামান্য আহার করিতেন। দান-ধ্যানে, অন্ন-বিতরণে ছিলেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। লোককে রাঁধিয়া খাওয়াইতে বড় ভালবাসিতেন। তাই ভাশুরের কথায় মনের কোমল স্থানে বুঝি ঘা লাগিল— তাহার পর তিনি উঠিয়াছিলেন ও জলগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু বেশীদিন বাঁচেন নাই, পুত্রের মৃত্যুর দেড় বৎসরের মধ্যেই তিনিও পুত্রের অনুসরণ করেন।

একটু জল দে মা— এতটুকু দে —

জল খেতে নেই, ছিঃ বাবা—কবরেজ মশায় যে বারণ করেচেন—জল খায় না—

এতটুকু দে — এক ঢোঁক খাই মা—পায়ে পড়ি ......

দুপুরের পাখ্‌পাখালির ডাকে সুদূর পঞ্চাশ বছরের পার হইতে বাঁশের মর্ মর্ শব্দ কানে ভাসিয়া আসে।

খুকী বলে — পিতি, তোর ঘুম নেগেচে? আয় শুবি চল।

হাতের দা-খানা রাখিয়া বুড়ী বলে — ওই দ্যাখো, আবার পোড়া ঝিমুনি ধরেছে— অবেলায় এখন আর শোবো না মা— এইগুলো সাঙ্গ করে রাখি — নিয়েআয়দিকি ঐ বড় আগালেডা?

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

খোকা প্রায় দশ মাসের হইল। দেখিতে রোগা রোগা গড়ন, অসম্ভব রকমের ছোট্ট মুখখানি। নিচের মাড়িতে মাত্র দু'খানি দাঁত উঠিয়াছে। কারণে অকারণে যখন-তখন সে সেই দু'খানি মাত্র দুধে-দাঁতওয়ালা মাড়ি বাহির করিয়া হাসে। লোকে বলে—বৌমা, তোমার খোকার হাসিটা বায়না করা। খোকাকে একটুখানি ধরাইয়া দিলে আর রক্ষা নাই, আপনা হইতে পাগলের মত এত হাসি শুরু করিবে যে, তাহার মা বলে—আচ্ছা খোকন, আজ থামো, বড্ড হেসেচো, আজ বড্ড হেসেচো— আবার কালকের জন্যে একটু রেখে দাও। মাত্র দুইটি কথা সে বলিতে শিখিয়াছে! মনে সুখ থাকিলে মুখে বলে জে- জে- জে- জে এবং দুধে-দাঁত বাহির করিয়া হাসে। মনে দুঃখ হইলে বলে, না-না-না- না ও বিশ্রী রকমের চীৎকার করিয়া কাঁদিতে শুরু করে। যাহা সামনে পায়, তাহারই উপর ঐ নতুন দাঁত দু'খানির জোর পরখ করিয়া দেখে— মাটির ঢেলা, এক টুকরা কাঠ, মায়ের আঁচল; দুধ খাওয়াইতে বসিলে এক এক সময় সে হঠাৎ কাঁসার ঝিনুকখানাকে মহা আনন্দে নতুন দাঁত দু'খানি দিয়া জোরে কামড়াইয়া ধরে। তাহার মা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলে — ওকি, হাঁরে ও খোকা, ঝিনুকখানাকে কামড়ে ধল্লি কেন? — ছাড় – ছাড়– ওরে করিস কি– দু'খানা দাঁত তো তোর মোটে সম্বল — ভেঙে গেলে হাসবি কি করে শুনি? খোকা তবুও ছাড়ে না। তাহার মা মুখের ভিতর আঙুল দিয়া অতিকষ্টে ঝিনুকখানাকে ছাড়াইয়া লয়।

খুকীর উপর সব সময় নির্ভর করিয়া থাকা যায় না বলিয়া রান্নাঘরের দাওয়া খানিকটা উঁচু করিয়া বাঁশের বাখারি দিয়া ঘিরিয়া তাহার মধ্যে খোকাকে বসাইয়া রাখিয়া তাহার মা নিজের কাজ করে। খোকা কাটরার মধ্যে শুনানি হওয়া ফৌজদারী মামলার আসামীর মত আটক থাকিয়া কখনো আপন মনে হাসে, অদৃশ্য শ্রোতাগণের নিকট দুর্বোধ্য ভাষায় কি বকে, কখনো বাখারির বেড়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাঁশবনের দিকে চাহিয়া থাকে। তাহার মা ঘাট হইতে স্নান করিয়া আসিলে—মায়ের ভিজে কাপড়ের শব্দ পাইতেই খোকা খেলা হইতে মুখ তুলিয়া এদিক-ওদিক চাহিতে থাকে ও মাকে দেখিতে পাইয়া একমুখ হাসিয়া বাখারির বেড়া ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। তার মা বলে—একি, ওমা, এই কাজল পরিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়ে গেলাম, একেবারে হাঁড়িচাচা পাখী সেজে বসে আছে? দেখি, এদিকে আয়। জোর করিয়া নাকমুখ রগড়াইয়া কাজল উঠাইতে গিয়া খোকার রাঙা মুখ একেবারে সিঁদুর হইয়া যায়— মহা আপত্তি করিয়া রাগের সহিত বলে জে–জে–জে– জে, তাহার মা শোনে না।

ইহার পর মায়ের হাতে গামছা দেখিলেই খোকা খল্বল্ করিয়া হামাগুড়ি দিয়া একদিকে ছুটিয়া পলাইতে যায়, এক একদিন ঘাট হইতে আসিয়া সর্বজয়া বলে— খোকন বলে টু-উ-উ! দোলো তো খোকা? দোলে দোলে খোকন দোলে–! খোকা অমনি

বসিয়া পড়িয়া সামনে পিছনে বেজায় দুলিতে থাকে ও মনের সুখে ছোট্ট হাত দুটি নাড়িয়া গান ধরে—

(গীত)

জে–এ–এ–জে–জে –জে – এ – এ – ই
জে– জে– জে –জে – এ
জে – জে– জে – জে– জে—
তার মা বলে, আচ্ছা থামো আর দুলো না খোকা, হয়েচে, হয়েচে, খুব হয়েচে। কখনো কখনো কাজ করিতে করিতে সর্বজয়া কান পাতিয়া শুনিত, খোকার বেড়ার ভিতর হইতে কোন শব্দ আসিতেছে না— যেন সে চুপ করিয়া গিয়াছে! তাহার বুক ধড়াস্ করিয়া উঠিত — শেয়ালে নিয়ে গেল না তো? সে ছুটিয়া আসিয়া দেখিত খোকা সাজি উপুড়-করা একরাশ চাঁপা ফুলের মত মাটির উপর বে-কায়দায় ছোট্ট হাতখানি রাখিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, চারিদিক হইতে নাল্‌সে পিঁপড়ে, মাছি ও সুড়সুড়ি পিঁপড়ের দল মহালোভে ছুটিয়া আসিতেছে, খোকার পাতলা পাতলা রাঙা ঠোঁট দুটা ঘুমের ঘোরে যেন একটু একটু কাঁপিতেছে, ঘুমের ঘোরে সে যেন মাঝে মাঝে ঢোঁক গিলিয়া জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলিতেছে— যেন জাগিয়া উঠিল, আবার তখনই এমন ঘুমাইয়া পড়িতেছে যে নিশ্বাসের শব্দটিও পাওয়া যাইতেছে না।
সকাল হইতে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা হইতে অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাহাদের বাঁশবাগানের ধারে নির্জন বাড়ীখানি দশ মাসের শিশুর অর্থহীন আনন্দ-গীতি ও অবোধ কলহাস্যে মুখরিত থাকে।

মা ছেলেকে স্নেহ দিয়া মানুষ করিয়া তোলে, যুগে যুগে মায়ের গৌরবগাথা তাই সকল জনমনের বার্তায় ব্যক্ত। কিন্তু শিশু যা মাকে দেয়, তাই কি কম? সে নিঃস্ব আসে বটে, কিন্তু তার মন-কাড়িয়া-লওয়া হাসি, শৈশবতারল্য, চাঁদ ছানিয়া গড়া মুখ, আধ আধ আবোল-তাবোল বকুনির দাম কে দেয়? ওই তার ঐশ্বর্য, ওরই বদলে সে সেবা নেয়, রিক্ত হাতে ভিক্ষুকের মত নেয় না। এক একদিন যখন হরিহর বাজারের হিসাব কি নিজের লেখা লইয়া ব্যস্ত আছে — সর্বজয়া ছেলেকে লইয়া গিয়া বলে, ওগো, ছেলেটাকে একটু ধরো না? মেয়েটা কোথায় বেরিয়েছে—ঠাকুরঝি গিয়েছে ঘাটে… ধরো দিকি একটু! আমি নাইবো, না, ছেলে ঘাড়ে করে বসে থাকলেই হবে? হরিহর বলে — উঁহু, ওসব গোলমাল এখন এখানে নিয়ে এসো না, বড় ব্যস্ত। সর্বজয়া রাগিয়া ছেলেকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। হরিহর হিসাবপত্র লিখিতে লিখিতে হঠাৎ দেখে ছেলে তার চটিজুতার পাটিটা মুখে দিয়া চিবাইতেছে! হরিহর জুতাখানা কাড়িয়া লইয়া বলে—আঃ দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আছি একটা কাজ নিয়ে!

হঠাৎ একটা চড়াই পাখী আসিয়া রোয়াকের ধারে বসে। খোকা বাবার মুখের দিকে চাহিয়া অবাক্ হইয়া সেদিকে দেখাইয়া হাত নাড়িয়া বলে –জে–জে–জে–জে–

হরিহরের বিরক্তি দূর হইয়া গিয়া ভারি মমতা হয়।

অনেক দিন আগের এক রাত্রির কথা মনে পড়ে।

নতুন পশ্চিম হইতে আসিয়া সেদিন সে গ্রামের সকলের পরামর্শে শ্বশুরবাড়ী স্ত্রীকে আনিতে গিয়াছিল। দুপুরের পর শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের ঘাটে নৌকা পৌঁছিল। বিবাহের পর একটিবার মাত্র সেখানে আসিয়াছিল, পথঘাট মনে ছিল না, লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া সে শ্বশুরবাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার ডাকাডাকিতে একটি গৌরাঙ্গী ছিপছিপে চেহারার তরুণী কে ডাকিতেছে দেখিবার জন্য বাহিরের দরজায় দাঁড়াইল এবং তাহার সহিত চোখাচোখি হওয়াতে সেখান হইতে চট্ করিয়া সরিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল— হরিহর ভাবিতে লাগিল, মেয়েটি কে? তাহার স্ত্রী নয় তো? সে কি এত বড় হইয়াছে?

রাত্রিতে সন্ধান মিলিল। সর্বজয়া দারিদ্র্য হইতে রক্ষিত তাহার মায়ের একখানা লালপাড় মট্কা শাড়ী পরিয়া অনেক রাত্রে ঘরে আসিল। হরিহর চাহিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইল। দশ বৎসর আগেকার সে বালিকাপত্নীর কিছুই আর এই সুন্দরী তরুণীতে নাই — কে যেন ভাঙ্গিয়া নতুন করিয়া গড়িয়াছে। মুখের সে কচিভাবটুকু আর নাই বটে, কিন্তু তাহার স্থানে যে সৌন্দর্য ফুটিয়াছে তাহা যে খুব সুলভ নহে হরিহরের সেটুকু বুঝিতে দেরি হইল না। হাত-পায়ের গঠন, গতিভঙ্গি সবই নিখুঁত ও নতুন।

ঘরে ঢুকিয়া সর্বজয়া প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল। যদিও সে বড় হইয়াছে, এ পর্যন্ত স্বামীর সহিত দেখা একরূপ ঘটে নাই বলিলেই চলে। নববিবাহিতার সে লজ্জাটুকু তাহাকে যেন নতুন করিয়া পাইয়া বসিল। হরিহরই প্রথমে কথা কহিল। স্ত্রীর ডানহাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বিছানায় বসাইয়া বলিল — ব' সো এখানে, ভাল আছো?

সর্বজয়া মৃদু হাসিল। লজ্জাটা যেন কিছু কাটিয়া গেল। বলিল — এতদিন পরে বুঝি মনে পড়লো? আচ্ছা, কি বলে এতদিন ডুব মেরে ছিলে? পরে সে হাসিয়া বলিল— কেন, কি দোষ করেছিলাম বলো তো?

স্ত্রীর কথাবার্তায় আজ পাড়াগাঁয়ের টান ও ভঙ্গিটুকু হরিহরের নতুন ও ভারি মিষ্ট বলিয়া মনে হইল। পরে সে লক্ষ্য করিয়া দেখিল স্ত্রীর হাতে কেবল গাছকয়েক কড় ও কাঁচের

চুড়ি ছাড়া অন্য কোন গহনা নাই। গরিব ঘরের মেয়ে, দিবার কেহ নাই, এতদিন খবর না লইয়া ভারি অন্যায় করিয়াছে সে। সর্বজয়াও চাহিয়া স্বামীকে দেখিতে ছিল। আজ সারাদিন সে চারি-পাঁচ বার আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিয়াছে— স্বাস্থ্যময় যৌবন হরিহরের সুগঠিত শরীরের প্রতি অঙ্গে যে বীরের ভঙ্গি আনিয়া দিয়াছে, তাহা বাংলাদেশের পল্লীতে সচরাচর চোখে পড়ে না। বাপমায়ের কথাবার্তায় আজ সে শুনিয়াছে তাহার স্বামী পশ্চিম হইতে নাকি খুব লেখাপড়া শিখিয়া আসিয়াছে, টাকাকড়ির দিক হইতেও দু'পয়সা না আনিয়াছে এমন নয়। এতদিনে তাহার দুঃখ ঘুচিল, ভগবান বোধ হয় এতদিনে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। সকলেই বলিত স্বামী তাহার সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে — আর কখনো ফিরিবে না। মনে-প্রাণে একথা বিশ্বাস না করিলেও স্বামীর পুনরাগমন এতকাল তাহার কাছে দুরাশার মতই ঠেকিয়াছে। কত রাত্রি দুশ্চিন্তায় জাগিয়া কাটাইয়াছে, গ্রামের বিবাহ উপনয়নের উৎসবে ভাল করিয়া যোগ দিতে পারে নাই— সকলেই আহা বলে, গায়ে পড়িয়া সহানুভূতি জানায়; অভিমানে তাহার চোখে জল আসিত—অনাবিল যৌবনের সোনালী কল্পনা এতদিন শুধু আড়ালে আবডালে নির্জন রাত্রিতে চোখের জলে ঝরিয়া পড়িয়াছে, কাহারও কাছে মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করে নাই, কিন্তু বসিয়া বসিয়া কতদিন ভাবিত— এই তো সংসারের অবস্থা, যদি সত্যসত্যই স্বামী ফিরিয়া না আসে, তবে বাপমায়ের মৃত্যুর পরে কোথায় দাঁড়াইবে—কে আশ্রয় দিবে?

এতদিনে কিনারা মিলিল।

হরিহর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল — আচ্ছা, আমাকে যখন তুমি ওবেলা দরজার বাইরে দেখলে—তখন চিনতে পেরেছিলে? সত্যি কথা বোলো কিন্তু—

সর্বজয়া হাসিয়া বলিল — নাঃ, তা চিনবো কেন! প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারিনি, তারপর তখুনি—

—আন্দাজে—

— আন্দাজে নয় গো, আন্দাজে নয়— সত্যি-সত্যি! দেখলে না, তখ্খনি মাথায় কাপড় দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলাম? তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, তুমি বল তো, আমায় চিনতে পেরেছিলে? বল তো গা ছুঁয়ে?

নানা কেজো-অকেজো কথাবার্তায় রাত বাড়িতে লাগিল। পরলোকগত দাদার কথা উঠিতে সর্বজয়ার চোখের জল আর বাঁধ মানে না। হরিহর জিজ্ঞাসা করিল — বীণার বিয়ে কোথায় হল? ছোট শালীর নাম জানিত না, আজই শ্বশুরের মুখে শুনিয়াছে।

— তার বিয়ে হোল কুড়ুলে বিনোদপুর—ওই যে বড় গাঙ, কি বলে? মধুমতী। —সেই মধুমতীর ধারে।

একটা প্রশ্ন বার বার সর্বজয়ার মনে আসিতে লাগিল—স্বামী তাহাকে লইয়া যাইবে তো? না, দেখাশুনা করিয়া আবার চলিয়া যাইবে সেই কাশী গয়া? বলি বলি করিয়াও মুখ ফুটিয়া সে কথাটা কিন্তু কোনরূপেই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না— তাহার মনের ভিতর কে যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বলিল — না নিয়ে যাক্ গে— আবার তা নিয়ে বলা, কেন এত ছোট হতে যাওয়া?—

হরিহর সমস্যার সমাধান নিজ হইতেই করিল। বলিল — কাল চল তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাই নিশ্চিন্দিপুরে—

সর্বজয়ার বুকে ধড়াস করিয়া যেন ঢেঁকীর পাড় পড়িল — সামলাইয়া মুখে বলিল — কালই কেন? এ্যদ্দিন পরে এলে— দুদিন থাকো না কেন? বাবা মা কি তোমায় এখুনি ছেড়ে দেবেন? পরশু আবার আমার বকুলফুলের বাড়ী তোমায় নেমন্তন্ন করে গিয়েছে —

— কে তোমার বকুলফুল?...

— এই গাঁয়েই বাড়ী — এ পাড়ায়, আবার ও-পাড়াতে বিয়ে হয়েচে। পরে সে আবার হাসিয়া বলিল, কাল সকালে তোমাকে দেখতে আসবে বলেচে যে—

কথাবার্তার স্রোত একইভাবে চলিল — রাত্রি গভীর হইল। বাড়ীর ধারেই সজনে গাছে রাতজাগা পাখী অদ্ভুত রব করিয়া ডাকিতেছিল। হরিহরের মনে হইল বাংলার এই নিভৃত পল্লীপ্রান্তের বাঁশবনের ছায়ায় একখানি স্নেহব্যগ্র গৃহকোণ যখন তাহার আগমনের আশায় মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অভ্যর্থনাসজ্জা সাজাইয়া প্রতীক্ষা করিয়াছে, কিসের সন্ধানেই সে তখন পশ্চিমের অনুর্বর অপরিচিত মরুপাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে গৃহহীন নিরাশ্রয়ের ন্যায় ঘুরিয়া মরিতেছিল যে!

রাত-জাগা পাখীটা একঘেয়ে ডাকিতেছিল, বাহিরের জ্যোৎস্না ক্রমে ক্রমে ম্লান হইয়া আসিতেছে। এক হিসেবে এই রাত্রি তাহার কাছে বড় রহস্যময় ঠেকিতেছিল, সম্মুখে তাহাদের নবজীবনের যে পথ বিস্তীর্ণ ভবিষ্যতে চলিয়া গেছে—আজ রাতটি হইতেই তাহার শুরু। কে জানে সে জীবন কেমন হইবে? কে জানে জীবন-লক্ষ্মী কোন্ সাজি সাজাইয়া রাখিয়াছেন তাহাদের সে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের পাথেয়-রূপে?

দুজনেরই মনে বোধ হয় অনেকটা অস্পষ্টরূপে একই ভাব জাগিতেছিল। দুজনেই চুপ করিয়া জানালার বাহিরের ফাঁকে জ্যোৎস্নারাত্রির দিকে চাহিয়া রহিল।

তারপর কতদিন কাটিয়া গিয়াছে। তখন কোথায় ছিল এই শিশুর পাত্তা?

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইন্দির ঠাক্‌রুণ ফিরিয়া আসিয়াছে ছয় সাত মাস হইল, সর্বজয়া কিন্তু ইহার মধ্যে একদিনও বুড়ীর সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহে নাই। আজকাল তাহার আরও মনে হয় যে বুড়ী ডাইনী সাতকুলখাগীটাকে তাহার মেয়ে যেন তাহার চেয়েও ভালবাসে। হিংসা তো হয়ই, রাগও হয়। পেটের মেয়েকে পর করিয়া দিতেছে। দু'বেলা কথায় কথায় বুড়ীকে সময় থাকিতে পথ দেখিবার উপদেশ ইঙ্গিতে জানাইয়া দেয়। সে পথ কোন্ দিকে— জ্ঞান হইয়া অবধি আজ পর্যন্ত সত্তর বৎসরের মধ্যে বুড়ী তাহার সন্ধান পায় নাই, এতকাল পরে কোথায় তাহা মিলিবে, ভাবিয়াই সে ঠাহর পায় না।

বর্ষার শেষদিকে বুড়ী অবশেষে এক যুক্তি ঠাওরাইল। ছয় ক্রোশ দূরে ভাণ্ডারহাটিতে তাহার জামাইবাড়ী। তাহার জামাই চন্দ্র মজুমদার বাঁচিয়া আছেন। জামাইয়ের অবস্থা বেশ ভাল, সম্পন্ন গৃহস্থ, অবশ্য মেয়ে মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জামাই-এর সঙ্গে সম্পর্ক উঠিয়া গিয়াছে— আজ পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বৎসরের আগেকার–কথা–তাহার পর আর কখনও দেখাশোনা বা খবরাখবরের লেন-দেন হয় নাই। তবুও যদি সেখানে যাওয়া যায়, জামাই একটু আশ্রয় দিতে কি গররাজী হইবে?

সন্ধ্যার পূর্বে ভাণ্ডারহাটি গ্রামে ঢুকিয়া একখানা বড় চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে গাড়োয়ান গাড়ী দাঁড় করাইল। গাড়োয়ানের ডাক-হাঁকে একজন চব্বিশ-পঁচিশ বৎসরের যুবক আসিয়া বলিল — কোথাকার গাড়ি? তাহার পিছনে পিছনে একজন বৃদ্ধ বাড়ীর ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বাহির হইলেন— কে রাধু? জিজ্ঞেস করো কোথা থেকে আসছেন?

বুড়ী চিনিল — কিন্তু অবাক্ হইয়া রহিল — এই সেই তাহার জামাই চন্দর! চল্লিশ বৎসর পূর্বের সে সবল দোহারা-গড়ন সুচেহারা ছেলেটির সঙ্গে এই পক্ককেশ প্রবীণ ব্যক্তির মনে মনে তুলনা করিয়া সে যেন হাঁপাইয়া উঠিল। পরক্ষণেই কেমন এক বিভিন্ন ভাবের সংমিশ্রণে উৎপন্ন না-হাসি-না-দুঃখ গোছের মনের ভাবে সে বিহ্বলের মত ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। অনেক দিন পরে মেয়ের নাম ধরিয়া কাঁদিল।

বিস্ময়বিমূঢ় চন্দ্র মজুমদার প্রথমটা আকাশ-পাতাল হাতড়াইতেছিলেন, পরে ব্যাপারটা বুঝিলেন ও আসিয়া শাশুড়ীর পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিলেন। একটু সামলাইয়া বুড়ী মাথায় কাপড় তুলিয়া দিয়া ভাঙাগলায় বলিল— তোমার কাছে এয়েচি বাবাজী এতদিন পরে— একটুখানি আচ্ছয়ের জন্যি–আর কডা দিনই বা বাঁচবো! কেউ নেই আর ত্রিভুবনে— এই বয়সে দুটো ভাত কাপড়ের জন্যি—

মজুমদার মহাশয় বড়ছেলেকে গাড়ির দ্রব্যাদি নামাইতে বলিলেন ও ছেলের সঙ্গে শাশুড়ীকে বাড়ীর মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। দ্বিতীয়পক্ষের বিধবা মেয়ে ও বড় পুত্রবধূ সংসারের গৃহিণী। আরও তিনটি পুত্রবধূ আছে। নাতি-নাতিনীও তিন-চারটি।

তালগাছের গুঁড়ির খুঁটি ও আড়াবাঁধা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুইখানা দাওয়া উঁচু আটচালা ঘর জিনিসপত্র, সিন্দুকতোরঙ্গে বোঝাই, পা ফেলিবার স্থানাভাব। মজুমদার মহাশয়ের বিধবা মেয়েটির নাম হৈমবতী। খুব ভাল মেয়ে— সে নিজের হাতে ফল কাটিয়া জলখাবার সাজাইয়া অত্যন্ত আপ্যায়িত করিয়া কাছে বসাইয়া খাওয়াইল; একথা ওকথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, বলিল— দিদিমা, আমায় কখনো দেখেননি, না? কখনো তো এদিকে পায়ের ধুলো দ্যান্নি এর আগে! আক কেটে দেবো দিদিমা? দাঁত আছে? পাশের রান্নাঘরে ছেলেমেয়েরা সন্ধ্যাবেলা ভাত খাইতে বসিয়া হৈ চৈ করিতেছে। একজন চেঁচাইয়া বলিতেছে, ও মা দ্যাখো, উমি সব ডালটুকু আমার পাতে দিচ্ছে! পুত্রবধূ চেঁচাইতেছে, ওর কাছে খেতে বসিস্ কেন? রোজ না বলচি আলাদা বস্‌বি– এই উমি, বড্ড বাড় হয়েচে, না?

কিন্তু দশ-বারো দিন কাটিয়া গেল, বুড়ীর সব কেমন নতুন নতুন ঠেকিতে লাগিল, তেমনি স্বস্তি পাওয়া যায় না— নতুন ধরণের ঘরদোর, নতুন পথঘাট, নতুন ভাবের গৃহস্থালী। কেমন যেন মনে হয় এ ঠিক তাহার নিজের নয়, সব পর। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ই মনে পড়িত নিরিবিলি দাওয়া আর খুকী-খোকার মুখ। দিন কুড়িক পরে বুড়ী যাইবার জন্য ছটফট্ করিতে লাগিল। এখানে আর মন টেকে না। কর্তার প্রথম পক্ষের শাশুড়ীর এ আকস্মিক আবির্ভাব ও তাঁহার মতলব শুনিয়া বাড়ীর বড়বধূ প্রথম হইতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, অন্তর্ধানে খুশী ছাড়া অ-খুশী হইলেন না। চন্দ্র মজুমদারের ইচ্ছা কি ছিল ভগবান জানেন, কিন্তু বড়ছেলে ও বড়বধূর ভয়ে কিছু বলিতে পারিলেন না।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ও পাড়ার দাসীঠাকরুন আসিয়া হাসিমুখে বলিল–পয়সা দুটোর জন্য এয়েছিলাম বৌ, ইন্দির পিসি কাল আমার কাছ থেকে একটা নোনা নিয়ে এল, বল্লে, কাল দাম গিয়ে চেয়ে নিয়ে এসো–

সর্বজয়া ঘরের কাজকর্ম করিতেছিল, অবাক হইয়া বলিল–নোনা কিনে এনেছে তোমার কাছ থেকে?

দাসীঠাকরুন ঘোর ব্যবসাদার মানুষ। সামান্য তেঁতুল আমড়া হইতে একগাছি শাক পর্যন্ত পয়সা না লইয়া কাহাকেও দেয় না। দাসীর অমায়িক ভাব অন্তহিত হইয়া গেল। বলিল–এনেচে কিনা জিজ্ঞেস করো না তোমার ননদকে! সকালবেলা কি মিথ্যে বলতে এলাম দুটো পয়সার জন্য? চার পয়সার কমে আমি দেবো না-বললে বুড়োমানুষ খাবার ইচ্ছে হয়েছে—তা যাক দু’ পয়সাতেই–

রাগে সর্বজয়ার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। নোনার মতো ফল যাহা কিনা এত অপর্যাপ্ত বনে জঙ্গলে ফলে যে গরু-বাছুরের পর্যন্ত খাইয়া অরুচি হইয়া যায়, তাহা আবার পয়সা দিয়া কিনিয়া খাইবার লোক যে পাড়াগাঁয়ে আছে, তাহা সর্বজয়ার ধারণায় আসে না।

ঠিক এই সময় ইন্দির বুড়ি কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সর্বজয়া তাহার উপর যেন ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল–বলি হ্যা◌েগা, তিন কাল গিয়েছে, এককালে তো ঠেকেচ, যার বসে খাই তাঁর পয়সায় তো একটু দুখ-দরদ করে চলতে হয়? নোনা গিয়েচ কিনতে? কোথা থেকে তোমায় বসিয়ে আজ নোনা কাল দানা খাওয়াব? শখের পয়সা নিজে থেকে নিয়ে দাওগে যাও, পরের ওপর দিয়ে শখ করতে লজ্জা হয় না?

বুড়ির মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, তবুও একটুখানি হাসি আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিল–তা দে বৌ–পাকা নোনাডা, তা ভাবলাম নিই খেয়ে, কড়া দিনই বা বাঁচবো? তা দিয়ে দে দুটো পয়সা–

সর্বজয়া চতুগুণ চিৎকার করিয়া বলিল–বড় পয়সা সস্তা দেখোঁচ কিনা? নিজের ঘটিবাটি আছে, বিক্রি করে নিয়ে দাও গিয়ে পয়সা–

পরে সে ঘড়া লইয়া খিড়কি দুয়ার দিয়া ঘাটের পথে বাহির হইয়া গেল।

দাসী খানিকটা দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল-আমার নাকে খত কানে খত, জিনিস বেচে এমন হয়রান তো কখনও হইনি!! তোমায়ও বলি ইন্দির পিসি, নিজের পয়সাই যদি না

ছিল। তবে তোমার কাল নোনাটা আনা ভালো হয়নি বাপু, ও-রকম ধারে জিনিসপত্তর আর এনো না। তা তোমাদের ঝগড়া তোমরা করো, আমি গরিব লোক, ও বেলা আসবো, আমার পয়সাদুটো বাপু ফেলে দিয়ো–

দাসীর পিছু পিছু খুকি। বাহিরের উঠান পর্যন্ত আসিল। বলিতে বলিতে আসিল–পিসিমা বুড়ো মানুষ, একটা নোনা এনেছে, তা বুঝি বকে? খেতে ইচ্ছে হয় না, হ্যাঁ দাসীপিসি? বেশ নোনা, আমায় আধখানা কাল দিয়েছে–তোমার বাড়ি বুঝি গাছ আছে পিসি?–পরে সে ডাকিয়া কহিল–শোনো না দাসীপিসি, আমি একটা পয়সা দেবো এখন, পুতুলের বাক্সে আছে, মা ঘরে চাবি দিয়ে ঘাটে গেল, এলে নুকিয়ে দেবো এখন, মাকে বোলো না যেন পিসি।

দুপুরের কিছু পূর্বে ইন্দির বুড়ি বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। বাঁ হাতে ছোট একটা ময়লা কাপড়ের পুটুলি, ডানহাতে পিতলের চাদরের ঘটিটা বুলানো, বগলে একটা পুরোনো মাদুর, মাদুরের পাড় ছিড়িয়া কাঠিগুলি বুলিতেছে।

খুকি। বলিল, ও পিসি, যাসনে–ও পিসি কোথায় যাবি? পরে সে ছুটে আসিয়া মাদুরের পিছনটা টানিয়া ধরিল। তুই চলে গেলে আমি কাঁদবো পিসি—ঠিক–

সর্বজয়া ঘরের দাওয়া হইতে বলিল, তা যাবে যাও, গোরস্তর অকল্যাণ করে যাওয়া কেন? ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি, এতকাল যার খেলে তার একটা মঙ্গল তো দেখতে হয়, অনখ সময়ে না খেয়ে চলে গিয়ে তারপর গোরস্তর একটা অকল্যেণ বাধুক, এই তোমার ইচ্ছে তো? ওই রকম কুচকুরে মন না হলে কি আর এই দশা হয়?...

বুড়ি ফিরিল না। খুকি। কাঁদিতে কাঁদিতে অনেক দূর পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গেল।

বুড়ি গিয়া গ্রামের ও-পাড়ার নবীন ঘোষালের বাড়ি উঠিল। নবীন ঘোষালের বউ সব নিয়া গালে হাত দিয়া বলিল-ওমা, এমন তো কখনও শুনিনি, হ্যাগো খুড়ি? তা থাকো মি, এইখানেই থাকো।

মাস-দুই সেখানে থাকার পর বুড়ি সেখান হইতে বাহির হইয়া তিনকড়ি ঘোষালের বাড়ি ও তথা হইতে পূর্ণ চক্রবর্তীর বাড়ি আশ্রয় লইল। প্রত্যেক বাড়িতেই প্রথম আপ্যায়নের হৃদ্যতটুকু কিছুদিন পর উবিয়া যাওয়ার পরে বাড়ির লোকে নানা রকমে বিরক্তি প্রকাশ করিত। পরামর্শ দিত ঝগড়া মিটাইয়া ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইতে। বুড়ি আরও দু'এক বাড়ি ঘুরিল, সব সময়ই তাহার ভরসা ছিল বাড়ি হইতে আর কেহ না হয়, অন্তত হরিহর ডাকিয়া পাঠাইবে। কিন্তু তিনমাস হইয়া গেল, কেহই আগ্রহ করিয়া ডাকিতে আসিল না। দুর্গাঁও আসে নাই। বুড়ি জানে ও-পাড়া হইতে এ-পাড়া অনেক

দূরে, ছোট মেয়ে এতদূর আসিতে পারে না। সে আশায় আশায় ও-পাড়ায় দু' একবার গেল, খুকির সঙ্গে দেখা হইল না।

বারো মাস লোকের বাড়ি আশ্রয় হয় না। পুব-পাড়ার চিন্তে গয়লানীর চালা ঘরখানি পড়িয়া ছিল–মাস দুই পরে সকলে মিলিয়া সেই ঘরখানি বুড়ির জন্য ঠিক করিয়া দিল এবং ঠিক করিল পাড়া হইতে সকলে কিছু কিছু সাহায্য করিবে। ঘরখানা নিতান্ত ছোট, ছিটে বেড়ার দেয়াল, পাড়া হইতে দূরে, একটা বাঁশবনের মধ্যে। লোকের মুখে শুনিত সর্বজয়া নাকি বলিয়াছে–তেজ দেখুক পাঁচজনে। এ বাড়ি আর না, আমার বাছাদের মুখের দিকে যে তাকায়নি—তাকে আর আমার দোরে মাথা গলাতে হবে না, ভাগাড়ে পড়ে মরুক গিয়ে।

যাহাদের সাহায্য করিবার কথা ছিল, তাহারা প্রথম দিনকতক খুব উৎসাহের সঙ্গে জোগাইল, ক্রমে কিন্তু তাহাদের আগ্রহও কিমিয়া গেল। বুড়ি ভাবে, কেন সেদিন অত রাগ করে চলে এলাম? বৌ বারণ কল্লে, খুকি। কত কাঁদলে, হাতে ধরে টানাটানি কল্লে–! নিজের উপর অত্যন্ত দুঃখে চোখের জলে দুই তোবড়ানো গাল ভাসিয়া যায়। বলে—শেষ কালডা এত দুঃখুও ছিল আদেষ্টে-আজ যদি মেয়েডাও থাকতো–

চৈত্র মাসের সংক্রান্তি। সারাদিন বড় রৌদ্রের তেজ ছিল, সন্ধ্যার সময় একটু একটু বাতাস বহিতেছে, গোসাঁইপাড়ায় চড়কের ঢাক এখনও বাজিতেছে, মেলা এখনওশেষ হয়। নাভ্ন্ইি।

রৌদ্রে এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরিয়া ও দুর্ভাবনায় বুড়ির রোজ সন্ধ্যার পরে একটু একটু জ্বর হয়। সে মাদুর পাতিয়া দাওয়ায় চুপ করিয়া শুইয়া আছে, মাথার কাছে মাটির ভাঁড়ে জল। পিতলের চাদরের ঘটিটা ইতিমধ্যে চার আনায় বাঁধা দিয়া চাল কেনা হইয়াছে। জ্বরের তৃষ্ণায় মাঝে মাঝে একটু একটু জল মাটির ভাঁড় হইতে খাইতেছে।

–পিসিমা!...বুড়ি কাঁথা ফেলিয়া লাফাইয়া উঠিল, দাওয়ার পৈঠায় খুকি উঠিতেছে, পিছনে তাহাদের পাড়ার বেহারী চক্কত্তির মেয়ে রাজী। খুকির পরনে ফরসা কাপড়, আঁচলের প্রান্তে কি সব পোটলা-পুটলি বাঁধা। বুড়ির মুখ দিয়া বেশি কথা বাহির হইল না। প্রবল আগ্রহে সে শীর্ণ হাত বাড়াইয়া তাহাকে জ্বরতপ্ত বুকে জড়াইয়া ধরিল।

–বলিসনে কাউকে পিসি, কেউ যেন টের পায় না, চড়ক দেখে সন্দেবেলা চুপি চুপি এলাম, রাজীও এলো আমার সঙ্গে, চড়কের মেলা থেকে এই দ্যাখ, তোর জন্যে সব এনেচি–

খুকি। পুটলি খুলিল।

–মুড়কি পিসিমা, তোর জন্যে দু' পয়সার মুড়কি আর দুটো কদমা আর খোকার জন্যে একটা কাঠের পুতুল–।

বুড়ি ভালো করিয়া উঠিয়া বসিল। জিনিসগুলো নাড়িতে চাড়িতে বলিল–দেখি দেখি, ও আমার মানিক, কত জিনিস। এনেচে দ্যাখে। রাজরানী হও, গরিব পিসির ওপর এত দয়া! দেখি খোকার কাঠের পুতুলডা! বাঃ দিব্যি পুতুল-কডা পয়সা নিলে?...

এক ঝোঁক কথাবার্তার পরে খুকি। বলিল–পিসি, তোর গা যে বড্ড গরম?

–সমস্ত দিন টিউরে বেড়িয়ে এই রকমডা হয়েছে, তাই বলি একটু শুয়ে থাকি–

ছেলেমানুষ হইলেও দুর্গা পিসিমার রৌদ্রে ঘুরিবার কারণ বুঝিল। দুঃখে ও অনাহারে শীর্ণ পিসিমার গায়ে সে সস্নেহে হাত বুলাইয়া বলিল, তুই অবিশ্যি করে বাড়ি যাস-সন্দে বেলা গল্প শুনতে পাইনে, কিছু না-কাল যাবি—-কেমন তো?

বুড়ি আনন্দে উচ্ছসিত হইয়া উঠিল, বলিল, বৌ বুঝি তোকে কিছু বলে দিয়েছে আজ?

রাজী বলিল–খুড়িমা তো কিছু বলে দেয়নি পিসিমা, ওকে তো এখানে খুড়িমা আসতে দেয় না। আমরা বললে বকে, তবে তুমিও যেয়ো পিসিমা। তুমি একটুখানি বোলো, তাহলে খুড়িমা আর কিছু বলবে না–

খুকি। বলিল-কাল তুই ঠিক যাস পিসি, মা কিছু বলবে না।–তাহলে এখন বাড়ি যাই পিসি, কাউকে যেন বলিসনে? কাল সকালে ঠিক যাস কিন্তু।

সকালে উঠিয়া বুড়ি দেখিল শরীরটা একটু হালকা। একটু বেলা হইলে ছোট্ট পুটুলিতে ছেড়া-খোঁড়া কাপড় দু'খানা ও ময়লা গামছাখানা বাঁধিয়া বুড়ি বাড়ির দিকে চলিল। পথে গোপী বোষ্টমের বৌ বলিল, দিদি ঠাকরুন, তা বাড়ি যাচ্ছে বুঝি?? বৌদিদির রাগ চলে গিয়েছে বুঝি?

বুড়ি একগাল হাসিল, বলিল–কাল দুর্গা যে সন্দে বেলা ডাকতে গিয়েছিল, কত কাঁদলে, বল্লে, মা বলেচে-চ' পিসি বাড়ি চ'—তা আমি বল্লাম–আজ তুই যা, কাল সক্কাল বেলাডা হোক, আমি বাড়ি গিয়ে উঠবো।–মেয়ের আমার কত কান্না, যেতে কি চায়!..তাই সকালে যাচ্ছি।

বুড়ি ঢুকিয়া দেখিল কেহ বাড়ি নাই। কাল সারারাত জ্বর ভোগের পর এতটা পথ রৌদ্রে দুর্বল শরীরে আসিয়া বোধ হয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, পুটুলিটা নামাইয়া সে নিজের ঘরের দাওয়ার পৈঠায় বসিয়া পড়িল।

একটু পরেই খিড়কি দোর ঠেলিয়া সর্বজয়া স্নান করিয়া নদী হইতে ফিরিল। এদিকে চোখ পড়িলে বুড়িকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া একটুখানি দাঁড়াইল বুড়ি হাসিয়া বলিল–ও বৌ, ভালো আছিস? এই অ্যালাম অ্যাদ্দিন পরে, তোদের ছেড়ে আর কোথায় যাবো এ বয়সে–তাই বলি–

সর্বজয়া আগাইয়া আসিয়া বলিল–তুমি এ বাড়ি কি মনে করে?

তার ভাবভঙ্গি ও গলার স্বরে বুড়ির হাসিবার উৎসাহ আর বড় রহিল না। সর্বজয়া কথার উত্তর দিতে না দিয়াই বলিল–এ বাড়ি আর তোমার জায়গা কিছুতেই হবে না– সে তোমাকে আমি সেদিন বলে দিয়েচি–ফের কোন মুখে এয়েচ?

বুড়ি কাঠের মতো হইয়া গেল, মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না। পরে সে হঠাৎ একেবারে কাঁদিয়া বলিল–ও বৌ, আমন করে বলিসনে–একটুখানি ঠাই দে আমারে–কোথায় যাবো। আর শেষকালডা বল দিকিনি—তবু এই ভিটেটাতে–

–ন্যাও, আর ভিটের দোহাই দিতে হবে না, ভিটের কল্যাণ ভেবে তোমার তো ঘুম নেই, যাও এক্ষুনি বিদেয় হও, নইলে অনাথ বাধাবো–

ব্যাপার এরূপ দাঁড়াইবে বুড়ি বোধ হয় আদৌ প্রত্যাশা করে নাই। জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন ডুবিয়া যাইবার সময় যাহা পায় তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়, বুড়ি সেইরূপ মুঠা আঁকড়াইয়া আশ্রয় খুজিতে লক্ষ্যহীন ভাবে এদিক ওদিক চাহিল–আজ তাহার কেমন মনে হইল যে, বহুদিনের আশ্রয় সত্য সত্যই তাহার পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাইতেছে, আর তাহাকে ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই।

সর্বজয়া বলিল–যাও আর বসে থেকে না ঠাকুরঝি, বেলা হয়ে যাচ্ছে আমার কাজকর্ম আছে, এখানে তোমার জায়গা কোনোরকমে দিতে পারবো না–

বুড়ি পুঁটুলি লইয়া অতিকষ্টে আবার উঠিল। বাহির দরজার কাছে যাইতে তাহার নজর পড়িল তাহার উঠান-ঝাঁটের ঝাঁটাগাছটা পাঁচিলের কোণে ঠেস দেওয়ানো আছে, আজ তিন-চারি মাস তাহাতে কেহ হাত দেয় নাই। এই ভিটার ঘাসটুকু, ওই কত যত্নে পোঁতা লেবু গাছটা, এই অত্যন্ত প্রিয় ঝাঁটাগাছটা, খুকি, খোকা, ব্রজ পিসের ভিটা–তার সত্তর বৎসরের জীবনে এ সব ছাড়া সে আর কিছু জানেও নাই, বুঝেও নাই।

চিরকালের মতো তাহারা আজ দূরে সরিয়া যাইতেছে।

সজনেতলা দিয়া পুটুলি বগলে যাইতে পিছন হইতে রায়বাড়ির গিন্নি বলিল–ঠাকমা, ফিরে যাচ্ছে কোথায়? বাড়ি যাবে না? উত্তর না পাইয়া বলিল–ঠাকমা আজকাল কানের মাথা একেবারে খেয়েছে।

বৈকালে ও-পাড়া হইতে কে আসিয়া বলিল–ও মা-ঠাকরুন, তোমাদের বুড়ি বোধ হয় মরে যাচ্ছে, পালিতদের গোলার কাছে দুপুর থেকে শুয়ে আছে, রোদুরে ফিরে যাচ্ছিল, আর যেতে পারেনি–একবার গিয়ে দেখে এসো—দাদাঠাকুর বাড়ি নেই? একবার পাঠিয়ে দেও না।

পালিতদের বড় মাচার তলায় গোলার পাশে ইন্দির ঠাকরুন। মরিতেছিল একথা সত্য। হরিহরের বাড়ি হইতে ফিরিতে ফিরিতে তাহার গা কেমন করে, রৌদ্রে আর আগাইতে না পারিয়া এইখানেই শুইয়া পড়ে। পালিতেরা চণ্ডীমণ্ডপে তুলিয়া রাখিয়াছিল। বুকে পিঠে তেল মালিশ, পাখার বাতাস, সব করিবার পরে বেশি বেলায় অবস্থা খারাপ বুঝিয়া নামাইয়া রাখিয়াছে। পালিত-পাড়ার অনেকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেহ বলিতেছে– তা রোদুরে বেরুলেই বা কেন? সোজা রোদুরটা পড়েচে আজ? কেহ বলিতেছে–এখুনি সামলে উঠবে এখন, ভিরমি লেগেছে বোধ হয়–

বিশু পালিত বলিল–ভিরমি নয়। বুড়ি আর বাঁচবে না, হরিজেঠা বোধ হয় বাড়ি নেই, খবর তো দেওয়া হয়েচে, কিন্তু এতদূর আসে কে?

শুনিতে পাইয়া দীনু চক্রবর্তী বড় ছেলে ফণী ব্যাপার কি দেখিতে আসিল। সকলে বলিল–দাও দাদাঠাকুর, ভাগ্যিস এসে পড়েচ, একটুখানি গঙ্গাজল মুখে দাও দিকি। দ্যাখো তো কাণ্ড, বামুনপাড়া না কিছু না—কে একটু মুখে জল দেয়?

ফণী হাতের বৈঁচিকাঠের লাঠিটা বিশু পালিতের হাতে দিয়া বুড়ির মুখের কাছে বসিল। কুশি করিয়া গঙ্গাজল লইয়া ডাক দিল–ও পিসিমা!

বুড়ি চোখ মেলিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া মুখের দিকে চাহিয়াই রহিল, তাহার মুখে কোন উত্তর শুনা গেল না। ফণী আবার ডাকিল–কেমন আছেন পিসিমা? শরীর কি অসুখ মনে হচ্ছে?

পরে সে গঙ্গাজলটুকু মুখে ঢালিয়া দিল। জল কিন্তু মুখের মধ্যে গেল না, বিশু পালিত বলিল–আর একবার দাও দাদাঠাকুর–

আর খানিকক্ষণ পরে ফণী বুড়ির চোখের পাতা বুজাইয়া দিতেই কোটরগত অনেকখানি জল শীর্ণ গাল-দুটা বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে সেকালের অবসান হইয়া গেল।

আম-আঁটির ভেঁপু

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যুর পর চার-পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মাঘ মাসের শেষ, শীত বেশ আছে। দুই পাশে ঝোপে-ঝাপে-ঘেরা সরু মাটির পথ বাহিয়া নিশ্চিন্দিপুরের কয়েকজন লোক সরস্বতীপূজার বৈকালে গ্রামের বাহিরের মাঠে নীলকণ্ঠ পাখি দেখিতে যাইতেছিল।

দলের একজন বলিল, ওহে হরি, ভূষণে গোয়ালার দরুন কলাবাগানটা তোমরা কি ফের জমা দিয়েচো নাকি?

যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইল তাহাকে দেখিলে দশ বৎসর পূর্বের সে হরিহর রায় বলিয়া মনে হয় না। এখন সে মধ্যবয়সি, পুরাদস্তুর সংসারী, ছেলেমেয়ের বাপ হরিহর খাজনা সাধিয়া গ্রামে গ্রামে ঘোরে, পৈতৃক আমলের শিষ্যসেবকের ঘরগুলি সন্ধান করিয়া বসিয়া গুরুগিরি চালায়, হাট্রোঠে জমির ঘরামির সঙ্গে ঝিঙে-পটলের দর-দস্তুর করিয়া ঘোরে, তাহার সঙ্গে আগেকার সে অবাধাগতি, মুক্তপ্রাণ, ভবঘুরে যুবক হরিহরের কোন মিল নাই। ক্রমে ক্রমে পশ্চিমের সে-জীবন অনেক দূরের হইয়া গিয়াছে—সেই চুনার দুর্গের চওড়া প্রাচীরে বসিয়া বসিয়া দূর পাহাড়ের সূর্যস্ত দেখা, কেদারের পথে তেজপাতার বনে রাত-কাটানো, শাহ কাশেম সুলেমানীর দরগার বাগান হইতে টক কমললেবু ছিড়িয়া খাওয়া, গলিত রৌপ্যধারার মতো স্বচ্ছ, উজ্জ্বল হিমশীতল স্বর্গনদী অলকানন্দা, দশাশ্বমেধ ঘাটের জলের ধারের রানা–একটু একটু মনে পড়ে, যেন অনেকদিন আগেকার দেখা স্বপ্ন।

হরিহর সায়সূচক কিছু বলিতে গিয়া পিছন ফিরিয়া বলিল, ছেলেটা আবার কোথায় গেল? ও খোকা, খোকা-আ-আ—

পথের বাঁকের আড়াল হইতে একটি ছয় সাত বছরের ফুটফুটে সুন্দর, ছিপছিপে চেহারার ছেলে ছুটিয়া আসিয়া দলের নাগাল ধরিল। হরিহর বলিল—আবার পিছিয়ে পড়লে এরই মধ্যে? নাও এগিয়ে চল–

ছেলেটা বলিল–বনের মধ্যে কি গেল বাবা? বড় বড় কান?

হরিহর প্রশ্নের দিকে কোন মনোযোগ না দিয়া নবীন পালিতের সঙ্গে মৎস্যশিকারের পরামর্শ তাঁটিতে লাগিল।

হরিহরের ছেলে পুনরায় আগ্রহের সুরে বলিল–কি দৌড়ে গেল বাবা বনের মধ্যে? বড় বড় কান?

হরিহর বলিল–কি জানি বাবা, তোমার কথার উত্তর দিতে আমি আর পারিনে। সেই বেরিয়ে অবধি শুরু করেচো এটা কি, ওটা কি-কি গেল বনের মধ্যে তা কি আমি দেখেচি? নাও এগিয়ে চলো দিকি!

বালক বাবার কথায় আগে আগে চলিল।

নবীন পালিত বলিল, বরং এক কাজ করো। হরি, মাছ যদি ধরতে হয়, তবে বঁয়াশার বিলে একদিন চলে যাওয়া যাক-পুব-পাড়ার নেপাল পাড়ুই বাচ দিচ্ছে, রোজ দেড়মন দু'মিন এইরকম পড়চে-পাঁচ-সেরের নিচে মাছ নেই!! শুনলাম, একদিন শেষরাত্তিরে নাকি বিলের একেবারে মধ্যিখানে অর্থই জলে সাঁ সা করে ঠিক যেন বকনা বাছুরের ডাক–বুঝলে?

সকলে একসঙ্গে আগাইয়া আসিয়া নবীন পালিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

–অনেক—কেলে পুরোনো বিল, গহিন জল, দেখেছো তো মধ্যিখানে জল যেন কালো শিউগোলা, পদ্মগাছের জঙ্গল, কেউ বলে রাঘব বোয়াল, কেউ বলে যক্ষি–যতক্ষণ ফরাসা না হলো ততক্ষণ তো মশাই নৌকোর ওপর সকলে বসে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলো–

বেশ জমিয়া আসিয়াছে, হঠাৎ হরিহরের ছেলেটি মহা-উৎসাহে পাশের এক উলুখড়ের ঝোপের দিকে আঙুল তুলিয়া চিৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া গেল।–ওই যাচ্ছে বাবা, দ্যাখো বাবা, ওই গেল বাবা, বড় বড় কান, ওই–

তাহার বাবা পিছন হইতে ডাক দিয়া বলিল,–উঁহু উঁহু উঁহু–কাঁটা কাঁটা কাঁটা-পরে তাড়াতাড়ি আসিয়া খপ করিয়া ছেলের হাতখানি ধরিয়া বলিল,–আঃ বড্ড বিরক্ত কল্লে দেখচি তুমি, একশ' বার বারণ কিচ্চি তা তুমি কিছুতেই শুনবে না, ওই জন্যেই তো আনতে চাচ্ছিলাম না।

বালক উৎসাহে ও আগ্রহে উজ্জ্বল মুখ উঁচু করিয়া বাবার দিকে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল–কি বাবা?

হরিহরি বলিল–কি তা কি আমি দেখেচি! শুওর-টুওর হবে।–নাও চলো, ঠিক রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটো–

–শুওর না বাবা, ছোট্ট যে! পরে সে নিচু হইয়া দৃষ্ট বস্তুর মাটি হইতে উচ্চতা দেখাইতে গেল।

–চল চল—হ্যাঁ–আমি বুঝতে পেরেচি, আর দেখাতে হবে না-চল দিকি!...

নবীন পালিত বলিল–ও হলো খরগোশ, খোকা খরগোশ। এখানে খড়ের ঝোপে। খরগোশ থাকে, তাই।

বালক বর্ণপরিচয়ে 'খ'-এ খরগোশের ছবি দেখিয়াছে, কিন্তু তাহা যে জীবন্ত অবস্থায় এ রকম লাফাইয়া পালায় বা তাহা আবার সাধারণ চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায়, এ কথা সে কখনও ভাবে নাই।

খরগোশ!–জীবন্ত–একেবারে তোমার সামনে লাফাইয়া পালায়–ছবি না, কাচের পুতুল না–একেবারে কানখাড়া সত্যিকারের খরগোশ! এইরকম ভাটগাছ। বৈঁচিগাছের ঝোপে।–জল-মাটির তৈরি নশ্বর পৃথিবীতে এ ঘটনা কি করিয়া সম্ভব হইল, বালক তাহা কোনমতেই ভাবিয়া ঠাহর করিতে পারিতেছিল না।

সকলে বনে ঘেরা সরু পথ ছাড়াইয়া মাঠে পড়িল। নদীর ধারের বাবলা ও জিওল গাছের আড়ালে একটা বড় ইটের পাঁজার মতো জিনিস নজরে পড়ে, ওটা পুরানো কালের লকুঠির জ্বালঘরের ভগ্নাবশেষ। সেকালে নীলকুঠির আমলে এইনিশ্চিন্দিপুর বেঙ্গল ন্ডিগো কনসারনের হেড কুঠি ছিল, এ অঞ্চলের চৌদ্দটা কুঠির উপর নিশ্চিন্দিপুর কুঠির ম্যানেজার জন লারমার দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করিত। এখন কুঠির ভাঙা চৌবাচ্চাঘর, জ্বালঘর, সাহেবের কুঠি, আপিস জঙ্গলাকীর্ণ ইটের স্তুপে পরিণত হইয়াছে। যে প্রবলপ্রতাপ লারমার সাহেবের নামে এক সময় এ অঞ্চলে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাইত, আজকাল দু' একজন অতিবৃদ্ধ ছাড়া সে লোকের নাম পর্যন্ত কেহ জানে না।

মাঠের ঝোপঝাপগুলো উলুখড়, বনকলমি, সৌদাল ও কুলগাছে ভরা। কলমিলতা সার ঝোপগুলোর মাথা বড় বড় সবুজ পাতা বিছাইয়া ঢাকিয়া দিয়াছে–ভিতরে স্নিগ্ধ ছায়া, ছোট গোয়ালে, নাটাকাটা, ও নীল বন-অপরাজিতা ফুল সূর্যের আলোর দিকে মুখ উঁচু করিয়া ফুটিয়া আছে, পড়ন্ত বেলার ছায়ায় স্নিগ্ধ বনভূমির শ্যামলতা, পাখির ডাক, চারিধারে প্রকৃতির মুক্ত হাতে ছড়ানো ঐশ্বর্য রাজার মতো ভাণ্ডার বিলাইয়া দান, কোথাও এতটুকু দারিদ্র্যের আশ্রয় খুজিবার চেষ্টা নাই, মধ্যবিত্তের কার্পণ্য নাই। বেলাশেষের ইন্দ্রজালে মাঠ, নদী, বন মায়াময়।

মাঠের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে নবীন পালিত মহাশয় একবার এই মাঠের উত্তর অংশের জমিতে শাঁকঅ্যালুর চাষ করিয়া কিরূপ লাভবান হইয়াছিলেন, সে গল্প করিতে লাগিলেন। একজন বলিল, কুঠির ইটগুলো নাকি বিক্রি হবে শুনছিলাম, নবাবগঞ্জের মতি দাঁ নাকি দরদস্তুর কচ্ছে। মতি দাঁর কথায় সে ব্যক্তি সামান্য অবস্থা হইতে কিরূপে ধন্যবান হইয়াছে সে কথা আসিয়া পড়িল। ক্রমে তাহা হইতে বর্তমান কালের দুর্মুল্যতা, আষাঢ়ের বাজারে কুণ্ডুদের গোলদারী দোকান পুড়িয়া যাইবার কথা, গ্রামের গাঙ্গুলির মেয়ের বিবাহের তারিখ কবে পাড়িয়াছে প্রভৃতি বিবিধ আবশ্যকীয় সংবাদের আদান-প্রদান হইতে লাগিল।

হরিহরের ছেলে বলিল–নীলকণ্ঠ পাখি কই বাবা?

–এই দেখো এখন, বাবলাগাছে এখুনি এসে বসবে–

বালক মুখ উঁচু করিয়া নিকটবর্তী সমুদয় বাবলাগাছের মাথার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। মাঠের ইতস্তত নিচু নিচু কুলগাছে অনেক কুল পাকিয়া আছে, বালক অবাক হইয়া লুব্ধদৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। কয়েকবার কুল পাড়িতে গিয়া বাবার বকুনিতে তাহাকে নিবৃত্ত হইতে হইল। এত ছোট গাছে কুল হয়? তাহাদের পাড়ায় যে কুলের গাছ আছে, তাহা খুব উঁচু বলিয়া ইচ্ছা থাকিলেও সে সুবিধা করিতে পারে না। ভারী আকুশিটা দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিয়াও তুলিতে পারে না, কুপথ্যের জিনিস লুকাইয়া খাওয়া কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে–এ সে টের পায়। খবর পাইয়া মা আসিয়া বাড়ি ধরিয়া লইয়া যায়, বলে–ওমা আমার কী হবে! এমন দুষ্টু ছেলে হয়েচ তুমি? এইসেদিন উঠলে জ্বর থেকে আজ আমনি কুলতলায় ঘুরে বেড়াচ্চ! একটুখানি পিছন ফিরেচি, আর অমনি এসে দেখি বাড়ি নেই! কটা কুল খেয়েচিস, দেখি মুখ দেখি?

সে বলে, কুল খাইনি তো মা, তলায় একটাও কুল পড়ে নেই, আমি বুঝি পাড়তে পারি?

পরে সে টুকটুকে মুখটি মায়ের অত্যন্ত নিকটে লইয়া গিয়া হা করে। তাহার মা ভালো করিয়া দেখিয়া পুত্রের ননীর মতো গন্ধ বাহির হওয়া সুন্দর মুখে চুমা খাইয়া বলে–ককখনো খেয়ো না যেন খোকা! তোমার শরীর সেরে উঠুক, আমি কুল কুড়িয়ে আচার করে হাঁড়িতে তুলে রেখে দেবো।–তাই বোশেক জষ্টি মাসে খেয়ো লুকিয়ে লুকিয়ে ককখনো আর খেয়ে না।–কেমন তো?

হরিহর বলিল-কুঠি কুঠি বলছিলে, ওই দ্যাখো খোকা, সাহেবদের কুঠি, দেখেচো?

নদীর ধারের অনেকটা জুড়িয়া সেকালের কুঠিটা যেখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় হিংস্র জন্তুর কঙ্কালের মতো পড়িয়া ছিল, গতিশীল কালের প্রতীক নির্জন

শীতের অপরা তাহার উপর অল্পে অল্পে তাহার ধূসর উত্তরচ্ছদবিশিষ্ট আস্তরণ বিস্তার করিল।

কুঠির হাতার কিছু দূরে কুঠিয়াল লারমার সাহেবের এক শিশুপুত্রের সমাধি পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে। বেঙ্গল ইন্ডিগো কনসারনের বিশাল হেডকুঠির এইটুকু ছাড়া অন্য কোনও চিহ্ন আর অখণ্ড অবস্থায় মাটির উপর দাঁড়াইয়া নাই। নিকটে গেলে অনেক কালের কালো পাথরের জীর্ণ ফলকে এখনও পড়া যায়–

Here lies Edwin Lermor,
The only son of John & Mrs. Lermor,
Born May 13, 1853, Died April 27, 1860.

অন্য অন্য গাছপালার মধ্যে একটি বন্য সৌদাল গাছ তাহার উপর শাখাপত্রে ছায়াবিস্তার করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, চৈত্র বৈশাখ মাসে আড়াই-বাঁকির মোহনা হইতে প্রবহমান জোর হাওয়ায় তাহার পীত পুষ্পস্তবক সারা দিনরাত ধরিয়া বিস্মৃত বিদেশী শিশুর ভগ্ন-সমাধির উপর রাশি রাশি পুষ্প ঝরাইয়া দেয়। সকলে ভুলিয়া গেলেও বনের গাছপালা শিশুটিকে এখনও ভোলে নাই।

বালক অবাক হইয়া চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। তাহার ছয় বৎসরের জীবনে এই প্রথম সে বাড়ি হইতে এতদূরে আসিয়াছে। এতদিন নেড়াদের বাড়ি, নিজেদের বাড়ির সামনেটা, বড়জোর রানুদিদিদের বাড়ি, ইহাই ছিল তাহার জগতের সীমা। কেবল এক এক দিন তাহাদের পাড়ার ঘাটে মায়ের সঙ্গে স্নান করিতে আসিয়া সে স্নানের ঘাট হইতে আবছা দেখিতে পাওয়া কুঠির ভাঙা জ্বালঘরটার দিকে চাহিয়া দেখিত–আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিত, মা, ওদিকে কি সেই কুঠি? সে তাহার বাবার মুখে, দিদির মুখে, আরও পড়ার কত লোকের মুখে কুঠির মাঠের কথা শুনিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার প্রথম সেখানে আসা! ওই মাঠের পর ওদিকে বুঝি মায়ের মুখের সেই রূপকথার রাজ্য? শ্যাম-লঙ্কার দেশে বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গাছের নিচে, নির্বাসিত রাজপুত্র যেখানে তলোয়ার পাশে রাখিয়া একা শুইয়া রাত কাটায়? ও-ধারে আর মানুষের বাস নাই, জগতের শেষ সীমাটাই এই। ইহার পর হইতেই অসম্ভবের দেশ, অজানার দেশ শুরু হইয়াছে।

বাড়ি ফিরিবার পথে সে পথের ধারে একটা নিচু ঝোপ হইতে একটা উজ্জ্বল রং-এর ফলের থোলো ছিড়িতে হাত বাড়াইল। তাহার বাবা বলিল, হা হা হাত দিয়ো না হাত দিয়ো না।–আলীকুশি আল কুশি। কি যে তুমি করো বাবা! বড্ড জ্বালালে দেখছি। আর কোনদিন কোথাও নিয়ে বেরুচ্চিনে বলে দিলাম-এক্ষুনি হাত চুলকে ফোস্কা হবে- পথের মাঝখান দিয়ে এত করে বলছি হাটতে–তা তুমি কিছুতেই শুনবে না।

–হাত চুলকুবে, কেন বাবা?

–হাত চুলকুবে, বিষ বিষ–আলকুশিতে কি হাত দেয় বাবা? শুয়ো ফুটে রি রি করে জ্বলবে এক্ষুনি–তখন তুমি চিৎকার শুরু করবে।

গ্রামের মধ্যে দিয়া হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া খিড়কির দোর দিয়া বাড়ি ঢুকিল। সর্বজয়া খিড়কির দোর খোলার শব্দে বাহিরে আসিয়া বলিল–এই এত রাত হল! তা ওকে নিয়ে গিয়েচ, না একটা দোলাই গায়ে, না কিছু!

হরিহর বলিল-আঃ, নিয়ে গিয়ে যা বিরক্ত! এদিকে যায়, ওদিকে যায়, সামলে রাখতে পারিনে–আলকুশির ফল ধরে টানতে যায়। পরে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল–কুঠির মাঠ দেখবো, কুঠির মাঠ দেখবো।–কেমন, হল তো কুঠির মাঠ দেখা?

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

সকাল বেলা। আটটা কি নয়টা। হরিহরের পুত্র আপন মনে রোয়াকে বসিয়া খেলা করিতেছে, তাহার একটা ছোট টিনের বাক্স আছে, সেটার ডালা ভাঙা। বাক্সের সমুদয় সম্পত্তি সে উপুড় করিয়া মেঝেতে ঢালিয়াছে। একটা রং-ওঠা কাঠের ঘোড়া, চার পয়সা দামের, একটা টোল-খাওয়া টিনের ভেঁপু-বাঁশি, গোটাকতক কড়ি। এগুলি সে মায়ের অজ্ঞাতসারে লক্ষ্মীপূজার কড়ির চুপড়ি হইতে খুলিয়া লইয়াছিল ও পাছে কেহ টের পায় এই ভয়ে সর্বদা লুকাইয়া রাখে–একটা দু' পয়সা দামের পিস্তল, কতকগুলো শুকনো নাটা ফল। দেখিতে ভালো বলিয়া তাহার দিদি কোথা হইতে অনেকগুলি কুড়াইয়া আনিয়াছিল, কিছু তাহাকে দিয়াছে, কিছু সে নিজের পুতুলের বাক্সে রাখিয়া দিয়াছে। খানকতক খাপরার কুচি। গঙ্গাযমুনা খেলিতে এই খাপরাগুলির লক্ষ্য অব্যর্থ বলিয়া বিশ্বাস হওয়ায় সে এগুলি সযত্নে বাক্সে রাখিয়া দিয়াছে, এগুলি তাহার মহামূল্যবান সম্পত্তি। এতগুলি জিনিসের মধ্যে সবে সে টিনের বাঁশিটা কয়েকবার বাজাইয়া সেটির সম্বন্ধে বিগতকৌতূহল হইয়া তাহাকে এক পাশে রাখিয়া দিয়াছে। কাঠের ঘোড়া নাড়াচাড়া করা হইয়া গিয়াছে। সেটিও একপাশে পিজরাপোলের আসামীর ন্যায় পড়িয়া আছে। বর্তমানে সে গঙ্গা-যমুনা খেলিবার খাপরাগুলিকে হাতে লইয়া মনে মনে দাওয়ার উপর গঙ্গা-যমুনার ঘর আঁকা কল্পনা করিয়া চোখ বুজিয়া খাপরা ছড়িয়া দেখিতেছে, তাক ঠিক হইতেছে কিনা!

এমন সময়ে তাহার দিদি দুর্গা উঠানের কাঁঠালতলা হইতে ডাকিল।–অপু-ও অপু—। সে এতক্ষণ বাড়ি ছিল না, কোথা হইতে এইমাত্র আসিল। তাহার স্বর একটু সতর্কত মিশ্রিত। মানুষের গলার আওয়াজ পাইয়া অপু কলের পুতুলের মতো লক্ষ্মীর চুপড়ির কড়িগুলি তাড়াতাড়ি লুকাইয়া ফেলিল। পরে বলিল–কি রে দিদি?

দুর্গা হাত নাড়িয়া ডাকিল–আয় এদিকে–শোন–

দুর্গার বয়স দশ এগারো বৎসর হইল। গড়ন পাতলা পাতলা, রং অপুর মতো অতটা ফরসা নয়, একটু চাপা। হাতে কাচের চুড়ি, পরনে ময়লা কাপড়, মাথার চুল রুক্ষ–বাতাসে উড়িতেছে, মুখের গড়ন মন্দ নয়, অপুর মতো চোখগুলি বেশ ডাগর ডাগর। অপু রোয়াক হইতে নামিয়া কাছে গেল, বলিল,–কি রে?

দুর্গার হাতে একটা নারিকেলের মালা। সেটা সে নিচু করিয়া দেখাইল, কতকগুলি কচি আম কাটা। সুর নিচু করিয়া বলিল-মা ঘাট থেকে আসে নি তো?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল–উঁহু–

দুর্গা চুপি চুপি বলিল–একটু তেল আর একটু নুন নিয়ে আসতে পারিস? আমের কুশি জারাবো।–

অপু আহ্লাদের সহিত বলিয়া উঠিল–কোথায় পেলি রে দিদি?

দুর্গা বলিল–পটলিদের বাগানে সিঁদুরকোটোর তলায় পড়েছিল—আনদিকি একটু নুন তার তেল?

অপু দিদির দিকে চাহিয়া বলিল–তেলের ভাঁড় ছুলে মা মারবে যে? আমার কাপড় যে বাসি?

–তুই যা না শিগগির করে, মা'র আসতে এখন ঢের দেরি—ক্ষার কাচতে গিয়েচে–শিগগির যা–

অপু বলিল–নারকেলের মালাটা আমায় দে। ওতে ঢেলে নিয়ে আসবো।–তুই খিড়কি দোরে গিয়ে দ্যাখ মা। আসচে কিনা।

দুর্গ নিম্নস্বরে বলিল–তেল টেল যেন মেঝেতে ঢালিসনে, সাবধানে নিবি, নইলে মা টের পেয়ে যাবে।–তুই তো একটা হাবা ছেলে–

অপু বাড়ির মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলে দুর্গা তাহার হাত হইতে মালা লইয়া আমগুলি বেশ করিয়া মাখিল,–বলিল, নে হাত পাত।

–তুই অতগুলো খাবি দিদি?

–অতগুলি বুঝি হল? এই তো–ভারি বেশি।–যা, আচ্ছা নে আর দু'খানা–বাঃ, দেখতে বেশ হয়েচে রে, একটা লঙ্কা আনতে পারিস? আর একখানা দেবো তাহলে–

–লঙ্কা কি করে পাড়বো দিদি? মা যে তক্তার ওপর রেখে দ্যায়, আমি যে নাগাল পাইনে?

–তবে থাকগে যাক–আবার ওবেলা আনবো এখন–পটলিদের ডোবার ধারের আমগাছটায় গুটি যা ধরেচে–দুপুরের রোদে তলায় ঝরে পড়ে–

দুর্গাদের বাড়ির চারিদিকেই জঙ্গল। হরিহর রায়ের জ্ঞাতি-ভ্রাতা নীলমণি রায় সম্প্রতি গত বৎসর মারা গিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী পুত্রকন্যা লইয়া নিজ পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন। কাজেই পাশের এ ভিটাও জঙ্গলাবৃত হইয়া পড়িয়া আছে। নিকটে আর কোন লোকের বাড়ি নাই। পাঁচ মিনিটের পথ গেলে তবে ভুবন মুখুজ্যের বাড়ি।

হরিহরের বাড়িটাও অনেক দিন হইয়া গেল মেরামত হয় নাই, সামনের দিকের রোয়াক ভাঙী, ফাটলে বন-বিছুটির ও কালমেঘ গাছের বন গজাইয়াছে–ঘরের দোর-জানালার কপাট সব ভাঙা, নারিকেলের দড়ি দিয়া গরাদের সঙ্গে বাঁধা আছে।

খিড়কি দোর ঝনাৎ করিয়া খুলিবার শব্দ হইল এবং একটু পরেই সর্বজয়ার গলা শুনা গেল-দুগগা ও দুগগা–

দুর্গা বলিল–মা ডাকছে, যা দেখে আয়-ওখানা খেয়ে যা–মুখে যে নুনের গুড়ো লেগে আছে, মুছে ফ্যাল–

মায়ের ডাক আর একবার কানে গেলেও দুর্গার এখন উত্তর দিবার সুযোগ নাই, মুখ ভর্তি। সে তাড়াতাড়ি জারানো আমের চাকলাগুলি খাইতে লাগিল। পরে এখনও অনেক অবশিষ্ট আছে দেখিয়া কাটালগাছটার কাছে সরিয়া গিয়া গুড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া সেগুলি গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল। অপু তাহার পাশে দাঁড়াইয়া নিজের অংশ প্রাণপণে গিলিতেছিল, কারণ চিবাইয়া খাওয়ার আর সময় নাই। খাইতে খাইতে দিদির দিকে চাহিয়া সে দোষ সম্বন্ধে সচেতনতাসূচক হাসি হাসিল। দুর্গা খালি মালাটা এক টান মারিয়া ভেরেণ্ডাকচার বেড়া পার করিয়া নীলমণি রায়ের ভিটার দিকে জঙ্গলের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিল। ভাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল–মুখটা মুছে ফ্যাল না বাঁদর, নুন লেগে রয়েছে যে...

পরে দুর্গ নিরীহমুখে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া বলিল–কি মা?

–কোথায় বেরুনো হয়েছিল শুনি? একলা নিজে কতদিকে যাবো? সকাল থেকে ক্ষার কেচে গা-গতর ব্যথা হয়ে গেল, একটুখানি যদি কোনোদিক থেকে আসান আছে তোমাদের দিয়ে-অত বড় মেয়ে সংসারের কুটোগাছটা ভেঙে দুখানা করা নেই, কেবল পাড়ায় পাড়ায় টো টো টোকলা সোধে বেড়াচ্ছেন–সে বাঁদর কোথায় গেল?

অপু আসিয়া বলিল, মা, খিদে পেয়েছে!

–রোসো রোসো, একটুখানি দাঁড়াও বাপু...একটুখানি হাঁপ জিরোতে দাও! তোমাদের রাতদিন খিদে আর রাতদিন ফাই-ফরম্যাজা ও দুগগা, দ্যাখ তো বাছুরটা হাক পাড়ছে কেন?

খানিকটা পরে সর্বজয়ী রান্নাঘরের দাওয়ায় বঁটি পাতিয়া শসা কাটিতে বসিল। অপু কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল–আর এটু আটা বের করো না মা, মুখে বড্ড লাগে।

দুর্গা নিজের ভাগ হাত পাতিয়া লইয়া সংকুচিত সুরে বলিল–চালভাজা আর নেই মা?

অপু খাইতে খাইতে বলিল–উঃ, চিবানো যায় না। আমি খেয়ে যা দাঁত টকে–

দুর্গার ভ্রূকুটিমিশ্রিত চোখ-টেপায় বাধা পাইয়া তাহার কথা অর্ধপথেই বন্ধ হইয়া গেল। তাহার মা জিজ্ঞাসা করিল,–আমি কোথায় পেলি?

সত্য কথা প্রকাশ করিতে সাহসী না হইয়া অপু দিদির দিকে জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টিতে চাহিল। সর্বজয়া মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল–তুই ফের এখন বেরিয়েছিলি বুঝি?

দুর্গা বিপন্নমুখে বলিল–ওকে জিজ্ঞেস করো না? আমি–এই তো এখন কাঁঠালতলায় দাঁড়িয়ে–তুমি যখন ডাকলে তখন তো–

স্বর্ণ গোয়ালিনী গাই দুহিতে আসায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। তাহার মা বলিল–যা, বাছুরটা ধরগে যা-ডেকে ডেকে সারা হল—-কমলে বাছুর, ও সন্ন, এত বেলা করে এলে কি বাঁচে? একটু সকাল করে না এলে এই তেতাি্প্লর পজন্ত বাছুর বাঁধা–

দিদির পিছনে পিছনে অপুও দুধ দেয়া দেখিতে গেল। সে বাহির উঠানে পা দিতেই দুর্গা তাহার পিঠে দুম করিয়া নির্ঘাত এক কিল বসাইয়া দিয়া কহিল–লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর! পরে মুখে ভাঙাইয়া কহিল–আম খেয়ে দাঁত টিকে গিয়েছে—আবার কোনো দিন আম দেবো খেয়ো–ছাই দেবো।–এই ওবেলাই পটলিদের কাঁকুড়তলির আম কুড়িয়ে এনে জারাবো, এত বড় বড় গুটি হয়েছে, মিষ্টি যেন গুড়—দেবো তোমায়? খেয়ো এখন? হাবা একটা কোথাকার– যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে!

দুপুরের কিছু পরে হরিহর কাজ সারিয়া বাড়ি ফিরিল। সে আজকাল গ্রামের অন্নদা রায়ের বাটীতে গোমস্তার কাজ করে। জিজ্ঞাসা করিল–অপুকে দেখচিনে?

সর্বজয়া বলিল–অপু তো ঘরে ঘুমুচ্ছে।

–দুগগা বুঝি–

–সে সেই খেয়ে বেরিয়েছে—সে বাড়ি থাকে কখন? দুটো খাওয়ার সঙ্গে যা সম্পর্ক। আবার সেই খিদে পেলে তবে আসবে–কোথায় কার বাগানে কার আমতলায় জামতলায় ঘুরছে–এই চত্তির মাসের রোদুরে, ফের দ্যাখো না। এইজ্বরে পড়লো বলে– অত বড় মেয়ে, বলে বোঝাবো কত? কথা শোনে, না কানে নেয়?

একটু পরে হরিহর খাইতে বসিয়া বলিল-আজ দশঘরায় তাগাদার জন্যে গেছলাম, বুঝলে? একজন লোক, খুব মাতব্বর, পাঁচটা ছয়টা গোলা বাড়িতে, বেশ পয়সাওয়ালা

লোক-—আমায় দেখে দণ্ডবৎ করে বল্লে–দাদাঠাকুর আমায় চিনতে পাচ্চেন? আমি বল্লাম–না বাপু, আমি তো কই–? বল্লে–আপনার কর্তা থাকতে তখন তখন পূজাআচ্চায় সব সময়ই তিনি আসতেন, পায়ের ধুলো দিতেন। আপনারা আমাদের গুরুতুল্য লোক, এবার আমরা বাড়িসুদ্ধ মন্তর নেবো ভাবচি-ত আপনি যদি আজ্ঞে করেন, তবে ভরসা করে বলি–আপনিই কেন মন্তরটা দেন না? তা আমি তাদের বলেচি, আজ আর কোনো কথা বলবো না, ঘুরে এসে দু-এক দিনে–বুঝলে?

সর্বজয়া ডালের বাটি হাতে দাঁড়াইয়া ছিল, বাটি মেঝেতে নামাইয়া সামনে বসিয়া পড়িল। বলিল–হ্যাগো, তা মন্দ কি? দাও না ওদের মন্তর, কি জাত?

হরিহর সুর নামাইয়া বলিল—বোলো না কাউকে –সাদগোপ। তোমার তো আবার গল্প করে বেড়ানো স্বভাব–

–আমি আবার কাকে বলতে যাবো, তা হোক গে সদগোপ, দাও গিয়ে দিয়ে, এই কষ্ট যাচ্ছে–ওই রায়বাড়ির আটটা টাকা ভরসা, তাও দু’তিন মাস অন্তর। তবে দ্যায়—আর এদিকে রাজ্যের দেনা। কাল ঘাটের পথে সেজ ঠাকরুন বল্লে–বৌমা, আমি বন্দক ছাড়া টাকা ধার দিইনে–তবে তুমি অনেক করে বল্লে ব’লে দিলাম–আজ পাঁচ পাঁচ মাস হয়ে গেল, টাকা আর রাখতে পারবো না। এদিকে রাধা বোষ্টমের বৌ তো ছিঁড়ে খাচ্ছে, দু’বেলা তাগাদা আরম্ভ করেছে। ছেলেটার কাপড় নেই–দুতিন জায়গায় সেলাই, বাছা আমার তাই পরে হাসিমুখে নেচে নেচে বেড়ায়—আমার এমন হয়েচে যে ইচ্ছে করে একদিকে বেরিয়ে যাই–

–আর একটা কথা ওরা বলছিল, বুঝলে? বলছিল। গাঁয়ে তো বামুন নেই, আপনি যদি এই গাঁয়ে উঠে আসেন, তবে জায়গা-জমি দিয়ে বাস করাই–গাঁয়ে একঘর বামুন বাস করানো আমাদের বড্ড ইচ্ছে। তা কিছু ধানের জমিটমি দিতেও রাজি-পয়সার তো অভাব নেই! আজিকাল চাষীদের ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা।–ভাদর লোকেরই হয়ে পড়েচে হা ভাত যো ভাত–

আগ্রহে সর্বজয়ার কথা বন্ধ হইবার উপক্রম হইল–এখখুনি। তা তুমি রাজি হলে না কেন? বল্লেই হত যে আচ্ছা আমরা আসবো! ও-রকম একটা বড় মানুষের আশ্রয়-এ গাঁয়ে তোমার আছে কি? শুধু ভিটে কামড়ে পড়ে থাকা–

হরিহর হাসিয়া বলিল-পাগল! তখুনি কি রাজি হতে আছে? ছোটলোক, ভাববে ঠাকুরের হাড়ি দেখচি শিকেয় উঠেচে–উঁহু, ওতে খেলো হয়ে যেতে হয়–তা নয়, দেখি একবার চুপি চুপি মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে।–আর এখনওঠবল্লেইকি

ওঠা চলে? সব ব্যাটা এসে বলবে টাকা দাও, নইলে যেতে দেবো না-দেখি পরামর্শ করে কি রকম দাঁড়ায়–

এই সময়ে মেয়ে দুর্গা কোথা হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া বাহিরের দুয়ারের আড়াল হইতে সতর্কতার সহিত একবার উকি মারিল এবং অপর পক্ষ সম্পূর্ণ সজাগ দেখিয়া ও-ধারে পাঁচিলের পাশ বাহিয়া বাহির-বাটীর রোয়াকে উঠিল। দালানের দুয়ার আস্তে আস্তে ঠেলিয়া দেখিল উহা বন্ধ আছে। এদিকে রোয়াকে দাঁড়ানো অসম্ভব, রৌদ্রের তাপে পা পুড়িয়া যায়, কাজেই সে-স্থান হইতে নামিয়া গিয়া উঠানের কাঁঠালতলায় দাঁড়াইল। রৌদ্রে বেড়াইয়া তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, আঁচলের খুটে কী-কতকগুলা যত্ন করিয়া বাঁধা। সে আসিয়াছিল। এইজন্য যে, যদি বাহিরের দুয়ার খোলা পায় এবং মা ঘুমাইয়া থাকে, তবে ঘরের মধ্যে চুপি চুপি ঢুকিয়া একটু শুইয়া লইবে। কিন্তু বাবার, বিশেষত মা'র সামনে সম্মুখ দুয়ার দিয়া বাড়ি ঢুকিতে তাহার সাহসী হইল না।

উঠানে নামিয়া সে কাটালতলায় দাঁড়াইয়া কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া নিরুৎসাহ ভাবে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। পরে সেখানেই বসিয়া পড়িয়া আঁচলের খুঁট খুলিয়া কতকগুলি শুকনো রড়া ফলের বীচি বাহির করিল। খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সে আপন মনে সেগুলি গুনিতে আরম্ভ করিল, এক-দুই-তিন-চার…ছাব্বিশটা হইল। পরে সে দুই তিনটা করিয়া বীচি হাতের উলটা পিঠে বসাইয়া উঁচু করিয়া ছড়িয়া দিয়া পরে হাতের সোজা পিঠ পাতিয়া ধরিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিল– অপুকে এইগুলো দেবো।–আর এইগুলো পুতুলের বাক্সে রেখে দেবো।–কেমন বীচিগুলো তেল চুকচুক কচ্ছে–আজই গাছ থে কে পড়েচে, ভাগ্যিস আগে গেলাম, নইলে সব গরুতে খেয়ে ফেলে দিত, ওদের রাঙী গাইটা একেবারে রাক্কস, সব জায়গায় যাবে, সেবার কতকগুলো এনেছিলাম। আর এইগুলো নিয়ে অনেকগুলো হোল।

সে খেলা বন্ধ করিয়া সমস্ত বীচি আবার সযত্নে আঁচলের খুটে বাঁধিল। পরে হঠাৎ কি ভাবিয়া রুক্ষ চুলগুলি বাতাসে উড়াইতে উড়াইতে মহা খুশির সহিত পুনরায় সোজা বাটীর বাহির হইয়া গেল।

# নবম পরিচ্ছেদ

অপুদের বাড়ি হইতে কিছু দূরে একটা খুব বড় অশ্বত্থ গাছ ছিল। কেবল তাহার মাথাটা উহাদের দালানের জানোলা কি রোয়াক হইতে দেখা যায়। অপু মাঝে মাঝে সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত। যতবার সে চাহিয়া দেখে, ততবার তাহার যেন অনেক–অনেক–অনেক দূরের কোন দেশের কথা মনে হয়–কোন দেশ, এ তাহার ঠিক ধারণা হইত না–কোথায় যেন কোথাকার দেশ-মা'র মুখে ওই সব দেশের রাজপুত্ত্বরদের কথাই সে শোনে।

অনেক দূরের কথায় তাহার শিশুমনে একটা বিস্ময়মাখানো আনন্দের ভাবের সৃষ্টি করিত। নীল রং-এর আকাশটা অনেক দূর, ঘুড়িটা-কুঠির মাঠটা অনেক দূর-সে বুঝাইতে পারিত না, বলিতে পারিত না কাহাকেও, কিন্তু এসব কথায় তাহার মন যেন কোথায় উড়িয়া চলিয়া যাইত–এবং সর্বাপেক্ষা কৌতুকের বিষয় এই যে, অনেক দূরের এই কল্পনা তাহার মনকে অত্যন্ত চাপিয়া তাহাকে যেন কোথায় লইয়া ফেলিয়াছে–ঠিক সেই সময়েই মায়ের জন্য তাহার মন কেমন করিয়া উঠিত, যেখানে সে যাইতেছে সেখানে তাহার মা নাই, অমনি মায়ের কাছে। যাইবার জন্য মন আকুল হইয়া পড়িত। কতবার যে এ রকম হইয়াছে। আকাশের গায়ে অনেক দূরে একটা চিল উড়িয়া যাইতেছে-ক্রমে ছোট্ট-ছোট্ট-ছোট্ট হইয়া নীলুদের তালগাছের উঁচু মাথাটা পিছনে ফেলিয়া দূর আকাশে ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছে—চাহিয়া দেখিতে দেখিতে যেমন উড়ন্ত চিলটা দৃষ্টিপথের বাহির হইয়া যাইত, অমনি সে চোখ নামাইয়া লইয়া বাহিরবাটী হইতে এক দৌড়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিয়া গৃহকার্যরত মাকে জড়াইয়া ধরিত। মা বলিত–দ্যাখো দ্যাখো, ছেলের কাণ্ড দ্যাখো–ছাড়–ছাড়—দেখছিস সকড়ি হাত?..ছাড়ো মানিক আমার, সোনা আমার, তোমার জন্যে এই দ্যাখো চিংড়িমাছ ভাজছি–তুমি যে চিংড়িমাছ ভালোবাসো? হ্যাঁ, দুষ্টুমি করে না।–ছাড়ো–

আহারাদির পর দুপুরবেলা তাহার মা কখনও কখনও জানালার ধারে আঁচল পাতিয়া শুইয়া ছেঁড়া কাশীদাসী মহাভারতখানা সুর করিয়া পড়িত। বাড়ির ধারে নারিকেল গাছটাতে শঙ্খচিল ডাকিত, অপু নিকটে বসিয়া হাতের লেখা ক-খ লিখিতে লিখিতে একমনে মায়ের মুখের মহাভারত পড়া শুনিত। দুর্গাকে তাহার মা বলিত, একটা পান সেজে দে তো দুগগা। অপু বলিত, মা সেই ঘুটে কুড়োনোর গল্পটা? তাহার মা বলে–ঘুটে কুড়োনোর কোন গল্প বল তো–ও সেই হরিহোড়ের? সে তো অন্নদামঙ্গলে আছে, এতে তো নেই? পরে পান মুখে দিয়ে সুর করিয়া পড়িতে থাকিত–

রাজা বলে শুন শুন মুনির নন্দন।
কহিব অপূর্ব কথা না যায় বর্ণন।।
সোমদত্ত নামে রাজা সিন্ধু দেশে ঘর।

দেবদ্বিজে হিংসা সদা অতি–

অপু আমনি মায়ের মুখের কাছে হাতখানি পাতিয়া বলিত, আমায় একটু পান? মা চিবানো পান নিজের মুখ হইতে ছেলের প্রসারিত হাতের উপর রাখিয়া বলিত–এঃ, বড্ড তেতো–এই খয়েরগুলোর দোষ, রোজ হাটে বারণ করি ও-খয়ের যেন আনে না, তবুও–

জানালার বাহিরে বাঁশবনের দুপুরের রৌদ্র-মাখানো শেওড়া ঘেটু বনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মহাভারতের-বিশেষত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা শুনিতে শুনিতে সে তন্ময় হইয়া যায়। মহাভারতের সমস্ত চরিত্রের মধ্যে কর্ণের চরিত্র বড় ভালো লাগে তাহার কাছে। ইহার কারণ কর্ণের উপর তাহার কেমন একটা মমতা হয়।রথের চাকা মাটিতে পুতিয়া গিয়াছে–দুই হাতে প্রাণপণে সেই চাকা মাটি হইতে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন– সেই নিরস্ত্র অসহায়, বিপন্ন কর্ণের অনুরোধ মিনতি উপেক্ষা করিয়া অর্জ্জুন তীর ছাড়িয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিলেন!! মায়ের মুখে এই অংশ শুনিতে শুনিতে দুঃখে অপুর শিশুহৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত, চোখের জল বাগ মানিত না-চোখ ছাপাইয়া তাহার নরম তুলতুলে গাল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িত–সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দুঃখে চোখে জল পড়ার যে আনন্দ, তাহা তাহার মনোরাজ্যে নব অনুভূতির সজীবত্ব লইয়া পরিচিত হইতে লাগিল। জীবনপথের যে দিক মানুষের চোখের জলে, দীনতায়, মৃত্যুতে, আশাহত ব্যর্থতায়, বেদনায় করুণ–পুরোনো বইখানার ছেঁড়া পাতার ভরপুর গন্ধে, মায়ের মুখের মিষ্ট সুরে, রৌদ্র ভরা দুপুরের মায়া-অঙ্গুলি-নির্দেশে, তাহার শিশুদৃষ্টি অস্পষ্টভাবে সে পথের সন্ধান পাইত। বেলা পড়িলে মা গৃহকার্যে উঠিয়া গেলে, সে বাহিরে আসিয়া রোয়াকে দাঁড়াইয়া দূরের সেই অশ্বখ গাছটার দিকে এক এক দিন চাহিয়া দেখে–হয়তো কড়া চৈত্র-বৈশাখের রৌদ্রে গাছটার মাথা ধোঁয়া-ধোঁয়া অস্পষ্ট, নয়তো বৈকালের অবসন্ন রাঙা রোদ অলসভাবে গাছটার মাথায় জড়াইয়া আছে–সকলের চেয়ে এই বৈকালের রাঙা-রোদ-মাখানো গাছটার দিকে চাহিয়াই তাহার মন কেমন করিত। কর্ণ যেন ওই অশ্বখ গাছটার ওপারে আকাশের তলে, অনেক দূরে কোথায় এখনও মাটি হইতে রথের চাকা দুই হাতে প্রাণপণে টানিয়া তুলিতেছে–রোজই তোলে–রোজই তোলে–মহাবীর, কিন্তু চিরদিনের কৃপার পাত্র কর্ণা বিজয়ী বীর অর্জন নহে–যে রাজ্য পাইল, মান পাইল, রথের উপর হইতে বাণ ছড়িয়া বিপন্ন শত্রুকে নাশ করিল বিজয়ী কর্ণ—যে মানুষের চিরকালের চোখের জলে জাগিয়া রহিল, মানুষের বেদনায় অনুভূতিতে সহচর হইয়া বিরাজ করিল–সে।

এক-একদিন মহাভারতের যুদ্ধের কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হয় যুদ্ধ জিনিসটা মহাভারতে বড় কম লেখা আছে। ইহার অভাব পূর্ণ করিবার জন্য এবং আশ মিটাইয়া যুদ্ধ জিনিসটা উপভোগ করিবার জন্য সে এক উপায় বাহির করিয়াছে।

একটা বাখ্যারি কিংবা হালকা কোন গাছের ডালকে অস্ত্রীস্বরূপ হাতে লইয়া সে বাড়ির পিছনে বাঁশবাগানের পথে অথবা বাহিরের উঠানে ঘুরিয়া বেড়ায় ও আপনমনে বলে– তারপর দ্রোণ তো একেবারে দশ বাণ ছুড়লেন, অর্জন করলেন কি, একেবারে দুশোটা বাণ দিলেন মেরে! তারপর-ওঃ—সে কি যুদ্ধ! কি যুদ্ধ! বাণের চোটে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল! (এখানে সে মনে মনে যতগুলি বাণ হইলে তাহার। আশা মিটে তাহার কল্পনা করে, যদিও তাহার কল্পনার ধারা মা'র মুখে কাশীদাসী মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধের প্রণালী সম্বন্ধে যাহা শুনা আছে তাহা অতিক্রমে করে না) তারপর তো অর্জন করলেন কি, ঢাল আর তরোয়াল নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে পড়লেন–পরে এই যুদ্ধ! দুর্যোধন এলেন–ভীম এলেন–বাণে বাণে আকাশ অন্ধকার করে ফেলেচে–আর কিছু দেখা গেল না। মহাভারতের রথিগণ মাত্র অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধ করিয়া নাম কিনিয়া গিয়াছেন, কিন্তু রক্ত-মাংসের দেহে জীবন্ত থাকিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন, যশোলাভের পথ ক্রমশই কিরূপ দুর্গম হইয়া পড়িতেছে। বালকের আকাঙক্ষা নিবৃত্তি করিতে তাঁহারা মাসের পর মাস সমানভাবে অস্ত্রচালনা করিতে পারিতেন কি?

গ্রীষ্মকালের দিনটা, বৈশাখের মাঝামাঝি।

নীলমণি রায়ের ভিটার দিকে জঙ্গলের ধারে সেদিন দুপুরের কিছু পূর্বে দ্রোণগুরু বড় বিপদে পড়িয়াছেন–কপিধ্বজ রথ একেবারে তাঁহার ঘাড়ের উপরে, গান্তীব-ধনু হইতে ব্রহ্মাস্ত্র মুক্ত হইবার বিলম্ব চক্ষের পলক মাত্র, কুরুসৈন্যদলে হাহাকার উঠিয়াছে— এমন সময় শেওড়া বনের ওদিক হইতে হঠাৎ কে কৌতুকের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল– ও কি রে অপু? আপু চমকিয়া উঠিয়া আকর্ণ-টানা জ্যা-কে হঠাৎ ছাড়িয়া দিয়া চাহিয়া দেখিল তাহার দিদি জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতেছে। অপু চাহিতেই বলিল–হ্যাঁরে পাগলা, আপন মনে কি বিকচিস বিড়বিড় করে, আর হাত পা নাড়ছিস? পরে সে ছুটিয়া আসিয়া সস্নেহে ভাই-এর কচি গালে চুমু খাইয়া বলিল-পাগল! কোথাকার একটা পাগল, কি বকছিলি রে আপন মনে?

অপু লজ্জিতমুখে বার বার বলিতে লাগিল–যাঃ...বিকছিলাম বুঝি?...আচ্ছা, যাঃ–

অবশেষে দুর্গা হাসি থামাইয়া বলিল-আয় আমার সঙ্গে...

পরে সে অপুর হাত ধরিয়া বনের মধ্যে লইয়া চলিল। খানিক দূর গিয়া হাসিমুখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—দেখেচিস?...কত নোনা পেকেচে?...এখন কি করে পাড়া যায় বল দিকি?

অপু বলিল–উঃ, অনেক রে দিদি!–একটা কঞ্চি দিয়ে পাড়া যায় না?

দুর্গা বলিল-তুই এক কাজ কর, ছুটে গিয়ে বাড়ির মধ্যে থেকে আঁকুশিটা নিয়ে আয় দিকি? আঁকুশি দিয়ে টান দিলে পড়ে যাবে দেখিস এখন–

অপু বলিল–তুই এখানে দাঁড়া দিদি, আমি আনচি–

অপু আঁকুশি আনিলে দুজনে মিলিয়া বহু চেষ্টা করিয়াও চার-পাঁচটার বেশি ফল পাড়িতে পারিল না–খুব উচুগাছ, সর্বোচ্চ ডালে যে ফল আছে তাহা দুর্গা আঁকুশি দিয়াও নাগাল পাইল না। পরে সে বলিল–চল আজ। এইগুলো নিয়ে যাই, নাইবার বেলায় মাকে সঙ্গে আনবো–মার হাতে ঠিক নাগাল আসবে। দে নোনাগুলো আমার কাছে, তুই আঁকুশিটা নে। নোলক পরবি?

একটা নিচু ঝোপের মাথায় ওড়কলমি লতায় সাদা সাদা ফুলের কুড়ি, দুর্গা হাতের ফলগুলো নামাইয়া নিকটের ফুলের কুড়ি ছিড়িতে লাগিল। বলিল–এদিকে সরে আয়, নোলক পড়িয়ে দি–

তাহার দিদি ওড়কলমি ফুলের নোলক পরিতে ভালোবাসে, বনজঙ্গল সন্ধান করিয়া সে প্রায়ই খুজিয়া আনিয়া নিজে পড়ে ও ইতিপূর্বে কয়েকবার অপুকেও পরাইয়াছে। অপু কিন্তু মনে মনে নোলক-পরা পছন্দ করে না। তাহার ইচ্ছা হইল, বলে, নোলকে তাহার দরকার নাই। তবে দিদির ভয়ে সে কিছুই বলিল না। দিদিকে চটাইবার ইচ্ছা তাহার আদৌ নাই, কারণ দিদিই। বনজঙ্গল ঘুরিয়া কুলটা, জামটা, নোনাটা, আমড়াটা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে লুকাইয়া খাওয়ায়, এমন সব জিনিস জুটাইয়া আনে, যাহা হয়তো কুপথ্য হিসাবে উহাদের খাইতে নিষেধ আছে, কাজেই অন্যায় হইলেও দিদির কথা না শুনা তাহার সাহসে কুলায় না।

একটা কুড়ি ভাঙিয়া সাদা জলের মতো যে আঠা বাহির হইল, তাহার সাহায্যে দুর্গা অপুর নাকে কুড়িটি আঁটিয়া দিল, পরে নিজেও একটা পরিল–তারপর ভাইয়ের চিবুকে হাত দিয়া নিজের দিকে ভালো করিয়া ফিরাইয়া বলিল–দেখি, কেমন দেখাচ্ছে? বাঃ বেশ হয়েচে, চল মাকে দেখাইগে–

অপু লজ্জিতমুখে বলিল–না দিদি—

–চল না–খুলে ফেলিসনে যেন।–বেশ হয়েচে–

বাড়ি আসিয়া দুর্গা নোনাফলগুলি রান্নাঘরের দাওয়ায় নামাইয়া রাখিল। সর্বজয়া রাঁধিতেছিল—দেখিয়া খুব খুশি হইয়া বলিল–কোথায় পেলি রে?

দুর্গা বলিল–ওই লিচু-জঙ্গলে–অনেক আছে, কাল গিয়ে তুমি পাড়বে মা? এমনপাকা- একেবারে সিঁদুরের মতো রাঙা–

সে আড়াল ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া বলিল–দ্যাখো মা–

অপু নোলক পরিয়া দিদির পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। সর্বজয়া হাসিয়া বলিল–ও মা! ও আবার কে রে?–কে চিনতে তো পারছি নে–

অপু লজ্জায় তাড়াতাড়ি নাকের ডগা হইতে ফুলের কুড়ি খুলিয়া ফেলিল। বলিল–ওই দিদি পরিয়ে দিয়েছে–

দুর্গা হঠাৎ বলিয়া উঠিল–চল রে অপু, ওই কোথায় ডুগডুগি বাজচে, চল, বাঁদর খেলাতে এসেছে ঠিক, শিগগির আয়–

আগে আগে দুর্গা ও তাহার পিছনে পিছনে অপু ছুটিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল। সম্মুখের পথ বাহিয়া, বাঁদর নয়, ও-পাড়ার চিনিবাস ময়রা মাথায় করিয়া খাবার ফেরি করিতে বাহির হইয়াছে। ও-পাড়ায় তাহার দোকান, তা ছাড়া সে আবার গুড়ের ও ধানের ব্যবসাও করে। কিন্তু পুঁজি কম হওয়ায় কিছুতেই সুবিধা করিতে পারে না, অল্পদিনেই ফেল মারিয়া বসে। তখন হয়তো মাথায় করিয়া হাটে হাটে আলু, পটল, কখনও পান বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। শেষে তাতেও যখন সুবিধা হয় না, তখন হয়তো সে বুলি ঘাড়ে করিয়া জাত-ব্যবসা আরম্ভ করে। পরে হঠাৎ একদিন দেখা যায় যে, আবার পাথুরে চুন মাথায় করিয়া বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছে। লোকে বলে একমাত্র মাছ ছাড়া এমন কোনো জিনিস নাই, যাহা তাহাকে বিক্রয় করিতে দেখা যায় নাই। কাল দশহরা, লোকে আজ হইতেই মুড়কি সন্দেশ কিনিয়া রাখিবে। চিনিবাস হরিহর রায়ের দুয়ার দিয়া গেলেও এ বাড়ি ঢুকিল না। কারণ সে জানে এ বাড়ির লোকে কখনও কিছু কেনে না। তবুও দুর্গঅপুকে দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল– চাই নাকি?

অপু দিদির মুখের দিকে চাহিল। দুর্গ চিনিবাসের দিকে ঘাড় নাড়িয়া বলিল–নাঃ–

চিনিবাস ভুবন মুখুজ্যের বাড়ি গিয়া মাথার চাঙাড়ি নামাইতেই বাড়ির ছেলেমেয়েরা কলরব করিতে করিতে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ভুবন মুখুজ্যে অবস্থাপন্ন লোক, বাড়িতে পাঁচ-ছয়টা গোলা আছে, এ গ্রামে অন্নদা রায়ের নিচেই জমিজমা ও সম্পত্তি বিষয়ে তাহার নাম করা যাইতে পারে।

ভুবন মুখুজ্যের স্ত্রী বহুদিন মারা গিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার সেজ ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী এ সংসারের কর্ত্রী।

সেজ-বৌ-এর বয়স চল্লিশের উপর হইবে, অত্যন্ত কড়া মেজাজের মানুষ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে।

সেজ-বৌ একখানা মাজা পিতলের সরায় করিয়া চিনিবাসের নিকট হইতে মুড়কি, সন্দেশ, বাতাসা দশহরা পূজার জন্য লইলেন। ভুবন মুখুজ্যের ছেলেমেয়ে ও তাঁহার নিজের ছেলে সুনীল সেইখানেই দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের জন্যও খাবার কিনিলেন। পরে অপুকে সঙ্গে লইয়া দুর্গা চিনিবাসের পিছন পিছন ঢুকিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সেজ-বৌ নিজের ছেলে সুনীলের কাঁধে হাত দিয়া একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন– যাও না, রোয়াকে উঠে গিয়ে খাও না। এখানে ঠাকুরের জিনিস, মুখ থেকে ফেলে এঁটো করে বসবে।

চিনিবাস চাঙাড়ি মাথায় তুলিয়া পুনরায় অন্য বাড়ি চলিল। দুর্গ বলিল-আয় অপু, চল দেখিগে টুনুদের বাড়ি–

ইহারা সদর দরজা পার হইতেই সেজ-বৌ মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিলেন-দেখতে পারিনে বাপু। ছুড়িটার যে কী হ্যাংলা স্বভাব-নিজের বাড়ি আছে, গিয়ে বসে কিনে খেগে যা না? তা না, লোকের দোর দোর, যেমন মা তেমনি ছা–

ইহাদের বাটীর বাহির হইয়া দুর্গা ভাইকে আশ্বাস দিবার সুরে বলিল–চিনিবাসের ভারি তো খাবার! বাবার কাছ থেকে দেখিস রথের সময় চারটে পয়সা নেবো।–তুই দুটো, আমি দুটো। তুই আর আমি মুড়কি কিনে খাবো–

খানিকটা পরে ভাবিয়া ভাবিয়া অপু জিজ্ঞাসা করিল–রথের আর কতদিন আছে রে দিদি?

# দশম পরিচ্ছেদ

কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে।

সর্বজয়া ভুবন মুখুজ্যের বাড়ির কুয়া হইতে জল তুলিয়া আনিল, পিছনে পিছনে অপু মায়ের আঁচল মুঠা পাকাইয়া ধরিয়া ও-বাড়ি হইতে আসিল। সর্বজয়া ঘড়া নামাইয়া রাখিয়া বলিল–তা তুই পেছনে পেছনে অমন করে ঘুরতে লাগলি কেন বল দিকি? ঘরকন্নার কাজকর্ম সারবো। তবে তো ঘাটে যাবো? কাজ কর্তে দিবি না–না?

অপু বলিল–তা হোক।–কাজ তুমি ও-বেলা কোরো এখন মা, তুমি যাও ঘাটে। পরে মায়ের সহানুভূতি আকর্ষণের আশায় অতীব করুণস্বরে কহিল–আচ্ছা আমার খিদে কি পায় না? আজি চারদিন যে খাইনি।

–খাওনি তো করবো কি? রোদুরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে জ্বর বাঁধিয়ে বসবে, বল্লে কথা কানে নাও নাকি তোমরা? ছিষ্টির কাজ করবো। তবে তো ঘাটে যাব। বসে তো নেই? যা ও-রকম দুষ্টুমি করিস নে–তোমাদের ফরম্যাজ মতো কাজ করবার সাধ্যি আমার নেই, যা–

অপু মায়ের আঁচল আরও জোর করিয়া মুঠা পাকাইয়া ধরিয়া বলিল-কক্ষনো তোমায় কাজ কর্তে দেবো না। রোজই তো কাজ করো, একদিন বুঝি বাদ যাবে না? এক্ষুনি ঘাটে যাও–না, আমি শুনবো না...করো দিকি কেমন কাজ করবে?

সর্বজয়া পুত্রের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল–ও রকম দুষ্টুমি করে না, ছিঃ–এই হয়ে গ্যালো বলে, আর একটুখানি সবুর করো।–ঘাটে যাবো, ছুটে এসে তোমার ভাত চড়িয়ে দোব-দুষ্টুমি করে কি? ছাড় আঁচল, ক'খানা পলতার বড়া ভাজা খাবি বল দিকি?

ঘণ্টাখানেক পর অপু মহা উৎসাহের সহিত খাইতে বসিল।

গ্লাস তুলিয়া সে ঢকঢকা করিয়া অর্ধেকখানি খালি করিয়া ফেলিয়া, পরে আরও দু'এক গ্রাস খাইয়া কিছু ভাত পাতের নিচে ছড়াইয়া বাকি জলটুকু শেষ করিয়া হাত তুলিয়া বসিল।

–কই খাচ্ছিাস, কই? এতক্ষণ তো ভাত ভাত করে হাঁপাচ্ছিলে–পলতার বড়া– পলতার বড়া–ওই তো সবই ফেলে রাখলি, খেলি কি তবে?

সর্বজয়া একবাটি দুধ-ভাত মাখিয়া পুত্রকে খাওয়াইতে বসিল। দেখি হাঁ কর–তোমার কপালখানা–মণ্ডা না মেঠাই না, দুটো ভাত আর ভাত–তা ছেলের দশা দেখলে হয়ে

আসে–রোজ ভাত খেতে বসে মুখ কাচুমাচু-বাঁচবে কি খেয়ে? বাঁচতে কি এসেচ? আমায় জ্বালাতে এসেচ বই তো নয়–ওরকম মুখ ঘুরিও না, ছিঃ–হা করো লক্ষ্মী–দেখি এই দলাটা হলেই হয়ে গেল–আবার ওবেলা টুলুদের বাড়িতে মনসার ভাসান হবে। তুই জানিস নে বুঝি? শিগগির শিগগির খেয়ে নিয়ে চলো। আমরা সব

দুর্গা বাড়ি ঢুকিল। কোথা হইতে ঘুরিয়া আসিতেছে। এক পা ধুলা, কপালের সামনে একগোছা চুল সোজা হইয়া প্রায় চার আঙুল উঁচু হইয়া আছে। সে সব সময় আপন মনে ঘুরিতেছে–পাড়ার সমবয়সি ছেলেমেয়ের সঙ্গে তাহার বড় একটা খেলা-ধুলা নাই– কোথায় কোন ঝোপে। বৈঁচি পাকিল, কাদের বাগানে কোন গাছটায় আমের গুটি বাঁধিয়াছে, কোন বাঁশতলায় শেয়াকুল খাইতে মিষ্ট-এ সব তাহার নখদর্পণে। পথে চলিতে চলিতে সে সর্বদা পথের দুই পাশে সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে চলিয়াছে—কোথাও কাঁচপোকা বসিয়া আছে কি না। যদি কোথাও কণ্টিকারী গাছের পাকা ফল দেখিতে পাইল, তৎক্ষণাৎ খেলাঘরের বেগুন করিবার জন্য তাহা তুলিতে বসিয়া যাইবে। হয়তো পথে কোথাও বসিয়া সে নানারকমের খাপরা লইয়া ছড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে, গঙ্গা-যমুনা খেলায় কোনখানায় ভালো তাক হয়–পরীক্ষায় যেখানা ভালো বলিয়া প্রমাণিত হইবে, সেখানা সে সযত্নে আঁচলে বাঁধিয়া লইবে। সর্বদাই সে পুতুলের বাক্স ও খেলাঘরের সরঞ্জাম লইয়া মহাব্যস্ত।

সে ঢুকিয়া অপরাধীর দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিল। সর্বজয়া বলিল—এলে! এসো, ভাত তৈরি। খেয়ে আমায় উদ্ধার করো।–তারপর আবার কোন দিকে বেরুতে হবে বেরোও। বোশেখ মাসের দিন-সকলের মেয়ে দ্যাখো গে যাও সেঁজুতি করচে, শিবপুজো করচে– আর অত বড় ধাড়ি মেয়ে–দিনরাত কেবল টো টো। সেই সকাল হতে না হতে বেরিয়েচে, আর এখন এই বেলা দুপুর ঘুরে গিয়েচে, এখন এলো বাড়ি-মাথাটার ছিরি দ্যাখো না! না একটু তেল দেওয়া, না একটু চিরুনি ছোঁয়ানো-কে বলবে বামুনের মেয়ে, ঠিক যেন দুলে কি বাগদিদের কেউ–বিয়েও হবে ওই দুলে-বাগদিদের বাড়িতেই– আচলে ওগুলো কী ধনদৌলত বাঁধা-খোল–

দুর্গা ভয়ে ভয়ে আঁচলের খুঁট খুলিতে খুলিতে কহিল–ওই রায়েককাদের বাড়ির সামনে কালকাসুন্দে গাছে–পরে ঢোঁক গিলিয়া কহিল–এই অনেক বেনেবৌ তাই–

বেনেবৌয়ের কথায় হৃদয় গলে না। এমন পাষাণ জীবও জগতে অনেক আছে। সর্বজয়া তেলেবেগুনে জ্বলিয়া কহিল–তোর বেনেবৌয়ের না নিকুচি করেচে, যত ছাই আর ভাসসো রাতদিন বেঁধে নিয়ে ঘুরচেন–আজি টান মেরে তোমার পুতুলের বাক্স ওই বাঁশতলার ডোবায় যদি না ফেলি। তবে–

সর্বজয়ার কথা শেষ হইবার পূর্বেই এক ব্যাপার ঘটিল। আগে আগে ভুবন মুখুজ্যের বাড়ির সেজ-ঠাকরুন, পিছনে পিছনে তাঁহার মেয়ে টুনু ও দেওরের ছেলে সন্তু, তাহাদের পিছনে আর চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে সম্মুখ দরজা দিয়া বাড়ি ঢুকিল। সেজ-ঠাকরুন কোনো দিকে না চাহিয়া বাড়ির কাহারও সহিত কোনো আলাপ না করিয়া সোজা হন হন। করিয়া ভিতরের দিকের রোয়াকে উঠিলেন। নিজের ছেলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন–কই নিয়ে আয়–বের কর পুতুলের বাক্স, দেখি–

এ বাড়ির কেহ কোনো কথা বলিবার পূর্বেই টুনু ও সন্তু, দুজনে মিলিয়া দুর্গার টিনের পুতুলের বাক্সটা ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া রোয়াকে নামাইল এবং টুনু বাক্স খুলিয়া খানিকটা খুঁজিবার পর একছড়া পুতির মালা বাহির করিয়া বলিল–এই দ্যাখো মা, আমার সেই মালাটা—সেদিন যে সেই খেলতে গিয়েছিল, সেদিন চুরি করে এনেচে।

সতু বাক্সের এক কোণ সন্ধান করিয়া গোটাকতক আমের গুটি বাহির করিয়া বলিল–এই দ্যাখো জেঠিমা, আমাদের সোনামুখী গাছের আম পেড়ে এনেচে।

ব্যাপারটা এত হঠাৎ হইয়া গেল বা ইহাদের গতিবিধি এ বাড়ির সকলের কাছেই এত রহস্যময় মনে হইল যে এতক্ষণ কাহারও মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হয় নাই। এতক্ষণ পরে সর্বজয়া কথা খুজিয়া পাইয়া বলিল–কি, কি খুড়িমা? কি হয়েচে? পরে সে রান্নাঘরের দাওয়া হইতে ব্যগ্রভাবে উঠিয়া আসিল।

–এই দ্যাখো না কি হয়েচে, কীর্তিখানা দ্যাখো না একবার–তোমার মেয়ে সেদিন খেলতে গিয়ে টুনুর পুতুলের বাক্স থেকে এই পুতির মালা চুরি করে নিয়ে এসেচে-মেয়ে ক'দিন থেকে খুঁজে খুজে হয়রান। তারপর সন্তু গিয়ে বললে যে, তোর পুতির মালা দুগগাদিদির বাক্সের মধ্যে দেখে এলাম–দ্যাখো একবার কাণ্ড–তোমার ও মেয়ে কম নাকি? চোর-চোরের বেহদা চোর—আর ওই দ্যাখো না-বাগানের আমগুলো গুটি পড়তে দেরি সয় না–চুরি করে নিয়ে এসে বাক্সে লুকিয়ে রেখেচে।

যুগপৎ দুই চুরির অতর্কিততায় আড়ষ্ট হইয়া দুর্গা পাঁচিলের গায়ে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতেছিল। সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল–এনিচিস এই মালা ওদের বাড়ি থেকে?

দুর্গা কথার উত্তর দিতে না দিতে সেজ-বৌ বলিলেন,–না আনলে কি আর মিথ্যে করে বলচি নাকি! বলি এই আম কটা দ্যাখো না? সোনামুখীর আমি চেনো, না কি? এও কি মিথ্যে কথা?

সর্বজয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিল–না। সেজখুড়ি, আপনার মিথ্যে কথা তা তো বলিনি! আমি ওকে জিজ্ঞেস করচি।

সেজ-ঠাকরুন হাত নাড়িয়া ঝাঁজের সহিত বলিলেন–জিজ্ঞেস করো আর যা করো বাপু, ও মেয়ে সোজা মেয়ে হবে না। আমি বলে দিচ্চি–এই বয়েসে যখন চুরি বিদ্যে ধরেচে, তখন এর পর যা হবে সে টেরই পাবে! চল রে সতু—নে আমের গুটিগুলো বেঁধে নে-বাগানের আমগুলো লক্ষ্মীছাড়া ছুড়ির জ্বালায় যদি চোখে দেখবার জো আছে! টুনু, মালা নিইচিস তো?

সর্বজয়ার কি জানি কেমন একটু রাগ হইল–ঝগড়াতে সে কিছু পিছু হটবার পাত্র নয়, বলিল–পুতির মালার কথা জানিনে সেজ-খুড়ি, কিন্তু আমের গুটিগুলো, সেগুলো পেড়েছে কি তলা থেকে কুড়িয়ে এনেচে, তার গায়ে তো নাম লেখা নেই। সেজখুড়ি— আর ছেলেমানুষ যদি ধরো এনেই থাকে–

সেজ-ঠাকরুন অগ্নিমূর্তি হইয়া বলিলেন–বলি কথাগুলি তো বেশ কেটে কেটে বলচো? বলি আমের গুটিতে নাম লেখা না-হয় নেই-ই, তোমাদের কোন বাগান থেকে এগুলো এসেচে। তা বলতে পারো? বলি টাকাগুলোতেও তো নাম লেখা ছিল না।–তা তো হাত পেতে নিতে পেরেছিলে? আজ এক বিচ্ছরের ওপর হয়ে গ্যালো, আজ দেবো কাল দেবো।–আসবো এখন ওবেলা, টাকা দিয়ে দিয়ো–ও আমি আর রাখতে পারবো না– টাকার জোগাড় করে রেখো বলে দিচ্চি।

দলবলসহ সেজ-ঠাকরুন দরজার বাহির হইয়া গেলেন। সর্বজয়া শুনিতে পাইল, পথে কাহার কথার উত্তরে তিনি বেশ উচ্চকণ্ঠেই বলিতেছেন-ওই এ-বাড়ির ছুড়িটা, টুনুর বাক্স থেকে এই পুতির মালাছড়াটা চুরি করে নিয়ে গিয়ে করেচে। কি নিজের বাক্সে লুকিয়ে রেখেচে–আর দ্যাখো না। এই আমগুলো–পাশেই বাগান, যত ইচ্ছে পাড়লেই হল–তাই বলতে গেলাম, তা মা আবার কেটে কেটে বলচে(এখানে সেজ-বৌ সর্বজয়ার কথা বলিবার ভঙ্গি নকল করিলেন)–তা–এনেচে ছেলেমানুষ– ও রকম এনেই থাকে- ওতে কি তোমাদের নাম লেখা আছে নাকি? (সুর নিচু করিয়া) মা-ই কি কম চোর নাকি, মেয়ের শিক্ষে কি আর অমনি হয়েচে? বাড়িসুদ্দ সব চোর–

অপমানে দুঃখে সর্বজয়ার চোখে জল আসিল। সে ফিরিয়া দুর্গার রুক্ষ চুলের গোছা টানিয়া ধরিয়া ডাল ভাত মাখা হাতেই দুড়দাড় করিয়া তাহার পিঠে কিলের উপর কিল ও চড়ের উপর চড় মারিতে মারিতে বলিতে লাগিল–আপদবালাই একটা কোথেকে এসে জুটেছে–ম'লে ও আপদ চুকে যায়–মরেও না যে বাঁচি-হাড় জুড়োয়।–বেরো বাড়ি থেকে, দূর হয়ে যা—যা, এখখুনি বেরো–

দুর্গা মারা খাইতে খাইতে ভয়ে খিড়কি-দোর দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার ছেঁড়া রুক্ষ চুলের গোছা দু-এক গাছা সর্বজয়ার হাতে থাকিয়া গেল।

অপু খাইতে খাইতে অবাক হইয়া সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিল। দিদি পুতির মালা চুরি করিয়া আনিয়াছিল। কিনা তাহা সে জানে না-পুতির মালাটা সে ইহার আগে কোনও দিন দেখে নাই—কিন্তু আমের গুটি যে চুরির জিনিস নয় তাহা সে নিজে জানে। কাল বৈকালে দিদি তাহাকে সঙ্গে করিয়া টুলুদের বাগানে আম কুড়াইতে গিয়াছিল এবং সোণামুখীর তলায় আম কটা পড়িয়া ছিল, দিদি কুড়াইয়া লইল, সে জানে কাল হইতে অনেকবার দিদি বলিয়াছে–ও অপু, এবার সেই আমের গুটিগুলো জারাবো, কেমন তো? কিন্তু মা অসুবিধাজনকভাবে বাড়ি উপস্থিত থাকার দরুন উক্ত প্রস্তাব আর কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। দিদির অত্যন্ত আশার জিনিস আমগুলো এভাবে লইয়া গেল, তাহার উপর আবার দিদি এরূপ ভাবে মারও খাইল। দিদির চুল ছিড়িয়া দেওয়ায় মায়ের উপর তাহার অত্যন্ত রাগ হইল। যখন তাহার দিদির মাথার সামনে রুক্ষ চুলের এক গোছা খাড়া হইয়া বাতাসে উড়ে তখনই কি জানি কেন, দিদির উপর অত্যন্ত মমতা হয়–কেমন যেন মনে হয় দিদির কেহ কোথাও নাই–সে যেন একা কোথা হইতে আসিয়াছে–উহার সাথী কেহ এখানে নাই। কেবলই মনে হয়, কেমন করিয়া সে দিদির সকল দুঃখ ঘুচাইয়া দিবে–সকল অভাব পূরণ করিয়া তুলিবে! তাহার দিদিকে সে এতটুকু কষ্টে পড়িতে দিবে না।

খাওয়ার পরে অপু মায়ের ভয়ে ঘরের মধ্যে বসিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহার মন থাকিয়া থাকিয়া কেবলই বাহিরে ছুটিয়া যাইতেছিল। বেলা একটু পড়িলে সে টুনুদের বাড়ি, পাটলিদের বাড়ি, নেড়াদের বাড়ি–একে একে সকল বাড়ি খুজিল–দিদি কোথাও নাই। রাজকৃষ্ট পালিতের স্ত্রী ঘাট হইতে জল লইয়া আসিতেছিলেন—তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল–জেঠিমা, আমার দিদিকে দেখেচো? সে আজ ভাত খায়নি, কিছু খায়নি।–মা তাকে আজ বড্ড মেরেচে—মার খেয়ে কোথায় পালিয়েচে–দেখেচো জেঠিমা?

বাড়ির পাশের পথ দিয়া যাইতে যাইতে ভাবিল-বাঁশ-বাগানে সে যদি বসিয়া থাকে? সেদিকে গিয়া সমস্ত খুজিয়া দেখিল। সে খিড়কি-দরজা দিয়া বাড়ি ঢুকিয়া দেখিল, বাড়িতে কেহ নাই। তাহার মা বোধ হয় ঘাটে কি অন্য কোথাও গিয়াছে। বাড়িতে বৈকালের ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে। সম্মুখের দরজার কাছে যে বাঁশঝাড় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহার একগাছা ঝুলিয়া-পড়া শুকনো কঞ্চিতে তাহার পরিচিত সেই লেজঝোলা হলদে পাখিটা আসিয়া বসিয়াছে। রোজই সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সে কোথা হইতে আসিয়া এই বাঁশঝাড়ের ওই কিঞ্চিখানার উপর বসে–রোজ—রোজ—রোজ। আরও কত কি পাখি চারিদিকের বনে কিচ-কিচ করিতেছে। নীলমণি রায়েদের পোড়ো

ভিটা গাছপালার ঘন ছায়ায় ভরিয়া গিয়াছে। অপু রোয়াকে দাঁড়াইয়া দূরের সেই অশ্বত্থ গাছটার মাথার দিকটায় চাহিয় দেখিল–একটু একটু রাঙা রোদ গাছের মাথায় এখনও মাখানো, মগডালে একটা কি সাদা মতো দুলিতেছে, হয় বক, নয় কাহারও ঘুড়ি ছিড়িয়া আটকাইয়া বুলিতেছে–সমস্ত আকাশ জুড়িয়া যেন ছায়া আর অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে। চারিদিকে নির্জন.কেহ কোনোদিকেই নাই..নীলমণি রায়ের পোড়ো ভিটায় কচুঝাড়ের কালো ঘন সবুজ নতুন পাতা চক চক করিতেছে। তাহর মন হঠাৎ হু-হু করিয়া উঠিল। কতক্ষণ হইল, সেই গিয়াছে, বাড়ি আসে নাই, খায় নাই–কোথায় গেল দিদি?

ভুবন মুখুজ্যের বাড়ির ছেলেমেয়েরা মিলিয়া উঠানে ছুটাছুটি করিয়া লুকোচুরি খেলিতেছে। রানু তাহাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিল–ভাই, আপু এসেচে.ও আমাদের দিকে হবে, আয় রে অপু।

অপু তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল-আমি খেলবো না রানুদি,–দিদিকে দেখেচোঁ?

রানু জিজ্ঞাসা করিল–দুগগা? না, তাকে তো দেখিনি! বকুলতলায় নেই তো?

বকুলতলার কথা তাহার মনেই হয় নাই। সেখানে দুর্গা প্রায়ই থাকে বটে। ভুবন মুখুজ্যের বাড়ি হইতে সে বকুলতলায় গেল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে–বকুলগাছটা অনেক দূর পর্যন্ত জুড়িয়া ডালপালা ছড়াইয়া ঝুপসি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে–তলাটা অন্ধকার। কেহ কোথাও নাই…যদি কোনো দিকে গাছপালার আড়ালে থাকে! সে ডাক দিল–দিদি, ও দিদি! দিদি!

অন্ধকার গাছটায় কেবল কতকগুলা বক পাখী ঝটপট করিতেছে মাত্র। অপু ভয়ে ভয়ে উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল। বকুলতলা হইতে একটু দূরে একটা ডোবার ধারে খেজুর গাছ আছে, এখন ডাশা খেজুরের সময়, সেখানেও তাহার দিদি মাঝে মাঝে থাকে বটে। কিন্তু অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, ডোবাটার দুই ধারে বাঁশবন, সেখানে যাইয়া দেখিতে তাহার সাহসী হইল না। বকুলগাছের গুড়ির কাছে সরিয়া গিয়া সে দুই-একবার চিৎকার করিয়া ডাকিল-ভাটিশেওড়া বনে কি জন্তু তাহার গলার সাড়া পাইয়া খসি খসি শব্দ করিয়া ডোবার দিকে ছুটিয়া পলাইল।

বাড়ির পথে ফিরিতে ফিরিতে হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল। সামনে সেই গাব গাছটা! এক সন্ধ্যার পর এ গাবগাছের তলার পথ দিয়া যাওয়া! সর্বনাশ! গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে। কেন যে তাহার এই গাছটার নিচে দিয়া যাইতে ভয় করে, তাহা সে জানে না। কোন কারণ নাই, এমনিই ভয় করে এবং কারণ কিছু নাই বলিয়া ভয় অত্যন্ত বেশি করে।

এত দেরি পর্যন্ত সে কোনো দিন বাড়ির বাহিরে থাকে নাই–আজ তাহার সে খেয়াল হইল না। মন ব্যস্ত ও অন্যমনস্ক না থাকিলে সে কখনই এপথে আসিত না।

অপু খানিকক্ষণ অন্ধকার গাবতলাটার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফিরিল। তাহাদের বাড়ি যাইবার আর একটা পথ আছে–একটুখানি ঘুরিয়া পটলিদের বাড়ির উঠান দিয়া গেলে গাবতলার এ অজানা বিভীষিকার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

পাটলির ঠাকুরমা সন্ধ্যার সময় বাড়ির রোয়াকে ছেলেপিলেদের লইয়া হাওয়ায় বসিয়া গল্প করিতেছেন। পাটলির মা রান্নাঘরে রাঁধিতেছেন। উঠানের মাচাতলায় বিধু জেলেনি দাঁড়াইয়া মাছ বিক্রয়ের পয়সা তাগাদা করিতেছে।

অপু বলিল–দিদিকে খুঁজতে গিয়েছিলাম ঠাকুমা—বকুলতলা থেকে আসতে আসতে–

ঠাকুরমা বলিলেন–দুগগা এই তো বাড়ি গেল। এই কতক্ষণ যাচ্ছে–ছুটে যা দিকি– বোধ হয় এখনও বাড়ি গিয়ে পৌঁছয়নি–

সে এক দৌড়ে বাড়ির দিকে ছুটিল। পিছন হইতে পাটলির বোন রাজী চেচাইয়া বলিল– কাল সকালে আসিস অপু–আমরা গঙ্গা-যমুনা খেলার নতুন ঘর কেটেছি! টেকশালের পেছনে নিমতলায়–দুগগাকে বলিস–

তাহাদের বাড়ির কাছে আসিয়া পৌঁছিয়া হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল–দুর্গা আর্তস্বরে চিৎকার করিতে করিতে বাড়ির দরজা দিয়া দৌড়াইয়া বাহির হইতেছে– পিছনে পিছনে তাহার মা কি একটা হাতে মারিতে মারিতে তাড়া করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। দুর্গা গাবতলার পথ দিয়া ছুটিয়া পলাইল, মা দরজা হইতে ধাবমানা মেয়ের পিছনে চেচাইয়া বলিল–যাও বেরোও–একেবারে জন্মের মতো যাও–আর কক্ষনো বাড়ি যেন ঢুকতে না হয়—বালাই, আপদ চুকে যাক-একেবারে ছাতিমতলায় দিয়ে আসি।

ছাতিমতলায় গ্রামের শ্মশান। অপুর সমস্ত শরীর যেন জমিয়া পাথরের মতো আড়ষ্ট ও ভারী হইয়া গেল। তাহার মা সবেমাত্র ভিতরের বাড়িতে ঢুকিয়া মাটির প্রদীপটা রোয়াকের ধার হইতে উঠাইয়া লইতেছে। সে পা টিপিয়া টিপিয়া বাড়ি ঢুকিতেই তাহার মা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল–তুমি আবার এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে শুনি? মোটে তো আজ ভাত খেয়েচো?

তাহার মনে নানা প্রশ্ন জাগিতেছিল। দিদি আবার মারা খাইল কেন? সে এতক্ষণ কোথায় ছিল? দুপুর বেলা দিদি কি খাইল? সে কি আবার কোন জিনিস চুরি করিয়া

আনিয়াছে? কিন্তু ভয়ে কোনো কথা না বলিয়া সে কলের পুতুলের মতো মায়ের কথামতো কাজ করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল। পরে ভয়ে ভয়ে প্রদীপ উসকাইয়া দিয়া নিজের ছোট বইয়ের দপ্তরটি বাহির করিয়া পড়িতে বসিল। সে পড়ে মাে◌টে তৃতীয় ভাগ-কিন্তু তাহার দপ্তরে দুখানা মোটা মোটা ভারী ইংরাজি কি বই, কবিরাজি ঔষধের তালিকা, একখানা পাতা-ছেড়া দাশুরায়ের পাঁচালি, একখানা ১৩০৩ সালের পুরাতন পাঁজি প্রভৃতি আছে। সে নানাস্থান হইতে চাহিয়া এগুলি জোগাড় করিয়াছে এবং এগুলি না পড়িতে পারিলেও রোজ একবার করিয়া খুলিয়া দেখে।

খানিকক্ষণ দেওয়ালের দিকে চাহিয়া সে কি ভাবিল। পরে আর একবার প্রদীপ উসকাইয়া দিয়া পাতা-ছেড়া দাশুরায়ের পাঁচালিখানা খুলিয়া অন্যমনস্কভাবে পাতা উলটাইতেছে, এমন সময়ে সর্বজয়া এক বাটি দুধ হাতে করিয়া ঢুকিয়া বলিল–এসো, খেয়ে নাও দিকি!

অপু দ্বিরুক্তি না করিয়া বাটি উঠাইয়া লইয়া দুধ চুমুক দিয়া খাইতে লাগিল। অন্যদিন হইলে এত সহজে দুধ খাইতে তাহাকে রাজি করানো খুব কঠিন হইত।একটুখানি মাত্র খাইয়া সে বাটি মুখ হইতে নামাইল। সর্বজয়া বলিল–ওকি? নাও সবটুকু খেয়ে ফেলো–ওইটুকু দুধ ফেললে তবে বাঁচবে কি খেয়ে–

অপু বিনা প্রতিবাদে দুধের বাটি পুনরায় মুখে উঠাইল। সর্বজয়া দেখিল সে মুখে বাটি ধরিয়া রহিয়াছে কিন্তু চুমুক দিতেছে না।–তাহার বাটিসুদ্ধ হাতটা কাঁপিতেছে. পরে অনেকক্ষণ মুখে ধরিয়া রাখিয়া হঠাৎ বাটি নামাইয়া সে মায়ের দিকে চাহিয়া ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। সর্বজয়া আশ্চর্য হইয়া বলিল–কি হল রে? কি হয়েচে, জিভ কামড়ে ফেলেছিস?

অপু মায়ের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের বাঁধ না মানিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল–দিদির জন্য বড্ড মন কেমন করছে!...

সর্বজয়া অল্পক্ষণ মাত্র চুপ করিয়া বসিয়া পরে সরিয়া আসিয়া ছেলের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে শান্তসুরে বলিতে লাগিল–কেন্দো না, অমন করে কেন্দো না,-ওই পটলিদের কি নেড়াদের বাড়ি বসে আছে–কোথায় যাবে অন্ধকারে? কম দুষ্ট মেয়ে নাকি? সেই দুপুর বেলা বেরুল–সমস্ত দিনের মধ্যে আর চুলের টিকি দেখা গেল না–না খাওয়া, না দাওয়া, কোথায় ও-পাড়ার পালিতদের বাগানে বসে ছিল, সেখানে বসে কাঁচা আমি আর জামরুল খেয়েচে, এক্ষুনি ডাকতে পাঠাচ্ছি–কেন্দো না আমনকরে–আবার জ্বর আসবে।–ছিঃ!

পরে সে আঁচল দিয়া ছেলের চোখের জল মুছইয়া দিয়া বাকি দুধ টুকু খাওয়াইবার জন্য বাটি তাহার মুখে তুলিয়া ধরিল-হাঁ করো দিকি, লক্ষ্মী সোনা, উনি এলেই ডেকে আনবেন এখন—একেবারে পাগল–কোথেকে একটা পাগল এসে জন্মেছে—আর এক চুমুক–হ্যাঁ–

রাত অনেক হইয়াছে। উত্তরের ঘরে তক্তাপোশে অপু ও দুর্গা শুইয়া আছে। অপুর পাশে তাহার মায়ের শুইবার জায়গা খালি আছে। কারণ মা এখন রান্নাঘরের কাজ সারিয়া আসে নাই। তাহার বাবা আহারাদি সারিয়া পাশের ঘরে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। বাবা বাড়ি আসিয়া দুর্গাকে পাড়া হইতে খুজিয়া আনিয়াছেন।

বাড়ি আসিয়া পর্যন্ত দুর্গা কাহারও সঙ্গে কোনো কথা বলে নাই। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া আসিয়া চুপ করিয়া শুইয়াছে। অপু দুর্গার গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল–দিদি, মা কি দিয়ে মেরেছিল রে সন্ধেবেলা? তোর চুল ছিঁড়ে দিয়েচে?

দুর্গার মুখে কোন কথা নাই।

সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল-আমার উপর রাগ করেছিস দিদি? আমি তো কিছু করিনি।

দুর্গা আস্তে আস্তে বলিল–না বইকি! তবে সন্তু কি করে টের পেলে যে পুতির মালা আমার বাক্সে আছে?

অপু প্রতিবাদের উত্তেজনায় উঠিয়া বসিল।–না–সত্যি আমি তোর গা ছুয়ে বলচি দিদি, আমি তো দেখাইনি। আমি জানিনে যে তোর বাক্সে আছে।–কাল সন্তু বিকেল বেলা এসেছিল, ওর সেই বড় রাঙা ভাঁটাটা নিয়ে আমরা খেলছিলাম–তার পর, বুঝলি দিদি, সতু তোর পুতুলের বাক্স খুলে কি দেখছিল–আমি বল্লাম, ভাই, তুমি আমার দিদির বাক্সে হাত দিয়ে না।–দিদি আমাকে বকে–সেই সময়ে দেখেচে–

পরে সে দুর্গার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল–খুব লেগেচে রে দিদি? কোথায় মেরেচে মা?

দুর্গা বলিল–আমার কানের পাশে মা একটা বাড়ি যা মেরেছে–রক্ত বেরিয়েছিল, এখনও কন কন কচ্ছে, এইখানে এই দ্যাখা হাত দিয়ে! এই–

–এইখানে? তাই তো রে! কেটে গিয়েছে যে? একটু পিন্দিমের তেল লাগিয়ে দেব দিদি?

–থাকগে-কাল পালিতদের বাগানে বিকেল বেলা যাব বুঝলি? কামরাঙা যা পেকেছে? এই এত বড় বড়, কাউকে যেন বলিসনে! তুই আর আমি চুপি চুপি যাবো।–আমি আজ দুপুরবেলা দুটো পেড়ে খেয়েছি।–মিষ্টি যেন গুড়–

# একাদশ পরিচ্ছেদ

এদিনের ব্যাপারটা এইরূপে ঘটিল।

অপু বাবার আদেশে তালপাতে সাতখানা ক খ হাতের লেখা শেষ করিয়া কি করা যায় ভাবিতে ভাবিতে বাড়ির মধ্যে দিদিকে খুজিতে গেল। দুর্গা মায়ের ভয়ে সকালে নাহিয়া আসিয়া ভিতরের উঠানে পেপেতলায় পুণ্যিপুকুরের ব্রত করিতেছে। উঠানে ছোট্ট চৌকোণা গর্ত কাটিয়া তাহার চারিধারে ছোলা, মটর ছড়াইয়া দিয়াছিল–ভিজে মাটিতে সেগুলির অঙ্কুর বাহির হইয়াছে—চারিদিকে কলার ছোট বোগ পুতিয়া ধারে পিটুলি গোলার আলপনা। দিতেছে-পদ্মলতা, পাখি, ধানের শিষ, নতুন ওঠা সূর্য।

দুর্গা বলিল–দাঁড়া, এই মন্তরটা বলে নিয়ে চল এক জায়গায় যাবো।

–কোথা রে দিদি?

–চল না, নিয়ে যাবো এখন, দেখিস এখন–। পরে আনুষঙ্গিক বিধি-অনুষ্ঠান সাঙ্গ করিয়া সে এক নিশ্বাসে আবৃত্তি করিতে লাগিল–

পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা কে পুজে রে দুপুর বেলা?

আমি সতী লীলাবতী ভায়ের বোন ভাগ্যবতী–

অপু দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল, বিদ্রুপের ভঙ্গিতে হাসিয়া বলিল–ইঃ।

দুর্গা ছড়া থামাইয়া ঈষৎ লজ্জা-মিশানো হাসির সঙ্গে বলিল–তুই ও-রকম কচ্চিস কেন? যা এখান থেকে–তোর এখানে কি?–যা।

অপু হাসিয়া চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে আবৃত্তি করিতে লাগিল-আমি সতী লীলাবতী, ভাই বোন ভাগ্যবতী, হি হি–ভাই বোন ভাগ্যবতী–হি–হি–

দুর্গা বলিল, তোমার বড় ইয়ে হয়েচে, না? মাকে বলে তোমার ভ্যাংচানো বার করবো। ੨R–

ব্রতানুষ্ঠান শেষ করিয়া দুর্গা বলিল, চল গড়ের পুকুরে অনেক পানফল হয়ে আছে–ভোঁদার মা বলছিল, চল নিয়ে আসি–

গ্রামের একেবারে উত্তরাংশে চারিধারে বাঁশবন ও আগাছা এবং প্রাচীন। আম-কাঁঠালের বাগানের ভিতর দিয়া পথ। লোকালয় হইতে অনেক দূরে গভীর বন যেখানে

শেষ হইয়াছে, সেখানে মাঠের ধারে মজা পুকুরটা। কোনকালে গ্রামের আদি বাসিন্দা মজুমদারদের বাড়ির চতুর্দিকে যে গড়খাই ছিল তাহার অন্য অংশ এখন ভরাট হইয়া গিয়াছে।–কেবল এই খাতটাতে বারো মাস জল থাকে, ইহারই নাম গড়ের পুকুর। মজুমদারদের বাড়ির কোন চিহ্ন এখন নাই।

সেখানে পৌঁছিয়া তাহারা দেখিল পুকুরে পানফল অনেক আছে বটে, কিন্তু কিনারার ধারে বিশেষ কিছু নাই, সবই জল হইতে দূরে। দূর্গ বলিল–অপু, একটা বাঁশের কঞ্চি দ্যাখ তো খুঁজে–তাই দিয়ে টেনে টেনে আনবো। পরে সে পুকুরধারের ঝোপের শেওড়া গাছ হইতে পাকা শেওড়ার ফল তুলিয়া খাইতে লাগিল। অপু বনের মধ্যে কঞ্চি খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে পাইয়া বলিল-ও দিদি, ও ফল খাসনি!–দূর-আশ-শ্যাওড়ার ফল কি খায় রে! ও-তো পাখিতে খায়–

দুর্গা পাকা ফল টিপিয়া বীজ বাহির করিতে করিতে বলিল-আয় দিকি—দাখ দিকি খেয়ে-মিষ্টি যেন গুড়-কে বলেচে খায় না? আমি তো কত খোইচি।

অপু কিঞ্চি কুড়ানো রাখিয়া দিদির কাছে আসিয়া বলিল-খেলে যে বলে পাগল হয়? আমায় একটা দে দিকি, দিদি–

পরে সে খাইয়া মুখ একটু কাঁচুমাচু করিয়া বলিল—এন্‌টু এন্‌টু তেতো যে দিদি–

–তা এন্‌টু তেতো থাকবে না? তা থাক, কিন্তু কেমন মিষ্টি বল দিকি-কথা শেষ করিয়া দুর্গা খুব খুশির সহিত গোটাকতক বড়বড় পাকা ফল মুখের মধ্যে পুরিল।

জন্মিয়া পর্যন্ত ইহারা কখনও কোনো ভালো জিনিস খাইতে পায় নাই। অথচ পৃথিবী ইহারা নূতন আসিয়াছে, জিহবা ইহাদের নূতন—তাহা পৃথিবীর নানা রস, বিশেষত মি রস আস্বাদ করিবার জন্য লালায়িত। সন্দেশ মিঠাই কিনিয়া সে পরিতৃপ্তি লাভ করিবা সুযোগ ইহাদের ঘটে না-বিশ্বের অনন্ত সম্পদের মধ্যে তুচ্ছ বনগাছ হইতে মিষ্টরস আহরণরত এই সব লুব্ধ দরিদ্র ঘরের বালকবালিকাদের জন্য তাই করুণাময়ী বনদেবীরা বনের তুচ্ছ ফুলফল মিষ্টি মধুতে ভরাইয়া রাখেন।

খানিকটা পরে দুর্গা পুকুরের জলে একটু নামিয়া বলিল—ক'ত নাল ফুল রয়েছে। আপু! দাঁড়া তুলছি। জলে আরও নামিয়া সে দুইটা ফুলের লতা ধরিয়া টানিল–ডাঙায় ছুড়িয়া দিয়া বলিল–ধর অপু।

অপু বলিল–পানফল তো খুব জলে–ওখানে কি করে যাবি দিদি?

দুর্গ একটা কঞ্চি দিয়া দূর জলের পানফলের গাছগুলো টানিবার চেষ্টা করিয়া পারিল না। বলিল–বড্ড গড়ানে পুকুর রে– গড়িয়ে যাচ্ছি ডুবজলে–নাগাল পাইকি করে? তুই এক কাজ কর, পেছন থেকে আমার আঁচল ধরে টেনে রাখা দিকি, আমি কিঞ্চি দিয়ে পানফলের ওই বাকিটা টেনে আনি।

বনের মধ্যে হলদে কি একটা পাখি ময়নাকাটা গাছের ডালের আগায় বসিয়া পাতা নাচাইয়া ভারি চমৎকার শিস দিতেছিল। অপু চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল–কি পাখি রে দিদি?

–পাখি-টাখি এখন থাক–ধর দিকি বেশ করে। আচলটা টেনে, গড়িয়ে যাবো–জোর করে–

অপু পিছন হইতে আঁচল টানিয়া রহিল। দুর্গ পায়ে পায়ে নামিয়া যতদূর যায় কঞ্চি আগাইয়া দিল। কাপড়-চোপড় ভিজিয়া গেল তবু নাগাল আসে না–আরও একটুখানি নামিয়া আঙুলের আগায় মাত্র কঞ্চিখানাকে ধরিয়া টানিবার চেষ্টা করিল। অপু টানিয়া ধরিয়া থাকিতে থাকিতে শক্তিতে আর কুলাইতেছে না দেখিয়া পিছন হইতে হাসিয়া উঠিল।। হাসির সঙ্গে আঁচল ঢিলা হওয়াতে দুর্গা জলের দিকে ঝুকিয়া পড়িল কিন্তু তখনই সামলাইয়া হাসিয়া বলিল-দূর, তুই যদি কোনো কাজের ছেলে-ধর ফের। অতিকষ্টে একটা পানফলের ঝাঁক কাছে আসিল–দুর্গা কৌতূহলের সহিত দেখিতে লাগিল কতগুলা পানিফল ধরিয়াছে। পরে ডাঙায় ছুড়িয়া দিয়া বলিল-বড্ড কচি, এখনও দুধ হয়নি মধ্যে, আর একবার ধর তো। অপু আবার পিছন হইতে টানিয়া ধরিয়া রহিল। খানিকটা থাকিবার পর সে দিদির বুকিবার সঙ্গে সঙ্গে টানের চোটে আবার দু-এক পা জলের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল–পরে কাপড় ভিজিয়া যায় দেখিয়া হাল ছাড়িয়া হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দুর্গা হাসিয়া বলিল-দূরা

ভাইবোনের কলহাস্যে খানিকক্ষণ ধরিয়া পুকুরপ্রান্তের নির্জন বাঁশবাগান মুখরিত হইতে লাগিল। দুর্গা বলিল–এতটুকু যদি জোর থাকে তোর গায়ে! গাবের ঢেঁকি কোথাকার!

খানিকটা পরে দুর্গা জলে নামিয়া আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতেছে, অপু ডাঙায় দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় অপু পাশের একটা শ্যাওড়া গাছের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া চেচাইয়া বলিয়া উঠিল–দিদি, দ্যাক কি এখানে!... পরে সে ছুটিয়া গিয়া মাটি খুঁড়িয়া কি তুলিতে লাগিল।

দুর্গা জল হইতে জিজ্ঞাসা করিল–কি রে? পরে সেও উঠিয়া ভাইয়ের কাছে আসিল।

অপু ততক্ষণ মাটি খুঁড়িয়া কি একটা বাহির করিয়া কোঁচার কাপড় দিয়া মাটি মুছিয়া সাফ করিতেছে। হাতে করিয়া আহ্লাদের সহিত দিদিকে দেখাইয়া বলিল–দ্যাখ দিদি, চকচক কচ্ছে–কি জিনিস রে?

দুর্গা হাতে লইয়া দেখিল–গোলমত একদিক ছুচোলো পল-কাটা-কাটা চকচকে কি একটা জিনিস। সে খানিকক্ষণ আগ্রহের সহিত নানাভাবে উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিতে লাগিল।

হঠাৎ কি ভাবিয়া তাহার রুক্ষ চুলে-ঘেরা মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কেহ দেখিতেছে কিনা। চুপিচুপি বলিল–অপু, এটা বোধ হয় হীরে! চুপ কর, চেচাসনে। পরে সে ভয়ে ভয়ে আর একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।

অপু দিদির দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। হীরক বস্তুটি তাহার অজ্ঞাত নয় বটে, মায়ের মুখে দিদির মুখে রূপকথার রাজপুত্র ও রাজকন্যার হীরামুক্তার অলঙ্কারের ঘটা সে অনেকবার শুনিয়াছে কিনা হীরা জিনিসটা কি রকম দেখিতে, সে সম্বন্ধে তাহার মনে একটু ভুল ধারণা ছিল। তাহার মনে হইত হীরা দেখিতে মাছের ডিমের মতো, হলদে হলদে, তবে নরম নয়–শক্ত।...

সর্বজয়া বাড়ি ছিল না, পাড়া হইতে আসিয়া দেখিল–ছেলেমেয়ে বাড়ির ভিতর দিকে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। কাছে। যাইতে দুর্গা চুপিচুপি বলিল–মা, একটা জিনিস কুড়িয়ে পেয়েচি আমরা। গড়ের পুকুরে পানফল তুলতে গিইছিলাম মা। সেখানে জঙ্গলের মধ্যে এটি পোঁতা ছিল।

অপু বলিল–আমি দেখে দিদিকে বল্লাম, মা।

নসটা খুলিয়া মায়ের হাতে দিয়া বলিল–দ্যাখো দিকি কী এটা

দুর্গা আঁচল হইতে জিনিসটা খুলিয়া মায়ের হাতে দিয়া বলিল—দ্যাখো দিকি কী এটা মা?

সর্বজয়া উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিতে লাগিল। দুর্গা চুপিচুপি বলিল–মা, এটা ঠিক হীরে–নয়?

সর্বজয়ারও হীরক সম্বন্ধে ধারণা তাহাদের অপেক্ষা বেশি স্পষ্ট নহে। সে সন্দিগ্ধ সুরে জিজ্ঞাসা করিল–তুই কি করে জানালি হীরে?

দুর্গা বলিল–মজুমদারেরা বড়লোক ছিল তো মা? ওদের ভিটের জঙ্গলে কারা নাকি মোহর কুড়িয়ে পেয়েছিল—পিসি গল্প করতো। এটা একেবারে পুকুরের ধারে বনের মধ্যে পোঁতা ছিল, রোদুর লেগে চকচক কচ্ছিল, এ ঠিক মা হীরে।

সর্বজয়া বলিল-আগে উনি আসুন, ওঁকে দেখাই।

দুর্গা বাহিরে উঠানে আসিয়া আহ্বাদের সহিত ভাইকে বলিল–হীরে যদি হয় তবে দেখিস আমরা বড়মানুষ হয়ে যাবো।

অপু না বুঝিয়া বোকার মতো হি হি করিয়া হাসিল।

ছেলেমেয়ে চলিয়া গেলে জিনিসটা বাহির করিয়া সর্বজয়া ভালো করিয়া দেখিতে লাগিল। গোলমতো, ধারকাটা ও পালতোলা, এক মুখ ছুচোলো-যেন সিন্দূর কৌটার ঢাকনির উপরটা। বেশ চকচকে। সর্বজয়ার মনে হইল যেন অনেক রকম রং সে ইহার মধ্যে দেখিতে পাইতেছে। তবে কাচ যে নয়–ইহা ঠিক। এ রকম ধরনের কাচ সে কখনও দেখিয়াছে বলিয়া তো মনে হয় না। হঠাৎ তাহার সমস্ত গা দিয়া যেন কিসের স্রোত বহিয়া গেল, তাহার মনের এক কোণে নানা সন্দেহের বাধা ঠেলিয়া একটা গাঢ় দুরাশা ভয়ে ভয়ে একটু উকি মারিল–সত্যিই যদি হীরে হয়, তা হলে?

হীরক সম্বন্ধে তাহার ধারণাটা পরশপাথর কিংবা সাপের মাথার মণি জাতীয় ছিল। কাহিনীর কথা মাত্র, বাস্তব জগতে বড় একটা দেখা যায় না। আর যদি বা দেখা যায়, তবে দুনিয়ার ঐশ্বর্য বোধ হয় এক টুকরা হীরার বদলে পাওয়া যাইতে পারে।

খানিকটা পরে একটা পুটুলি হাতে হরিহর বাড়ি ঢুকিল।

সর্বজয়া বলিল–ওগো, শোনো, এদিকে এসো তো! দ্যাখো তো এটা কি!

হরিহর হাতে লইয়া বলিল–কোথায় পেলে?

–দুগগা গড়ের পুকুরে পানফল তুলতে গিয়েছিল, কুড়িয়ে পেয়েচে। কি বলো দিকি?

হরিহর খানিকক্ষণ উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিয়া বলিল–কাচ, না-হয় পাথর-টাথর হবে-একটুকু জিনিস, ঠিক বুঝতে পারচি নে।

সর্বজয়ার মনে একটুখানি ক্ষীণ আশার রেখা দেখা দিল–কাচ হইলে তাহার স্বামী কি চিনিতে পারিত না? পরে সে চুপিচুপি, যেন পাছে স্বামী বিরুদ্ধযুক্তি দেখায় এই ভয়ে

বলিল–হীরে নয় তো? দুগগা বলছিল মজুমদার বাড়ির গড়ে তো কত লোক কত কি কুড়িয়ে পেয়েচে! যদি হীরে হয়?

–হ্যাঁ, হীরে যদি পথেঘাটে পাওয়া যেত। তবে আর ভাবনা কি ছিল? তুমিও যেমন!... তাহার মনে মনে ধারণা হইল ইহা কাচ। পরীক্ষণেই কিন্তু মনে হইল হয়তো হইতেও পারে। বলা যায় কি! মজুমদারেরা বড়লোক ছিল। বিচিত্র কি যে হয়তো তাদেরই গহনায়-টহনায় কোনো কালে বসানো ছিল, কি করিয়া মাটির মধ্যে পুঁতিয়া গিয়াছে। কথায় বলে, কপালে না থাকিলে গুপ্তধন হাতে পড়িলে চেনা য্যা না—শেষে কি দরিদ্র ব্রাহ্মণের গল্পের মত ঘটিবে? সে বলিল—আচ্ছা দাঁড়াও, একবার বরং গাঙ্গুলী-বাড়ি দেখিয়ে আসি।

রাঁধিতে রাঁধিতে সর্ব্বজয়া বার বার মনে মনে বলিতে লাগিল—দোহাই ঠাকুর, কত লোক তো কত কি কুড়িয়ে পায়! এই কষ্ট যাচ্ছে সংসারের—বাছাদের দিকে মুখ তুলে তাকিও—দোহাই ঠাকুর!

তাহার বুকের মধ্যে টিপ্ টিপ্ করিতেছিল।

খানিকটা পরে দুর্গা বাড়ী আসিয়া আগ্রহের সুরে বলিল—বাবা এখনও বাড়ী ফেরে নি, হ্যাঁ মা?

সঙ্গে সঙ্গে হরিহর বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া বলিল—হুঁঃ, তখনই আমি বললাম এ কিছুই নয়। গাঙ্গুলী মশায়ের জামাই সত্যবাবু কলকাতা থেকে এসেছেন—তিনি দেখে বল্লেন, এ একরকম বেলোয়ারী কাচ—ঝাড়-লণ্ঠনে ঝুলানো থাকে। রাস্তাঘাটে যদি হীরে-জহরৎ পাওয়া যেত তা হলে...তুমিও যেমন।

# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বৈশাখ মাসের দিন। প্রায় দুপুর বেলা।

সর্বজয়া বাটনা বাটিতে বাটিতে ডান হাতের কাছে রক্ষিত একটা ফুলের সাজিতে (অনেকদিন হইতে ফুলের সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক নাই, মশলা রাখিবার পাত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়) মশলা খুঁজতে গিয়া বলিল–আবার জিরে-মরিচের পুঁটুলটা কোথায় নিয়ে পালালি? বড্ড জ্বালাতন কচ্চিস অপু-রাঁধতে দিবিনে? তারপর একটু পরেই বোলো এখন–মা ক্ষিদে পেয়েছে।

অপুর দেখা নাই।

–দিয়ে যা বাপ আমার, লক্ষ্মী আমার-কেন জ্বালাতন কচ্চিস বল দিকি? দেখচিস বেলা হয়ে যাচ্ছে।

অপু রান্নাঘরের ভিতর হইতে দুয়ারের পাশ দিয়া ঈষৎ উঁকি মারিল, মায়ের চোখ সেদিকে পড়িতেই তাহার দুষ্টুমির হাসি-ভরা টুকটুকে মুখখানা শামুকের খোলার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবার মতো তৎক্ষণাৎ আবার দুয়ারের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল। সর্বজয়া বলিল—দ্যাখ্ দিকি কাণ্ড–কেন বাপু দিক্ করিস। দুপুরবেলা? দিয়ে যা–

অপু পুনরায় হাসিমুখে ঈষৎ উঁকি মারিল।

—ওই আমি দেখতে পেয়েছি–আর লুকুতে হবে না, দিয়ে যা—

—হি-হি-হি–আমোদের হাসি হাসিয়া সে আবার দুয়ারের আড়ালে মুখ লুকাইল।

সর্বজয়া ছেলেকে ভালোরূপেই চিনিত। যখন অপু ছোট্ট খোকা দেড়বছরেরটি, তখন দেখিতে সে এখনকার চেয়েও টুকটুকে ফরসা ছিল। সর্বজয়ার মনে আছে, সে তাহার ডাগর চোখ দুটিতে বেশ করিয়া কাজল পরাইয়া কপালের মাঝখানে একটি টিপ পরাইয়া দিত ও তাহার মাথায় একটা নীল রং-এর কম দামের ঘন্টিওয়ালা পশমের টুপি পরাইয়া, কোলে করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে বাহিরের রকে দাঁড়াইয়া ঘুম পাড়াইবার উদ্দেশ্যে সুর টানিয়া টানিয়া বলিত–

আয় রে পাখি-ই-ই লেজঝোলা,
আমার খোকনকে নিয়ে-এ-এ-গাছে তোলা…

খোকা ট্যাঁপা-ট্যাঁপা ফুলো-ফুলো গালে মায়ের মুখের দিকে হ্যাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত, পরে হঠাৎ কি মনে করিয়া সম্পূর্ণ দন্তহীন মাড়ি বাহির করিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া মলা-পরা অসম্ভবরদীপ ছোট্ট পায়ে মাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মায়ের পিঠের দিকে মুখ লুকাইত। সর্বজয়া হাসিমুখে বলিত-ওমা, খোকা আবার কোথায় লুকুলো? তাই তো, দেখতে তো পাচ্ছিনে! ও খোকা!... পরে সে ঘাড়ের দিকে মুখ ফিরাইতেই শিশু আবার হাসিয়া মুখ সামনের দিকে ফিরাইত এবং নির্বোধের মতো হাসিয়া মায়ের কঁধে মুখ লুকাইত। যতই সর্বজয়া বলিত-ওম, কই আমার খোকা কই-আবার কোথায় গেলা-কই দেখি, ততই শিশুর খেলা চলিত। বার বার সামনে পিছনে ফিরিয়া সর্বজয়ার ঘাড়ে ব্যথা হইলেও শিশুর খেলার বিরাম হইত না। সে তখন একেবারে আনকোরা টাট্কা, নতুন সংসারে আসিয়াছে।। জগতের অফুরন্ত আনন্দভাণ্ডারের এক অণুর সন্ধান পাইয়া তাহার অবোধ মন তখন সেইটাকে লইয়াই লোভীর মতো বার বার আস্বাদ করিয়াও সাধ মিটাইতে পারিতেছে না।–তখন তাহকে থামায় এমনসাধ্য তাহার মায়ের কোথায়? খানিকক্ষণ এরূপ করিতে করিতে তাহার ক্ষুদ্র শরীরে শক্তির ভাণ্ডার ফুরাইয়া আসিত- সে হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হইয়া হই তুলিতে থাকিস্ত-সর্বজয়া ছোট্ট হ্যাঁ-টির সামনে তুড়ি দিয়া বলিত-ষাট ষাটএই দ্যাখো দেয়ালা করে করে। এইবার বাছার আমার ঘুম আসচে। পরে সে মুগ্ধ নয়নে শিশুপুত্রের টিপ-কাজলপরী, কচি মুখের দিকে চাহিয়া বলিত-কত রঙ্গই জানে সনকু আমার-তবুও তো এইযোটের দেড় বছরের! হঠাৎ সে আকুল চুম্বনে খোকার রাঙা গাল দুটি ভরাইয়া ফেলিত। কিন্তু মায়ের এই গাঢ় আদরের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াই শিশুর নিদ্রাতুর আঁখিপাতা ঢুলিয়া আসিত, সর্বজয়া খোকার মাথাটা আস্তে আস্তে নিজের কঁধে রাখিয়া বলিত-ওমা, সন্দেবোলা দ্যাখে ঘুমিয়ে পড়লো! এই ভাবছি সন্দেটা উৎবুলে দুধ খাইয়ে তবে ঘুম পাড়াবো-দ্যাখো কাণ্ড!

সর্বজয়া জানিত-ছেলে আট বছরের হইলে কি হইবে, সেই ছেলেবেলাকার মতো মায়ের সহিত লুকোচুরি খেলিবার সাধ তাহার এখনও মিটে নাই।

এমন সব স্থানে সে লুকায় যেখান হইতে অন্ধও তাহাকে বাহির করিতে পারে; কিন্তু সর্বজয়া দেখিয়াও দেখে না-এক জায়গায় বসিয়াই এদিকে ওদিকে চায়, বলে-তাই তো! কোথায় গেল? দেখতে তো পাচ্ছিনে!..অপু ভাবে-মাকে কেমন ঠকাইতে পারা যায়! মায়ের সহিত এ খেলা করিয়া মজা আছে। সর্বজয়া জানে যে, খেলায় যোগ দিবার ভান করিলে এইরূপ সারাদিন চলিতে পারে, কাজেই সে ধমক দিয়া কহিল-তা হলে কিন্তু থাকলো পড়ে রান্নাবান্না। অপু, তুমি ওই রকম করো, খেতে চাইলে তখন দেখবে মজাটা–

অপু হাসিতে হাসিতে গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া মশলার পুঁটুলি মায়ের সামনে রাখিয়া দিল।

তাহার মা বলিল, যা একটু খেলা করগে যা বাইরে। দেখগে যা দিকি তোর দিদি কোথায় আছে! গাছতলায় দাঁড়িয়ে একটু হ্যাঁক দিয়ে দাখ দিকি। তার আজ নাইবার দিন-হতচ্ছাড়া মেয়ের নাগাল পাওয়ার জো আছে? যা তো লক্ষ্মী ছেলে–

কিন্তু এখানে মাতৃ-আদেশ পালন করিয়া সুপুত্র হইবার কোনো চেষ্টা তাহব দেখা গেল না। সে বাটনা-বাটা-রত মায়ের পিছনে গিয়া কি করিতে লাগিল।

–হু-উ-উ-উ-উ-উম্–

সর্বজয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল অপু বড়ি দেওয়ার জন্য চালের বাতায় রক্ষিত একটা পুরানো চট আনিয়া মুড়ি দিয়া মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়া বসিয়া আছে।

–দ্যাখো দ্যাখো, ছেলের কাণ্ড দ্যাখো একবার। ও লক্ষ্মীছাড়া, ওতে যে সাত-রাজ্যির ধুলো। ফ্যাল ফ্যাল-সাপ-মাকড় আছে না কি আছে। ওর মধ্যে-আজি কদিন থেকে তোলা রয়েছে–

–হু-উ-উ-উম—(পূর্বাপেক্ষা গম্ভীর সুরে)

–নাঃ, বল্লে যদি কথা শোনে-বাবা আমার, সোনা আমার, ওখানা ফ্যাল-আমার বাটনার ঠাত—দুষ্টুমি কোরো না ছিঃ!

থলে-মোড়া মূর্তিটা হামাগুড়ি দিয়া এবার দুই কদম আগাঁইয়া আসিল। সর্বজয়া বলিল-ছুঁবি ছুঁবি-ছুঁও না মানিক আমার–ওঃ, ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিইচি-ভারি ভয় হয়েছে মামার!

অপু হি-হি করিয়া হাসিয়া থলেখানা খুলিয়া এক পাশে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মাথার চুল, মুখ, চোখের ভুবু, কান ধুলায় ভরিয়া গিয়াছে। মুখ কঁচুমাচু করিয়া সে সামনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁত কিছু কিচু করিতেছে।

-ওমা আমার কি হবে! হ্যাঁরে হতভাগা, ধুলো মেখে যে একেবারে ভূত সেজেছিস? উঃ–ওই পুরানো থলেটার ধুলো! একেবারে পাগল!

ধূলিধূসরিত অবোধ পুত্রের প্রতি করুণা ও মমতায় সর্বজয়ার বুক ভরিয়া আসিল; কিন্তু অপুর পরনে বাসি কাপড়-নাহিয়া-ধুইয়া ছোঁয়া চলে না বলিয়া বলিল-গামছাখানা নে, ওই দিয়ে ধুলোগুলো আগে ঝেড়ে ফ্যাল। ছেলে যেন কি একটা।

খানিকটা পরে ছেলেকে রান্নাঘরে পাহারার জন্য বসাইয়া সে জল আনিতে বাহির হইয়া যাইতেছে, দেখে দরাজ দিয়া দুর্গা বাড়ি ঢুকিতেছে। মুখ রৌদ্রে রাঙা, মাথার চুল উসকোথুসকো, অথচ ধুলোমাখা পায়ে আলতা পরা। একেবারে মায়ের সামনে পড়াতে আঁচলে বাঁধা আম দেখাইয়া ঢোক গিলিয়া কহিল—এই পুণ্যপুকুরের জন্যে ছোলার গাছ আনতে গেলাম রাজীদের বাড়ি, আম পেড়ে এনেছে ভাগ হচ্ছে, তাই রাজীর পিসিমা দিলে।

–আহা, মেয়ের দশা দ্যাখো, গায়ে খড়ি উড়াচে, মাথার চুল দেখলে গায়ে জ্বর আসে–পুণ্যিপুকুরের জন্য ভেবে তো তোমার রাত্তিরে ঘুম নেই!-পরে মেয়ের পায়ের দিকে চাহিয়া কহিল-ফের বুঝি লক্ষ্মীর চুবড়ি থেকে আলতা বের করে পরা হয়েচে?

দুর্গা আঁচল দিয়া মুখ মুছিয়া উসকোথুসকো চুল কপাল হইতে সরাইয়া বলিল-লক্ষ্মীর চুবড়ির আলতা বইকি! আমি সেদিন হাটে বাবাকে দিয়ে আলতা আনালোম এক পয়সার, তার দরুন দু'পাতা আলতা আমার পুতুলের বাক্সে ছিল না বুঝি?

হরিহর কলকে হাতে রান্নাঘরের দাওয়ায় আগুন লাইতে আসিল।

সর্বজয়া বলিল-ঘণ্টায় ঘণ্টায় তামাকে আগুন দি কোথা থেকে? সুদরীকাঠের বন্দোবস্ত করে রেখেচোঁ। কিনা একেবারে! বাঁশের চেলার আগুন কতক্ষণ থাকে যে আবার ঘড়ি-ঘড়ি তামাক খাওয়ার আগুন জোগাবো? পরে আগুন তুলিবার জন্য রক্ষিত একটা ভাঙা পিতলের হাতাতে খানিকটা আগুন উঠাইয়া বিরক্তমুখে সামনে ধরিল। পরে সুর নরম করিয়া বলিল-কি হল?

—এক রকম ছিল তো সবই ঠিক, বাড়িসুদ্ধ সবাই মন্তর নেবার কথাই হয়েছিল, কিন্তু একটু মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। মহেশ বিশ্বেসের শ্বশুরবাড়ির বিষয়-আশয় নিয়ে কি গোলমাল বেধেছে, বিশ্বেস মশায় গিয়েচে সেখানে চলে-সে-ই আসল মালিক কিনা। তাই আবার একটু পিছিয়ে গেল; আবার এদিকেও তো অকাল পড়চে আষাঢ় মাস থেকে।

–আর সেই যে বাসের জায়গা দেবে, বাস করাবে বলছিল, তার কি হল?

—এই নিয়ে একটু মুশকিল বেধে গেল। কিনা! ধরে যদি মন্তর নেওয়া পিছিয়ে যায়, তবে ওকথা আর কি করে ওঠাই?

সর্বজয়া খুব আশায় আশায় ছিল, সংবাদ শুনিয়া আশাভঙ্গ হইয়া পড়িল। বলিল, তা ওখানে না হয়, অন্য কোন জায়গায় দ্যাখো না? বিদেশে মান আছে, এখানে কেউ পোছে? এই দ্যাখে আমকাঁঠালের সময়ে একটা আম-কাঁঠাল ঘরে নেই-মেয়েটা কাদের বাড়ি থেকে আজ দুটো আধাপচা আমি নিয়ে এল।—পরে সে উদ্দেশে বাড়ির পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল-এই ঘরের দোর থেকে ঝুড়ি-ঝুড়ি আমি পেড়ে নিয়ে যায়-বাছারা আমার চেয়ে চেয়ে দ্যাখে,-এ কি কম কষ্ট!

বাগানের কথার উল্লেখে হরিহর বলিল-উঃ, ও কি কম ধড়িবাজ নাকি! বছরে পচিশ টাকা খাজনা ফেলে-বোলে হোত, তাই কিনা লিখে নিলে পাঁচ টাকায়! আমি গিয়ে এত করে বললাম, কাক, আমার ছেলেটা মেয়েটা আছে, ওই বাগানে আম-জোম কুড়িয়ে মানুষ হচ্ছে। আমার তো আর কোথাও কিছু নেই। আর ধরুন, আমাদের জ্ঞাতির বাগান-আপনার তো ঈশ্বর ইচ্ছেয় কোনো অভাব নেই, দুটো অত বড় বাগান রয়েছে, আম জাম নারকেল সুপারি-আপনার অভাব কি? বাগানখানা গিয়ে ছেড়ে দিন গে যান! তা বল্লে কি জানো? বল্লে, নীলমণি দাদা বেঁচে থাকতে ওর কাছে নাকি তিনশো টাকা ধার করেছিল, তাই আমনি করে শোধ করে নিল। শোন কথা। নীলমণি দাদার বড় অভাব ছিল কিনা, তাই তিনশো টাকার জন্যে গিয়েছে ভুবন মুখুজ্যের কাছে হাত পাততে। বৌদিকে ভালোমানুষ পেয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে নিলে আর কি!

–ভালোমানুষ তো কত! সেও নাকি বলেছে, যে জ্ঞাতিশত্তুর-পর-হাতে বাগান থাকলে তো আর কিছু পাওয়া যাবে না, ফল-পাকুড় এমনিই খাবে, তার চেয়ে কিছু কম জমাতেও যদি বন্দোবস্ত হয়, খাজনাটা তো পাওয়া যাবে।

হরিহর বলিল-খাজনা কি আর আমি দিতাম না? বাগান জমা দেবে, তাই কি আমায় জানতে দিলে? বৌদিকে-লুচি-মোহনভোগ খাইয়ে হাত করে চুপি চুপি লিখিয়ে নিলে।...

# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বৈকালের দিকটা হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করিয়া কালবৈশাখীর ঝড় উঠিল। অনেকক্ষণ হইতে মেঘ মেঘ করিতেছিল, তবুও ঝড়টা যেন খুব শীঘ্র আসিয়া পড়িল। অপুদের বাড়ির সামনে বাঁশঝাড়ের বাঁশগুলো পাচিলের উপর হইতে ঝড়ের বেগে হটিয়া ওধারে পড়াতে বাড়িটা যেন ফাকা ফাকা দেখাইতে লাগিল-ধূলা, বাঁশপাতা, কাঁঠালপাতা, খড় চারিধার হইতে উড়িয়া তাহাদের উঠান ভরাইয়া ফেলিল। দুর্গা বাটীর বাহির হইয়া আম কুড়াইবার জন্য দৌড়িল-অপুও দিদিব পিছু পিছু ছুটিল। দুর্গা ছুটিতে ছুটিতে বলিল-শিগগির ছোট্, তুই বরং সিঁদুরকৌটাতলায় থাক, আমি যাই সোনামুখী-তলায়-দৌড়ো-দৌড়ো। ধুলায় চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে—বড় বড় গাছের ডাল ঝড়ে বাঁকিয়া গাছ ন্যাড়া-ন্যাড়া দেখাইতেছে। গাছে গাছে সোঁ সোঁ, বোঁ বোঁ শব্দে বাতাস বাধিতেছে–বাগানে শুকনা ডাল, কুটা, বাঁশের খোলা উড়িয়া পড়িতেছে-শুকনা বাঁশপাতা ছুঁচালো আগাটা উঁচুদিকে তুলিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে উঠিতেছে—কুক্শিমা গাছের শুঁয়ার মতো পালকওয়ালা সাদা সাদা ফুল ঝড়ের মুখে কোথা হইতে অজস্র উড়িয়া আসিতেছে-বাতাসের শব্দে কান পাতা যায় না।

সোনামুখী-তলায় পৌঁছিয়াই অপু মহা-উৎসাহে চিৎকার করিতে করিতে লাফাইয়া এদিক ওদিক ছুটিতে লাগিল-এই যে দিদি, ওই একটা পড়লো রে দিদি-ওইআর একটা রে দিদি! চিৎকার যতটা করিতে লাগিল তাহার অনুপাতে সে আম কুড়াইতে পারিল না। ঝড় ঘোর রবে: বাড়িয়া চলিয়াছে। ঝড়ের শব্দে আম পড়ার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না, যদিবা শোনা যায় ঠিক কোন জায়গা বরাবর শব্দটা হইল-তোহা ধরিতে পারা যায় না। দুর্গা আট-নয়টা আম কুড়াইয়া ফেলিল, অপু এতক্ষণের ছুটাছুটিতে মোটে পাইল দুইটা। তাঁহাই সে খুশির সহিত দেখাইয়া বলিতে লাগিল—এই দাখ দিদি, কত বড় দ্যাখ-ওই একটা পড়লো-ওই ওদিকে—

এমন সময় হই-হাই শব্দে ভুবন মুখুজ্জের বাড়ির ছেলে-মেয়েরা সব আমি কুড়াইতে আসিতেছে শোনা গেল। সতু চেঁচাইয়া বলিল-ও ভাই, দুগগাদি আর অপু আম কুড়ুচ্ছে–

দল আসিয়া সোনামুখী-তলায় পৌঁছিল। সতু বলিল-আমাদের বাগানে কেন এয়েচ আম কুড়ুতে? সেদিন মা বারণ করে দিয়েচে না? দেখি কতগুলো আম কুড়িয়েচো?

পরে দলের দিকে চাহিয়া বলিল-সোনামুখীর কতগুলো আম কুড়িয়েচে দেখেছিস টুনু?– যাও আমাদের বাগান থেকে দুগ্রগদি-মাকে গিয়ে নইলে বলে দেবো।

রানু বলিল-কেন তাড়িয়ে দিচ্ছিস সাতু? ওরাও কুড়ুক-আমরাও কুড়ুই।

-কুড়োবে বই কি! ও এখানে থাকলে সব আমি ওই নেবে। আমাদের বাগানে কেন আসবে ও?–না, যাও দুগগাদি-আমাদের তলায় থাকতে দেবো না।

অন্য সময় হইলে দুর্গা হয়তো এত সহজে পরাজয় স্বীকার করিত না-কিন্তু সেদিনইহাদেরই কৃত অভিযোগে মায়ের নিকট মারা খাইয়া তাহার পুনরায় বিবাদ বাধাইবার সাহস ছিল না। তাই খুব সহজেই পরাজয় স্বীকার করিয়া লইয়া সে একটু মনমরা ভাবে বলিল-অপু, আয় রে চল। পরে হঠাৎ মুখে কৃত্রিম উল্লাসের ভাব আনিয়া বলিল-আমরা সেই জায়গায় যাই চলা অপু, এখানে থাকতে না দিলে বয়ে গেল-বুঝলি তো?-এখানকার চেয়েও বড় বড় আম-তুই আমি মজা করে কুড়োবো এখনচলে আয়-এবং এখানে এতক্ষণ ছিল বলিয়া একটা বৃহত্তর লাভ হইতে বঞ্চিত ছিল, চলিয়া যাওয়ায় প্রকৃতপক্ষে শাপে বর হইল, সকলের সম্মুখে এইরূপ ভাব দেখাইয়া যেন অধিকতর উৎসাহের সহিত অপুকে পিছনে লইয়া রাংচিতার বেড়ার ফাক গলিয়া বাগানের বাহির হইয়া গেল।

রানু বলিল-কেন ভাই ওদের তাড়িয়ে দিলে-তুমি ভারি হিংসুক কিন্তু সতুদা!

রানুর মনে দুর্গার চোখের ভরসা-হারা চাহনি বড় ঘা দিল।

অপু অতশত বোঝে নাই, বেড়ার বাহিরের পথে আসিয়া বলিল-কোন জায়গায় বড় বড় আমি রে দিদি? পুঁটুদের সলতেখাগী-তলায়?

কোন তলায় দুর্গা তাহা ঠিক করে নাই, একটু ভাবিয়া বলিল-চলগড়ের পুকুরের ধারের বাগানে যাবি-ওদিকে সব বড় বড় গাছ আছে—চল্—।

গড়ের পুকুর এখান হইতে প্রায় পনেরো মিনিট ধরিয়া সুড়িপথে অনবরত বন-বাগান অতিক্ৰম করিয়া। তবে পৌছানো যায়। অনেককালের প্রাচীন আমি ও কঁঠালের গাছ-গাছতলায় বন-চালিতা ময়না-কঁটা ষাঁড়া গাছের দুৰ্ভেদ্য জঙ্গল। দূর বলিয়া এবং জনপ্রাণীর বাস শুন্য গভীর বনের মধ্যে বলিয়া এসব স্থানে কেহ বড় একটা আম কুড়াইতে আসে না। কাছির মতো মোটা মোটা অনেককালের পুরোনো গুলঞ্চ লতা। এ-গাছে ও-গাছে দুলিতেছে-বড় বড় প্রাচীন গাছের তলাকার কঁটাভারা ঘন ঝোপ-জঙ্গল খুঁজিয়া তলায় পড়া আম বাহির করা সহজসাধ্য তো নহেই, তাহার উপর আবার ঘনায়মান নিবিড়-কৃষ্ণ ঝোড়ো মেঘে ও বাগানের মধ্যের জঙ্গলে গাছের আওতায় এরূপ অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে যে, কোথায় কি ভালো দেখা যায় না। তবুও খুঁজতে খুঁজিতে নাছোড়বান্দা দুর্গা গোটা আট-দশ আম পাইল।

হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল-ওরে অপু-বিষ্টি এল!

সঙ্গে সঙ্গে ঝড়টা যেন খানিকক্ষণ একটু নরম হইল–ভিজে মাটির সোঁদা সেঁন্দা গন্ধ পাওয়া গেল-একটু পরেই মোটা মোটা ফোটায় চড়বড় করিয়া গাছের পাতায় বৃষ্টি পড়িতে শুরু করিল।

—আয় আমরা এই গাছতলায় দাড়াই-এখানে বিষ্টি পড়বে না—

দেখিতে দেখিতে চারিদিক ধোঁয়াকার করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিল-বৃষ্টির ফোঁটা পড়বার জোরে গাছের পাতা ছিঁড়িয়া উড়িয়া পড়িতে লাগিল—ভরপুর টাটকা ভিজা মাটির গন্ধ আসিতে লাগিল। ঝড় একটু যেন নরম পড়িয়াছিল—তাহাও আবার বড় বাড়িল-দুর্গা যে গাছতলায় দাঁড়াইয়াছিল, এমনি হয়তো হঠাৎ তথায় বৃষ্টি পড়িত না, কিন্তু পুবে হাওয়ার ঝাপটা গাছতলা ভাসাইয়া লইয়া চলিল। বাড়ি হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে—অপু ভয়ের স্বরে বলিল-ও দিদি—বড্ড যে বিষ্টি এল।

–তুই আমার কাছে আয়-দুর্গা তাহাকে কাছে আনিয়া আঁচল দিয়া ঢাকিয়া কহিল-এ বিষ্টি আর কতক্ষণ হবে-এই ধরে গেল বলে-বৃষ্টি হল ভালেই হল-আমরা আবার সোনামুখী-তলায় যাবো এখন, কেমন তো?

দুজনে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল—

নেবুর পাতায় করম্‌চা
হে বিষ্টি ধরে যা—

হুড়-হুড়-কড়াৎ,...প্রকাণ্ড বন-বাগানের অন্ধকার মাথাটা যেন এদিক হইতে ওদিক পর্যন্ত চিরিয়া গেল-চোখের পলকের জন্য চারিধার আলো হইয়া উঠিল—সামনের গাছের মগডালে থোলো থোলো বন-ধুল ফল ঝড়ে দুলিতেছে। অপু দুর্গাকে ভয়ে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল-ও দিদি!

–ভয় কি রে! রাম রাম বল-রাম রাম রাম রাম-নেবুর পাতায় করমচা হে বিষ্টি ধরে যা-নেবুর পাতায় করমচা হে বিষ্টি ধরে যা-নেবুর পাতায় করমচা–

বৃষ্টির ঝাপটায় তাহাদের কাপড় চুল ভিজিয়া টস্‌টস করিয়া জল ঝরিতে লাগিল—গুমগুমু গুম-ম-ম-চাপা গভীর ধ্বনি-একটা বিশাল লোহার বুল কে যেন আকাশের ধাতব মেঝেতে এদিক হইতে ওদিকে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছে–অপু শঙ্কিত সুরে বলিল-ওই দিদি, আবার–

–ভয় নেই, ভয় কি?–আর একটু সরে আয়-এঃ, তোর মাথাটা ভিজে যে একেবারে জুবড়ি হয়ে গিয়েচে–

চারিধারে শুধু মুষলধারে বৃষ্টিপতনের হুস-স-স-স। একটানা শব্দ, মাঝে মাঝে দমকা ঝড়ের সোঁ-ও-ও-ও, বোঁ-ও-ও-ও-ও রব, ডালপালার ঝাপটের শব্দ-মেঘের ডাকে কানে তালা ধরিয়া যায়। এক-একবার দুর্গার মনে হইতেছিল সমস্ত বাগানখানা ঝড়ে মড়মড় করিয়া ভাঙিয়া উপুড় হইয়া তাহদের চাপা দিল বুঝি।

অপু বলিল-দিদি, বিষ্টি যদি আর না থামে?

হঠাৎ ঝটিকাঙ্কুব্ধ অন্ধকাব আকাশের এপ্রান্ত হইতে লকলকে আলো জিহ্ব মেলিয়া বিদুপোব বিকট অট্টহাস্যের রোল তুলিয়া এক লহমায় ও-প্রান্তের দিকে ছুটিয়া গেল।

ক্কড়—ক্কড়-কড়াৎ!

সঙ্গে সঙ্গে বাগানের মাথায় বৃষ্টির ধোঁয়ার রাশি চিড়িয়া ফাড়িয়া উড়াইয়া, ভৈরবী প্রকৃতিব উন্মত্ততার মাঝখানে ধরা পড়া দুই অসহায় বালক-বালিকার চোখ ঝলসাইয়া তীক্ষ্ণ নীল বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

অপু ভয়ে চোখ বুজিল।

দুর্গা শুষ্ক গলায় উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল,-বাজ পড়িতেছে নাকি?-গাছের মাথায় বনধুধুলের ফল দুলিতেছে।

সেই বড় লোহার বুলটাকে আকাশের ওদিক হইতে কে যেন আবার এদিকে টানিয়া আনিতেছিল–

শীতে অপুর ঠক ঠক করিয়া দাঁতে দাঁত লাগিতেছিল—দুর্গা তাহাকে আরও কাছে টানিয়া আনিয়া শেষ আশ্রয়ের সাহসে বার বার দ্রুত আবৃত্তি করিতে লাগিল-নেবুর পাতায় কবমচা-হে বিষ্টি ধরে যা-নেবুর পাতায় করমচা-হে বিষ্টি ধরে যা-নেবুর পাতায় করমচাঁ…ভয়ে তাহার স্বর কাঁপিতেছিল।

সন্ধ্যা হইবার বেশি বিলম্ব নাই। ঝড়-বৃষ্টি খানিকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে। সর্বজয়া বাহিরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। পথে জমিয়া যাওয়া বৃষ্টির জলের উপর ছপ-ছপশব্দ করিতে

করিতে রাজকৃষ্ণ পালিতের মেয়ে আশালতা পুকুরের ঘাটে যাইতেছিল। সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল-হ্যাঁ মা, দুর্গা আর অপুকে দেখেছিস ওদিকে?

আশালতা বলিল-না খুড়িমা, দেখিনি তো। কোথায় গিয়েচে? তারপর হাসিয়া বলি-কি ব্যাঙ-ডাকানি জল হয়ে গেল খুড়িমা!

—সেই ঝড়ের আগে দুজনে বেরিয়েচে আম, কুড়োতে যাই বলে আর তো ফেরেনি—এই ঝড়-বিষ্টি গেল, সন্দে হোল, ও মা কোথায় গেল তবে?

সর্বজয়া উদ্বিগ্ন মনে বাড়ির মধ্যে ফিরিয়া আসিল। কি করিবে ভাবিতেছে এমন সময়খিড়কির দরজা ঠেলিয়া খুলিয়া আপাদমস্তক সিক্ত অবস্থায় দুর্গা আগে আগে একটা ঝুনা নারিকেল হাতে ও পিছনে পিছনে অপু একটা নারিকেলের বাগলো টানিয়া লইয়া বাড়ি ঢুকিল। সর্বজয়া তাড়াতাড়ি ছেলে-মেয়ের কাছে গিয়া বলিল-ওমা আমার কি হবে। ভিজে যে সব একেবারে পান্তা ভাত হয়েচিস! কোথায় ছিলি বিষ্টির সময়? ছেলেকে কাছে আনিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিল-ওমা, মাথাটা যে ভিজে একেবারে জুবড়ি। পরে আহ্লাদের সহিত বলিল-নারকেল কোথা পেলি রে দুর্গা?

অপু ও দুর্গা দুজনেই চাপা কণ্ঠে বলিল-চুপ চুপ মা-সেজজেঠিমা বাগানে যাচ্ছে—এই গেল-ওদের বাগানের বেড়ার ধারের দিকে যে নারকেল গাছটা, ওর তলায় পড়ে ছিল। আমরাও বেরুচ্চি, সেজজেঠিমাও ঢুকলো।

দুর্গা বলিল-অপুকে তো ঠিক দেখেচে—আমাকেও বোধ হয় দেখেছে। পরে সে উৎসাহের সঙ্গে অথচ চাপা সুরে বলিতে লাগিল—একেবারে গাছের গোড়ায় পড়ে ছিল মা, আগে আমি টের পাইনি, সোনামুখী-তলায় যদি আম পড়ে থাকে তাই দেখতে গিয়ে দেখি বাগলোটা পড়ে রয়েছে। অপুকে বললাম-অপু বাগলোটা নে-মার ঝাঁটার কষ্ট, ঝাঁটা হবে। তারপরই দেখি-হস্তস্থিত নারিকেলটার দিকে উজ্জ্বল মুখে চাহিয়া বলিল-বেশ বড়, না মা?

অপু খুশির সুরে হাত নাড়িয়া বলিল-আমি অমনি বাগলোটা নিয়ে ছুট—

সর্ব্বজয়া বলিল—বেশ বড় দোমালা নারকেলটা। ছেচতলায় রেখে দে, জল দিয়ে নেবো–

অপু অনুযোগের সুরে বলিল-তুমি বলে মা নারকোল নেই, নারকোল নেই,–এই তো হল নারকেল! এইবাব কিন্তু বড়া করে দিতে হবে। আমি ছাড়বো না—কখ্‌খনো—

বৃষ্টির জলে ছেলেমেয়ের মুখ বৃষ্টিধোঁয়া জুই ফুলের মতো সুন্দর দেখাইতেছিল। ঠাণ্ডায় তাহাদের ঠোঁট নীল হইয়া গিয়াছে, মাথার চুল ভিজিয়া কনের সঙ্গে লেপটাইয়া লাগিয়া গিয়াছে। সর্বজয়া বলিল-আয় সব, কাপড় ছাড়িয়ে দিই। আগে, পায়ে জল দিয়ে রোয়াকে ওঠ্ সব–

খানিক পরে সর্বজয়া কুয়ার জল তুলিতে ভুবন মুখুজ্যের বাড়ি গেল। ভুবন মুখুজ্যের খিড়কিদোর পর্যন্ত যাইতেই সে শুনিল সেজ ঠাকরুন বাড়ির মধ্যে চিৎকার করিয়া বাড়ি মাথায় করিতেছেন।

-একটা মুঠো টাকা খরচ করে তবে বাগান নেওয়া-মাগনা তো নয়। তার কোনো কুটোটা যদি হাঘিরেদের জন্যে ঘরে ঢুকবার জো আছে! এ ছুড়িটা রাদিন বাগানে বসে আছে, কুটো গাছটা নিয়ে গিয়ে ঘরে তুলবে-এতে মাগীরও শিক্ষে আছে, ও মাগী কি কম নাকি?-ও মা, ভাবলাম বিষ্টি থেমেচে, যাই একবার বাগানটা গিয়ে দেখে আসি— এই এত বড় নাককোলটা কুড়িয়ে নিয়ে একেবারে দুড়দুড় দৌড়!–এত শতুরতা যেন ভগবান সহি না করেন—উচ্ছন্ন যান, উচ্ছন্ন যানএই ভস সন্দেবোলা বলচি, আব্ব যেন নারকেল খেতে না হয় —একবাব শিগগির যেন ছাতিমতলা–সই হন–

সর্বজয়া খিড়কির বাহিরে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ছেলেমেয়ের বর্ষণসিক্ত কচিমুখ মনে করিয়া সে ভাবিল যদি গালাগাল ওদের লাগে! বাবা যে লোক! দাঁতে বিষ আছে! কি করি? কথাটা ভাবিতেই তাহার গা শিহরিয়া উঠিয়া সর্বশরীর যেন অবশ হইয়া গেল। সে আর মুখুজ্যেবাড়ি ঢুকিলে না-আশশ্যাওড়া বনে, বাঁশঝাড়ের তলায় বর্ষণস্তব্ধ সন্ধ্যায় জোনাকি জ্বলিতেছে, পা যেন আর উঠিতে চাহে না-ভয়ে ভয়ে সে জল তুলিবার ছোট্ট বালতিটা ও ঘড়া কাঁখে লইয়া বাড়ির দিকে ফিরিল।

পথে আসিতে আসিতে ভাবিল-যদি নারকেলটা ওদের ফেরত দিই।–তাহলেও কি গাল লাগবে? তা কেন লাগবে- যার জিনিস তাকে তো ফেরত দেওয়া হল, তা কখনওলাগে?

বাড়িতে পা দিয়াই মেয়েকে বলিল-দুগ্‌গা, নারকেলটা সন্তুদের বাড়ি দিয়েআয়গিয়ে।

অপু ও দুর্গা অবাক হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—

দুর্গা বলিল-এখখুনি?

-হ্যাঁ-এখখুনি দিয়ে আয়। ওদের খিড়কির দোর খোলা আছে। চট করে যা। বলে আয়, আমরা কুড়িয়ে পেইছিলাম, এই নাও দিয়ে গেলাম।

–অপু আমাকে একটু দাঁড়াবে না, মা? বড় অন্ধকার হয়েচে, চল অপু আমার সঙ্গে।

ছেলেমেয়ে চলিয়া গেলে সর্বজয়া তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে দিতে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া বলিল-ঠাকুর, নারকেল ওরা শত্‌তুরতা করে কুড়়তে যায়নি সে তো তুমি জানো, এ গাল যেন ওদের না লাগে। দোহাই ঠাকুর, ওদের তুমি বাঁচিয়ে-বর্তে রেখো, ঠাকুর। ওদের তুমি মঙ্গল কোরো। তুমি ওদের মুখের দিকে চেয়ো। দোহাই ঠাকুর।

# চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

গ্রামের প্রসন্ন গুরুমহাশয় বাড়িতে একখানা মুন্দির দোকান করিতেন এবং দোকানেরই পাশে তাহার পাঠশালা ছিল। বেত ছাড়া পাঠশালায় শিক্ষাদানের বিশেষ উপকরণ-বাহুল্য ছিল না। তবে এই বেতের উপর অভিভাবকদেরও বিশ্বাস গুরুমহাশয়ের অপেক্ষা কিছু কম নয়। তাই তাহারা গুরুমহাশয়কেও বলিয়া দিয়াছিলেন, ছেলেদের শুধু পা খোঁড়া এবং চোখ কানা না হয়, এইটুকু মাত্র নজর রাখিয়া তিনি যত ইচ্ছা বেত চালাইতে পারেন। গুরুমহাশয়ও তঁহার শিক্ষাদানের উপযুক্ত ক্ষমতা ও উপকরণের অভাব একমাত্র বেতের সাহায্যে পূর্ণ করিবার চেষ্টায়। এরূপ বেপরোয়া ভাবে বেত চালাইয়া থাকেন যে ছাত্রগণ পা খোড়া ও চক্ষু কানা হওয়ার দুর্ঘটনা হইতে কোনরূপে প্রাণে বঁচিয়া যায় মাত্র।

পৌষ মাসের দিন। অপু সকালে লেপ মুড়ি দিয়া রৌদ্র উঠিবার অপেক্ষায় বিছানায় শূইয়া ছিল, মা আসিয়া ডাকিল-অপু, ওঠু শিগগির করে, আজ তুমি যে পাঠশালায় পড়তে যাবে! কেমন সব বই আনা হবে তোমার জন্যে, শেলেট। হ্যা ওঠে, মুখ ধুয়ে নাও, উনি তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে পাঠশালায় দিয়ে আসবেন।

পাঠশালার নাম শুনিয়া অপু সদ্য-নিদ্রোখিত চোখ দুটি তুলিয়া অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ধারণা ছিল যে যাহারা দুন্‌টু ছেলে, মার কথা শোনে না, ভাইবোনদের সঙ্গে মারামারি করে, তাহাদেরই শুধু পাঠশালায় পাঠানো হইয়া থাকে। কিন্তু সে তো কোনোদিন ওরাপ করে না, তবে সে কোন পাঠশালায় যাইবে?

খানিক পরে সর্বজয়া পুনরায় আসিয়া বলিল-ওঠে। অপু, মুখ ধুয়ে নাও, তোমায় অনেক করে মুড়ি বেঁধে দেবো এখন, পাঠশালায় বসে বসে খেয়ো এখন, ওঠে লক্ষ্মী মানিক!

মায়ের কথার উত্তরে সে অবিশ্বাসের সুরে বলিল-ইঃ! পরে মায়ের দিকে চাহিয়া জিভ বাহিব করিয়া চোখ বুজিয়া একপ্রকার মুখভঙ্গি করিয়া রহিল, উঠিবার কোনো লক্ষণ দেখাইল না।

কিন্তু অবশেষে বাবা আসিয়া পড়াতে অপুর বেশি জারিজুরি খাটিল না, যাইতে হইল। মা’র প্রতি অভিমানে তাহার চোখে জল আসিতেছিল, খাবার বাঁধিয়া দিবার সময় বলিল-আমি কখখনো আর বাড়ি আসছিনে, দেখো!

—ষাট ষাট, বাড়ি আসবিনে কি! ওকথা বলতে নেই, ছিঃ! পরে তাহার চিবুকে হাত দিয়া চুমু খাইয়া বলিল-খুব বিদ্যে হোক, ভালো করে লেখাপড়া শিখো, তখন দেখবে তুমি কত বড় চাকরি করবে, কত টাকা হবে তোমার, কোনো ভয় নেই।-ওগো, তুমি গুরুমশায়কে বলে দিয়ো যেন ওকে কিছু বলে না।

পাঠশালায় পৌছাইয়া দিয়া হরিহর বলিল-দুটি হবার সময়ে আমি আবার এসে তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাবো, অপু, বসে বসে লেখো, গুরুমশায়ের কথা শুনো, দুষ্টুমি কোরো না যেন! খানিকটা পরে পিছন ফিরিয়া অপু চাহিয়া দেখিল বাবা ক্রমে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল। অকুল সমুদ্র। সে অনেকক্ষণ মুখ নিচু করিয়া বসিয়া রহিল। পরে ভয়ে ভয়ে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, গুরুমহাশয় দোকানের মাচায় বসিয়া দাঁড়িতে সৈন্ধব লবণ ওজন করিয়া কাহাকে দিতেছেন, কয়েকটি বড় বড় ছেলে আপনি আপনি চাটাই-এ বসিয়া নানারূপ কুস্বর করিয়া কি পড়িতেছে ও ভয়ানক দুলিতেছে। তাহার অপেক্ষা আর একটু ছোট একটি ছেলে খুঁটিতে ঠেস দিয়া আপন মনে পাততাড়ির তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতেছে। আর একটি বড় ছেলে, তাহার গালে একটা আঁচিল, সে দোকানের মাচার নিচে চাহিয়া কি লক্ষ করিতেছে। তাহার সামনে দুজন ছেলে বসিয়া শ্লেটে একটা ঘর আঁকিয়া কি করিতেছিল। একজন চুপিচুপি বলিতেছিল, আমি এই ঢ্যারা দিলাম, অন্য ছেলেটি বলিতেছিল, এই আমার গোল্লা, সঙ্গে সঙ্গে তার শ্লেটে আঁক পড়িতেছিল ও মাঝে মাঝে আড়াচোখে বিক্রয়রত গুরুমহাশয়ের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। অপু নিজের শ্লেটে বড় বড় করিয়া বানান লিখিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে ঠিক জানা যায় না, গুরুমহাশয় হঠাৎ বলিলেন—এই ফনে, শ্লেটে ওসব কি হচ্ছে রে? সম্মুখের সেই ছেলে দুটি অমনি স্লেটখানা চাপা দিয়া ফেলিল, কিন্তু গুরুমহাশয়ের শ্যেনদৃষ্টি এড়ানো বড় শক্ত, তিনি বলিলেন, এই সতে, ফনের প্লেটটা নিয়ে আয় তো! তঁহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে বড় আঁচিলওয়ালা ছেলেটি ছোঁ মারিয়া স্লেটখানা উঠাইয়া লইয়া গিয়া দোকানের মাচার উপর হাজির করিল।

-হুঁ, এসব কি খেলা হচ্ছে শ্লেটো?-সতে, ধরে নিয়ে আয় তো দুজনকে, কান ধরে নিয়ে আয়!

যেভাবে বড় ছেলেটা ছোঁ মারিয়া স্লেট লইয়া গেল এবং যেভাবে বিপন্ন মুখে সামনের ছেলে দুটি পায়ে পায়ে গুরুমহাশয়ের কাছে যাইতেছিল, তাহাতে হঠাৎ অপুর বড় হাসি পাইল, সে ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। পরে খানিকটা হাসি চাপিয়া রাখিয়া আবার ফিক ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

গুরুমহাশয় বলিলেন, হাসে কে? হাসচো কেন খোকা, এটা কি নাট্যশালা? অ্যা? এটা নাট্যশালা নাকি?

নাট্যশালা কি, অপু তাঁহা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল।

–সতে, একখানা থান ইট নিয়ে আয় তো তেঁতুলতলা থেকে বেশ বড় দেখে?

অপু ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, তাহার গলা পর্যন্ত কাঠ হইয়া গেল, কিন্তু ইট আনীত হইলে সে দেখিল, ইটের ব্যবস্থা তাহার জন্য নহে, ওই ছেলে দুটির জন্য। বয়স অল্প বলিয়াই হউক বা নতুন ভর্তি বলিয়াই হউক, গুরুমহাশয় সে-যাত্রা তাহাকে রেহাই দিলেন।

পাঠশালা বসিত বৈকলে। সবসুদ্ধ আট-দশটি ছেলেমেয়ে পড়িতে আসে। সকলেই বাড়ি হইতে ছোট ছোট মাদুর আনিয়া পাতিয়া বসে, অপুর মাদুর নাই, সে বাড়ি হইতে একখানা জীর্ণ কর্পেটের আসন আনে। যে ঘরটায় পাঠশালা হয়, তার কোনো দিকে বেড়া বা দেওয়াল কিছু নাই, চারিধারে খোলা, ঘরের মধ্যে সারি দিয়া ছাত্রগণ বসে। পাঠশালা-ঘরের চারিপাশে বন, পিছন দিকে গুরুমহাশয়ের পৈতৃক আমলের বাগান। অপরাহ্নের তাজা গরম রৌদ্র বাতাবিলেবু, গাব ও পেয়ারাফুলি আম গাছটার ফাঁক দিয়া পাঠশালার ঘরের বাঁশের খুঁটির পায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। নিকটে অন্য কোনদিকে কোনো বাড়ি নাই, শুধু বন ও বাগান, একধারে একটা যাতায়াতের সরু পথ।

আট-দশটি ছেলেমেয়ের মধ্যে সকলেই বেজায় দুলিয়া ও নানারূপ সুর করিয়া পড়া মুখস্থ করে, মাঝে মাঝে গুরুমহাশয়ের গলা শোনা যায়,-“এই ক্যাবলা, ওর শেলেটের দিকে চেয়ে কি দেখচিস? কান ম’লে ছিড়ে দেবো একেবারে! নুটু, তোমার ক’বার নেতি ভিজুতে হবে? ফের যদি

গুরুমহাশয় একটা খুঁটি হেলান দিয়া একখানা তালপাতার চাটাই-এর উপর বসিয়া থাকেন। মাথার তেলে বাঁশের খুঁটির হেলান দেওয়ার অংশটি পাকিয়া গিয়াছে। বিকালবেলা প্রায়ই গ্রামের দীনু পালিত কি রাজু রায় তাহার সহিত গল্প করিতে আসেন। পড়াশুনার চেয়ে এই গল্প শোনা অপুর অনেক বেশি ভালো লাগিতা। রাজু রায় মহাশয় প্রথম যৌবনে ‘বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস’ স্মরণ করিয়া কিভাবে আষাঢ়ুর হাটে তামাকের দোকান খুলিয়াছিলেন সে গল্প করিতেন। অপু অবাক হইয়া শুনিত। বেশ কেমন নিজের ছোট্ট দোকানের ঝাপটা তুলিয়া বসিয়া বসিয়া দা দিয়া তামাক

কাটা, তারপর রাত্রে নদীতে যাওয়া, ছোট্ট হ্যাঁড়িতে মাছের ঝোল ভাত রাধিয়া খাওয়া, হয়তো মাঝে মাঝে তাদের সেই ছেড়া মহাভারতখানা কি বাবার সেই দাশু রায়ের পাঁচালিখানা মাটির প্রদীপের সামনে খুলিয়া বসিয়া বসিয়া পড়া! বাহিরে অন্ধকারে বর্ষারাতে টিপ, টিপ বৃষ্টি পড়িতেছে, কেহ কোথাও নাই, পিছনের ডোবায় ব্যাঙ ডাকিতেছে–কি সুন্দর! বড় হইলে সে তামাকের দোকান করিবে।

এই গল্পগুজব এক এক দিন আবার ভাব ও কল্পনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠিত, গ্রামের ও পাড়ার রাজকৃষ্ণ সান্যাল মহাশয় যেদিন আসিতেন। যে কোনো গল্প হউক, যত সামান্যই হউক না কেন, সেটি সাজাইয়া বলিবার ক্ষমতা তাহার ছিল অসাধারণ। সান্যাল মহাশয় দেশভ্রমণ-বাস্তিকগ্রস্ত ছিলেন। কোথায় দ্বারকা, কোথায় সাবিত্রী পাহাড়, কোথায় চন্দ্রনাথ, তাহা আবার একা দেখিয়া তাহার তৃপ্তি হইত না, প্রতিবারেই স্ত্রী-পুত্র লইয়া যাইতেন এবং খরচপত্র করিয়া সর্বস্বান্ত হইয়া ফিরিতেন। দিব্য আরামে নিজের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া থেলো হুঁকা টানিতেছেন, মনে হইতেছে সান্যাল মহাশয়ের মতন নিতান্ত ঘরোয়া, সেকেলে, পাড়াগায়ের প্রচুর অবসরপ্রাপ্ত গৃহস্থ বেশি আর বুঝি নাই, পৈতৃক চণ্ডীমণ্ডপে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছেন। হঠাৎ একদিন দেখা গেল সদর দরজায় তালাবন্ধ, বাড়িতে জনপ্রাণীর সাড়া নাই। ব্যাপার কি? সান্যাল মশায় সপরিবারে বিন্ধ্যাচল না চন্দ্রনাথ ভ্রমণে গিয়াছেন। অনেকদিন আব দেখা নাই, হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা ঠুকণ্ঠক শব্দে লোকে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, দুই গরুর গাড়ি বোঝাই হইয়া সান্যাল মশায় সপরিবারে বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ও লোকজন ডাকাইয়া হ্যাঁটু-সমান উঁচু জলবিছুটি ও অর্জ্জুন গাছের জঙ্গল কাটিতে কাটিতে বাড়ি ঢুকিতেছেন।

একটা মোটা লাঠি হাতে তিনি লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া পাঠশালায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন— এই যে প্রসন্ন, কি রকম আছ, বেশ জাল পেতে বসেচ যে! কটা মাছি পড়লো!

নামতা-মুখস্থ-রত অপুর মুখ অমনি অসীম আহ্লাদে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। সান্যাল মশায় যেখানে তালপাতার চাটাই টানিয়া বসিয়াছেন সেদিকে হাতখানেক জমি উৎসাহে আগাইয়া বসিত। স্লেট বই মুড়িয়া একপাশে রাখিয়া দিত যেন আজ ছুটি হইয়া গিয়াছে, আর পড়াশুনার দরকার নাই, সঙ্গে সঙ্গে তাহার ডাগর ও উৎসুক চোখ দুটি গল্পের প্রত্যেক কথা যেন দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার আগ্রহে গিলিত।

কুঠির মাঠের পথে যে জায়গাটাকে এখন নালতকুড়িব জোল বলে, ওইখানে আগে-অনেক কাল আগে-গ্রামের মতই হাজাবার ভাই চন্দর হাজরা কি বনের গাছ কাটিতে গিয়াছিল। বর্ষাকাল-এখানে ওখানে বৃষ্টির জলের তোড়ে মাটি খাসিয়া পড়িয়াছিল,

হঠাৎ চন্দর হাজরা দেখিল এক জায়গায় যেন একটা পিতলের হ্যাঁড়ির কানামতো মাটির মধ্য হইতে একটুখানি বাহির হইয়া আছে। তখনই সে খুঁড়িয়া বাহির করিল। বাড়ি আসিয়া দেখে-এক হ্যাঁড়ি সেকেলে আমলের টাকা। তাই পাইয়া চন্দর হাজরা দিনকতক খুব বাবুগিরি করিয়া বেড়াইল—এসব সান্যাল মহাশয়এর নিজের চোখে দেখা।

এক এক দিন রেলভ্রমণের গল্প উঠিত। কোথায় সাবিত্রী পাহাড় আছে, তাহাতে উঠিতে তাঁহার স্ত্রীর কি রকম কষ্ট হইয়াছিল, নাভিগয়ায় পিণ্ড দিতে গিয়া পাণ্ডার সঙ্গে হাতাহাতি হইবার উপক্রম। কোথাকার এক জায়গায় একটা খুব ভালো খাবার পাওয়া যায়, সান্যাল মশায় নাম বলিলেন–প্যাঁড়া। নামটা শুনিয়া অপুর ভারি হাসি পাইয়াছিল-বড় হইলে সে 'প্যাঁড়া' কিনিয়া খাইবে।

আর একদিন সান্যাল মশায় একটা কোন জায়গার গল্প করিতেছিলেন। সে জায়গায় নাকি আগে অনেক লোকের বাস ছিল, সন্ধ্যার সময় তেঁতুলের জঙ্গলের মধ্যে দিয়া তাহারা সেখানে যান-সন্ন্যাল মশায় বার বার যে জিনিসটা দেখিতে যান। তাহার নাম বলিতেছিলেন—'চিকামসজিদ'। কি জিনিস তাহা প্রথমে সে বুঝিতে পারে নাই, পরে কথাবার্তার ভাবে বুঝিয়েছিলেন একটা ভাঙা পুরোনো বাড়ি। অন্ধকারপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল- তাঁহারা ঢুকিতেই এক ঝাঁক চামচিকা সাঁ করিয়া উড়িয়া বাহির হইয়া গেল। অপু বেশ কল্পনা করিতে পারে-চারিধারে অন্ধকার তেঁতুল জঙ্গল, কেউ কোথাও নাই, ভাঙা পুরোনো দরজা, যেমন সে ঢুকিল অমনি সাঁ করিয়া চামচিকার দল পলাইয়া গেল।–রানুদের পশ্চিমদিকের চোরাকুঠুরির মতো অন্ধকার ঘরটা।

কোন দেশে সান্যাল মহাশয় একজন ফকিরকে দেখিয়াছিলেন, সে এক অশথতলায় থাকিত। এক ছিলিম গাজা পাইলে সে খুশি হইয়া বলিত-আচ্ছা কোন ফল তোমরা খাইতে চাও বল। পরে ঈঙ্গিত ফলের নাম করিলে সে সম্মুখের যে কোনো একটা গাছ দেখাইয়া বলিত—যাও, ওখানে গিয়া লইয়া আইস। লোকে গিয়া দেখিত হয়তো আমগাছে বেদানা ফলিয়া আছে কিংবা পেয়ারা গাছে কলার কাঁদি ঝুলিয়া আছে।

রাজু রায় বলিতেন-ও সব মস্তর-তস্তরের খেলা আর কি! সেবার আমার এক মামা—

দীনু পালিত কথা চাপা দিয়া বলিতেন-মন্তরের কথা যখন ওঠালে, তখন একটা গল্প বলি শোনো। গল্প নয়, আমার স্বচক্ষে দেখা। বেলেডাঙার বুধো গাড়োয়ানকে তোমরা দেখোচা কেউ? রাজু না দেখে থাকো, রাজকৃষ্ট ভায়া তো খুব দেখেচোঁ। কাঠের দড়ি-বাধা এক ধরনেব খড়ম পায়ে দিয়ে বুড়ো বরাবর নিতে-কামারের দোকানে লাঙলের ফাল পোড়াতে আসতো। একশ' বছর বয়সে মারা যায়, মারাও গিয়েছে আজ পচিশ বছরের ওপর। জোয়ান বয়সে আমরা তার সঙ্গে হাতের কব্জির জোরে পেরে উঠাতাম

না। একবার- অনেক কালের কথা-আমার তখন সবে হয়েচে উনিশ কুড়ি বয়েস, চাকদা থেকে গঙ্গাচন করে গরুর গাড়ি করে ফিরছি। বুধো গাড়োয়ানের গাড়িগাড়িতে আমি, আমার খুড়িমা, আর অনন্ত মুখজ্যের ভাইপো রাম, যে আজকাল উঠে গিয়ে খুলনায় বাস করছে। কানসোনার মাঠের কাছে প্রায় বেলা গেল। তখনওসবদিকে কি রকম ভয়ভীতু ছিল, তা রাজকৃষ্ট ভায়া জানো নিশ্চয়। একে মাঠের রাস্তা, সঙ্গে মেয়েমানুষের দল, কিছু টাকাকড়িও আছে— বড্ড ভাবনা হল! আজিকাল যেখানে নতুন গা-খানা বসেচে-ওই বরাবাব এসে হল কি জানো? জন-চারেক ফাগুামাক্কোগোছেৰ মিশকালো লোক এসে গাড়ির পেছন দিকের বাঁশ দুদিক থেকে ধল্লে। এদিকে দুজন, ওদিকে দুজন। দেখে তো মশাই আমার মুখে আর র-টা নেই, কোনো রকমে গাড়ির মধ্যে বসে আছি, এদিকে তারাও গাড়ির বাঁশ ধরে সঙ্গেই আসচে, সঙ্গেই আসচে, সঙ্গেই আসচে। বুধো গাড়োয়ান দেখি পিটু পিটু করে পেছন দিকে চাইচে। ইশারা করে আমাদের কথা বলতে বারণ করে দিলে। বেশ আছে! এদিকে গাড়ি একেবারে নবাবগঞ্জ থানার কাছাকাছি এসে পড়ল। বাজার দেখা যাচ্চে, তখন সেই লোক কজন বল্লে-ওস্তাদজী, আমাদের ঘাট হয়েছে, আমরা বুঝতে পারিনি, ছেড়ে দাও। বুধো গাড়োয়ান বল্লে-সে হবে না ব্যাটারা। আজি সব থানায় নিয়ে গিয়ে বাঁধিয়ে দোব। অনেক কাকুতি-মিনতির পর বুধো বল্লে—আচ্ছা যা, ছেড়ে দিলাম। এবার, কিন্তু কক্ষনো এরকম আর করিসনি! তবে তারা বুধে গাড়োয়ানের পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেল। আমার স্বচক্ষে দেখা। মন্তরের চোটে ওই যে ওরা বাঁশ এসে ধরেছে, আমনি ধরেই রয়েচে-আর ছাড়াবার সাধ্যি নেই-চলেছে গাড়ির সঙ্গে! একেবারে পেরোক-আঁটা হয়ে গিয়েচে। তা বুঝলে বাপু? মন্ত-তন্তরের কথা–

গল্প বলিতে বলিতে বেলা যাইত। পাঠশালার চারিপাশের বনজঙ্গলে অপরাহ্নের রাঙা রৌদ্র বঁকা ভাবে আসিয়া পড়িত। কাঁঠাল গাছের জগডুমুর গাছের ডালে ঝোলা গুলঞ্চ লতার গায়ে টুনটুনি পাখি মুখ উঁচু করিয়া বসিয়া দোল খাইত। পাঠশালা-ঘরে বনের গন্ধের সঙ্গে লতাপাতার চাটাই ছেড়াখোড়া বই-দপ্তর, পাঠশালার মাটির মেজে ও কড়া দা-কটা তামাকের ধোঁয়া, সবসুদ্ধ মিলিয়া এক জটিল গন্ধের সৃষ্টি করিত।

সে গ্রামের ছায়া-ভরা মাটির পথে একটি মুগ্ধ গ্রাম্য বালকের ছবি আছে। বইদপ্তর বগলে লইয়া সে তাহার দিদির পিছন পিছন সাজিমাটি দিয়া কাচা, সেলাই করা কাপড় পরিয়া পাঠশালা হইতে ফিরিতেছে, তাহার ছোট্ট মাথাটির অমন রেশমের মতো নরম চিকণ সুখ-স্পর্শ চুলগুলি তাহার মা যত্ন করিয়া আঁচড়াইয়া দিয়াছে।–তাহার ডাগরা ডাগর সুন্দর চোখ দুটিতে কেমন যেন অবাক ধরনের চাহনি-যেন তাহারা এ কোন অদ্ভুত জগতে নতুন চোখ মেলিয়া চাহিয়া চাহিয়া দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছে। গাছপালায় ঘেরা এইটুকুই কেবল তার পরিচিত দেশ-এখানেই মা রোজ হাতে করিয়া

খাওয়ায়, চুল আঁচড়াইয়া দেয়, দিদি কাপড় পরাইয়া দেয়, এই গণ্ডিটুকু ছাড়াইলেই তাহার চারিধারে ঘিরিয়া অপরিচয়ের অকুল জলধি! তাহার শিশুমন থই পায় না।

ওই যে বাগানের ওদিকে বাঁশবন-ওর পাশ কাটিয়া যে সরু পথটা ওধারে কোথায় চলিয়া গেল-তুমি বরাবর সোজা যদি ও-পথটা বাহিয়া চলিয়া যাও তবে শাঁখারিপুকুরের পাড়ের মধ্যে অজানা গুপ্তধনের দেশে পড়িবে-বড় গাছের তলায় সেখানে বৃষ্টির জলে মাটি খসিয়া পড়িয়াছে।– কত মোহরভরা হ্যাঁড়ি-কলসির কানা বাহির হইয়া আছে, অন্ধকার বনঝোপের নিচে, কচু ওলা ও বনকলমির চকচকে সবুজ পাতার আড়ালে চাপা-কেউ জানে না কোথায়।

একদিন পাঠশালায় এমন একটি ঘটনা হইয়াছিল, যাহা তাহার জীবনের একটি নতুন অভিজ্ঞতা।

সেদিন বৈকালে পাঠশালায় অন্য কেহ উপস্থিত না থাকায় কোন গল্পগুজব হইল না, পড়াশুনা হইতেছিল-সে গিয়া বসিয়া পড়িতেছিল শিশুবোধক-এমন সময় গুরু-মহাশয় বলিলেন-দেখি, শেলেট নেও, শ্রুতিলেখন লেখো–

মুখে মুখে বলিয়া গেলেও অপু বুঝিয়াছিল গুরুমহাশয় নিজের কথা বলিতেছেন না, মুখস্থ বলিতেছেন, সে যেমন দাশূরায়ের পাঁচালী ছড়া মুখস্থ বলে তেমনি।

শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হইল অনেকগুলো অমন সুন্দর কথা একসঙ্গে পর পর সে কখনও শোনে নাই। ও-সকল কথার অর্থ সে বুঝিতেছিল না, কিন্তু অজানা শব্দ ও ললিত পদের ধ্বনি, ঝংকার-জড়ানো এক অপরিচিত শব্দসংগীত, অনভ্যস্ত শিশুকর্ণে অপূর্ব ঠেকিল এবং সব কথার অর্থ না বোঝার দরুনই কুহেলি-ঘেরা অস্পষ্ট শব্দ-সমষ্টির পিছন হইতে একটা অপূর্ব দেশেব ছবি বারবার উঁকি মারিতেছিল।

বড় হইয়া স্কুলে পড়িবার সময় সে বাহির করিয়াছিল ছেলেবেলাকার এই মুখস্থ শ্রুতিলিখন কোথায় আছে–

এই সেই জনস্থান-মধ্যবতী প্রস্রবণ-গিরি। ইহার শিখরদেশে আকাশপথে সতত-সামীরসঞ্চরমাণ-জলধর-পাটল সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কত-আধিত্যকাপ্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বন-পাদপসমূহে সমাচ্ছন্ন থাকতে স্নিগ্ধ শীতল ও রমণীয়…পাদদেশে প্রসন্ন-সলিলা গোদাবরী তবঙ্গ বিস্তার করিয়া…।

সে ঠিক বলিতে পারে না, বুঝাইতে পারে না, কিন্তু সে জানে।–তাহর মনে হয়, অনেক সময়েই মনে হয়-সেই যে বছর দুই আগে কুঠির মাঠে সরস্বতী পূজার দিন নীলকণ্ঠ

পাখি দেখিতে গিয়াছিল, সেদিন মাঠের ধার বাহিয়া একটা পথকে দূরে কোথায় যাইতে দেখিয়াছিল সে। পথটার দু’ধারে যে কত কি অচেনা পাখি, অচেনা গাছপালা, অচেনা বনঝোপ,-অনেকক্ষণ সেদিন সে পথটার দিকে একদৃষ্টি চাহিয়া ছিল। মাঠের ওদিকে পথটা কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে তা ভাবিয়া সে কুল পায় নাই।

তাহার বাবা বলিয়াছিল-ও সোনাডাঙা মাঠের রাস্তা, মাধবপুর দশঘরা হয়ে সেই ধলা িচতের খেয়াঘাটে গিয়ে মিশেচে।

ধলচিতের খেয়াঘাটে নয়, সে জানিত, ও পথটা আরও অনেক দূরে গিয়াছে। রামায়ণমহাভারতের দেশে।

সেই অশথ গাছের সকলের চেয়ে উঁচু। ডালটার দিকে চাহিয়া থাকিলে যাহার কথা মনে উঠে-সেই বহুদূরের দেশটা। c

শ্রুতিলিখন শুনিতে শুনিতে সেই দুই-বছর-আগে-দেখা পথটার কথাই তাহার মনে হইয়া গেল।

ওই পথের ওধারে অনেক দূরে কোথায় সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-পর্বত! বনঝোপের স্নিগ্ধ গন্ধে, না-জানার ছায়া নামিয়া আসা ঝিকিমিকি সন্ধ্যায়, সেই স্বপ্নলোকের ছবি তাহাকে অবাক করিয়া দিল। কতদূরে সে প্রস্রবণ-গিরির উন্নত শিখর, আকাশপথে সতত-সঞ্চরমাণ মেঘমালায় যাহার প্রশান্ত, নীল সৌন্দর্য সর্বদা আবৃত থাকে?

সে বড় হইলে যাইয়া দেখিবে।

কিন্তু সে বেতসীকণ্টকিত তাঁট, বিচিত্রপুলিনা গোদাবরী, সে শ্যামল জনস্থান, নীল মেঘমালায় ঘেরা সে অপূর্ব শৈলপ্রস্থ, রামায়ণে বর্ণিত কোনো দেশে ছিল না। বাল্মীকি বা ভবভূতিও তাঁহাদের সৃষ্টিকর্তা নহেন। কেবল অতীত দিনের কোনো পাখিডাকা গ্রাম্য সন্ধ্যায় এক মুগ্ধমতি গ্রাম্য বালকের অপরিণত শিশু-কল্পনার দেশে তাহারা ছিল বাস্তব, একেবারে খাঁটি, অতি সুপরিচিত। পৃথিবীপৃষ্ঠে যাহাদের ভৌগোলিক অস্তিত্ব কোনোকালে সম্ভব ছিল না, শুধু এক অনভিজ্ঞ শৈশবমনেই সে কল্পজগতের প্রস্রবণ-পর্বত তাহার সতত-সঞ্চারমাণ মেঘজালে ঢাকা নীল শিখরমালার স্বপ্ন লইয়া অক্ষয় আসন পাতিয়া বসিল।

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দুর্গা ভাইকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। পাড়ার নানাস্থানে খুঁজিয়া কোথাও পাইল না। অন্নদা রায় মহাশয়ের বাড়িতে কাছে আসিয়া ভাবিল—একবার এখানে দেখা যাই, খুড়িমার সঙ্গেও দেখাটা হবে এখন–

অন্নদা রায়ের বাড়ি ঢুকিতেই একটা হৈ হৈ চিৎকার ও কান্নাকাটির কলরব তাহার কানে গেল। বাড়ির মধ্যে না ঢুকিয়া সে দরজার কাছে দাঁড়াইল। রোয়াকের একপাশে দাঁড়াইয়া অন্নদা রায়ের বিধবা ভগ্নী সখী ঠাকরুন চিৎকার করিয়া বাড়ি ফাটাইতেছেন :

—তাই কি মনে একটু ভয় আছে নাকি? ঢের ঢ়ের জাহাবাজ মেয়েমানুষ দেখিচি, এমন আর কক্ষনো দেখিনি রে বাপু, পায়ে গড় করি।-বলে ওই যমের মতো সোয়ামী, রাগলে হাড়ে মাসে এক রাখে না।–তাই না হয় বাপু, একটু সমঝে চলি? সত্যিই তো, আজ তিন দিন ধরে বলচে ধানগুলো একটু রোদে দাও, ওগো ধানগুলো একটু রোদে দাও-কথা কি গেরাহিত্যি হয় নাকি? না কানো যায়? কগর কথা কে শোনে! গোরস্ত ঘরের বৌ ধান ভানবে, কাজ করবে। এই জানি-ত না, রাদ্দিন পটের বিবি সেজে বসে আছে!-‘পটের বিবি’ জিনিসটি পরিস্ফুট করিবার জন্য উত্তমরূপে সাজিয়া যেরূপ ভাবে বসিয়া থাকা উচিত বলিয়া সখী ঠাকরুনের ধারণা তিনি এখানে তাহার অভিনয় করিলেনএ তো বাপু কখনও কোথাও বাপের জন্মে দেখিনি, শুনিওনি–

দালানের মধ্য হইতে অন্নদা রায়ের পুত্রবধূ নাকীসুরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল-পটের বিবি হয়ে সেজে বসে থাকি নাকি! কাল যে দশ সেরা মুগের ডাল ভাজলাম সারা বিকেল ধরে? দুপুর বেলা খেয়েই আরম্ভ করিচি, আর যখন পাঁচটার গাড়ি যাওয়ার শব্দ পেলাম তখনও খোলার তাতেই বসে আছি, দু-ধামা ডাল ভাজা রে, ভাঙা রে-করে অন্ধকার হয়ে গিয়েচে তখন উঠিচি-সে। কি অমনি হয়? গা-গতর ব্যথা হয়ে গেচে, রাত্তিরে বলি বুঝি জ্বর হল, এমনি গায়ে-হাতে ব্যথা-তা কি কেউ দ্যাখে? তার ওপর সকাল বেলা বিনি দোষে এই মার-কেন সংসারে কি বসে বসে খাই?

এমন সময় অন্নদা রায়ের ছেলে গোকুল এক হাতে একখানা কঁচা বাঁশের পাতাসুদ্ধ ডগা ও আর এক হাতে দা লইয়া বাড়ি ঢুকিল। স্ত্রীর কান্নার শেষ অংশ শুনিতে পাইয়া গর্জন করিয়া কহিল–এখনও তোমার হয়নি-এখন তোমার আদেষ্টে বেস্তর দুকথু আছে দেখচি-আমার রাগ বাড়িও না মেলা সক্কাল বেলা! আজ তিনদিন ধরে ধানগুলো রোদুরে দেওয়ার জন্যে বলে বলে হয়রান-এই মেঘলা মেঘলা যাচ্চে, এর পর ধানগুলো যদি কলিয়ে যায়, তবে তোমার কোন বাবা এসে সামলাবে?...সারা বছরের পিণ্ডি জুটবে কোথেকে?

গোকুলের বউ হঠাৎ কান্না বন্ধ করিয়া তেজের সহিত জোর গলায় বলিয়া উঠিল–তুমি আমার বাবা তুলে গালাগালি কোরো না বলে দিচ্চি-আমার বাবা কি করেচে। তোমার, কেন তুমি বাবার নামে যখন তখন যা তা বলবে?

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে গোকুল হাতের বাঁশ নামাইয়া রাখিয়া দা হাতে এক লাফে রোয়াকের সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া কহিল—তবে রে! আজি তোমার একদিন কি আমার একদিন– তোমার বাপের বাড়ির আবদার না ঘুচিয়ে আমি আজ–

একটা খুনোখুনি ব্যাপার বুঝি বা হয় দেখিয়া বাড়ির কৃষাণ উঠান হইতে ডাকিয়া কহিল-কি করেন। দ-ঠাকুর-কি করেন, থামুন, থামুন-পরে সে ছুটিয়া রোয়াকে উঠিল-দুর্গাঁও ছুটিয়া আসিল—সখী ঠাকুবুনও রোয়াক হইতে দালানের মধ্যে ঢুকিলেন- খুব একটা হৈ-চৈ হইল। দালানের মধ্যে গোকুলের স্ত্রী স্বামীর উদাত আক্রমণের সম্মুখে পিছাইয়া গিয়া মার ঠেকাইবার জন্য দুই হাত তুলিয়া দেওয়ালের গায়ে প্রাণপণে ঠেস দিয়া জড়োসড়ো হইয়া দাঁড়াইয়াছে, চোখে তার ভয়ের দৃষ্টি-কৃষাণ গিয়াই গোকুলের হাত হইতে দা-খানা কড়িয়া লইল; পরে তাহাকে ধরিয়া দালানের বাহিরে আনিতে আনিতে বলিতে লাগিল—কি করেন। দ-ঠাকুর, থামুন-আঃ—আসুন–

গোকুলের বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের কম নয়, কিন্তু দেহ তেমন সবল নহে, বলিষ্ঠ কৃষাণের সহিত ম্যালেরিয়া-দুর্বল দেহ লইয়া হাত ছাড়াছাড়ির চেষ্টা করিতে গেলে দুর্বলতাটাই অধিকতর প্রকাশ হইয়া পড়িবে বুঝিয়া বলিতে বলিতে নামিল-দ্যাখো না-একটা ডোল ধান, বীজ ধান, জল পেয়ে যদি কলিয়ে যায়, ও কি আর রোয়া হবে? আজ তিনদিন ধরে বলচি-আবার তেজড়া দেখলে তো?–তোমার তেজ আমি–

দুর্গা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, কিন্তু এ সময়ে খুড়িমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় কথাবার্তার সময় নাই বুঝিয়া সে একপ্রকার নিঃশব্দেই অন্নদা রায়ের বাড়ির বাহির হইয়া পড়িল।

পাঁচু বাঁড়ুজ্যের বাড়ির কাছে জামতলায় একজন লোক ঘটিবাটি সারাইতে বসিয়াছে। কাঠের কয়লার হাপরে গানগনে আগুন, পাড়ার লোকের অনেক ভাঙা ঘটিবাটি জড়ো করা। বেঁটে ধরনের লোকটা, পাকসিটে গড়নের চেহারা, বয়স কত বুঝিবার উপায় নেই, ত্রিশও হইতে পারে, পঞ্চাশও হইতে পারে, গলায় ত্রিকাঠি তুলসীর মালা, মুখের ডান দিকে একটা কাটার দাগ-হাতের কজিতে দড়ির মতো শিরা বাহির হইয়া আছে, পরনে আধময়লা ধুতি। পাড়ার অনেক ছেলেমেয়ে তাহাকে ঘিরিয়া ঘটিবাটি সারানো দেখিতেছে। দুর্গাঁও গেল। লোকটা বলিল-কি চাই খুকি?

সে বলিল-কিছু না, দেখবো।

বাড়ি ফিরিয়া মা'র কাছে বলিল-আজ মা গোকুল কাকা খুড়িমাকে যা মেরেছে সে কি বলবো-পরে সে আনুপূর্বিক বর্ণনা করিল।

সর্বজয়া বলিল-গোঁয়ার গোবিন্দ চাষা একটা বই তো নয়!—আহা, ভালোমানুষ বৌটা এমন হাতে আর এমন বাড়িতে পড়েচে-ঠেঙা খেতে খেতেই জীবনটা গেল।

-আমাকে তো বড় ভালোবাসে-যখন যা বাড়িতে হবে, আমার জন্যে তুলে রেখে দেবে। খুড়িমার কান্না দেখে এমন কষ্ট হল মা! সখী ঠাকুমা আবার এখন উলটে খুড়িমাকেই বকে—

সে তিন-চার দিন জামতলায় ঘটিবাটি সারানো দেখিতে গেল। লোকটি তাহার বাড়ি, বাপের নাম সব খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করে। বলিল–তোমাদের বাড়ির জিনিসপত্তর সারাবে না? নিয়ে এসো না খুঁকি?

দুর্গা বাড়ি আসিয়া মাকে বলিল-আমাদের ভাঙা ঘটি-গাড়গুলো দেবে মা, একজন বেশ ভালোমানুষ লোক এসেচে-ওপাড়ার পথে জামতলায় বসে সারাচ্ছে–

লোকটা তার নাম বলে পিতম-জাতে নাকি কাসারি। হাপর জ্বালাইতে জ্বালাইতে একএকবার সোজা হইয়া বসিয়া বলে–জয় রাধে!–রাধে গোবিন্দ!

সকাল বেলা তাহার কাছে পাড়ার অনেকে আসিয়া জোটে। সে চিমটা দিয়া হাপর হইতে আগুন উঠাইয়া অনবরত তামাক সাজিয়া ভদ্রলোকদের হাতে দিতেছে–দিবার সময় মুখখানা বিনয়ে কঁচুমাচু করিয়া ঘাড় একধারে কাত করিয়া বলে-হেঁ হেঁ, তামাক ইচ্ছে করুন, বাবাঠাকুর!– রাধারানী-পদ ভরসা!..নারকেলের কথা আর বলবেন না বাবাঠাকুর, আর বছর জষ্টিমাসে বলি দিই গোটাকতক চারা বসিয়ে!–আন্ধকাঠ-খানেক জমিতে ছগণ্ডা চারা কিনে লাগিয়ে দিলাম–তা ব্যাঙের উপদ্রুতে—একেবারে মূলশেকড়-টুল শেকড় সবসুদ্দ…কটা টাকাই মাটি।

মুখুজ্যে মশায় সকাল হইতে ঠায় বসিয়া আছেন, কোনো রকমে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া একটা পিতলের ঘাড়া বিনামূল্যে সারাইয়া লইবেন। তামাক খাইতে খাইতে পূর্ব কথার খেই ধরিয়া বলিলেন—এই তো গেল কাণ্ড বাপু-তো-এবারও তো ভেবেছিলাম কুড়িখানেক চারা বাড়ির পেছনে-তা এমন ম্যালেরিয়া ধরল–তোমাদের ওদিকে কি রকম হে কারিগর? (তিনি সকাল হইতেই তাহাকে কারিগর বলিয়া ডাকিতেছেন)।

-পরিপুন্নু-আজ্ঞে পরিপুন্নু-ম্যালেরিয়ার কথা বলবেন না বাবাঠাকুর-হাড় জ্বালিয়ে খেয়েচে–এই নিন। আপনার ঘাড়াটা, ছটা পয়সা দেবেন—

মুখুজ্যে মশায় ঘড়াটা হাতে লইয়া উঠিয়া পড়িয়া বলেন-হ্যাঁ! এর জন্যে আবার পয়সা।– দিলে একটা জিনিস ব্রাহ্মণকে সারিয়ে আমনি কীর্তিক মাসের দিনটা-তার আবার

পিতম তাড়াতাড়ি মুখুজ্যে মশায়ের হাতের ঘড়াটা ধরিয়া অত্যন্ত অমায়িক ভাবে হাসিয়া বলে-আজ্ঞে না, মাপ করবেন বাবাঠাকুর, এমনি সারিয়ে দিতে পারবো না-এখনও সক্কাল বেলা বউনি হয়নি। আজ্ঞে না।–তা পারবো না।–ঘড়াটা রেখে যান-বাড়ি গিয়ে পাহা কটা পাঠিয়ে দেবেন—

দুর্গার মা বলে-দেখিস দিকি-ভাঙা বাসন-কোসন বদলে নতুন বাসন-কোসন অনেক সময় ওরা দেয়-জিজ্ঞেস করিস তো।

পিতম খুব রাজি। দুর্গা বাড়ি হইতে বহিয়া বহিয়া এক রাশি পুরানো গাড় ঘটিবাটি ঘড়া তাহার কাছে লইয়া গিয়া হাজির করে। অর্ধেক দিনটা সে জামতলাতেই কাটায়-হাপর জ্বালানো, রং ঝাল করা বসিয়া বসিয়া দেখে। পিতম বলিয়াছে তাহাকে একটা পিতলের আংটি গড়াইয়া দিবে-ইহাও বলিয়াছে যে, সারাইবার পয়সা তাহাদের লাগিবে না। সর্বজয়া শুনিয়া বলে-আহা বড় ভালো লোকটা তো! আসচে বুধবার অপুর জন্মবারটা, বলিস তাকে আসতে—আমাদের এখানে দুটো ডালভাত পেরসাদ পেয়ে যাবে এখন–

বুধবার সকালে উঠিয়া দুর্গা জামতলায় গিয়া দেখিল লোকটা নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিল পূর্বদিন সন্ধ্যার পর কোন সময়ে সে দোকান উঠাইয়া চলিয়া গিয়াছে—হাপরের গর্ত ও পোড়া কয়লার রাশি ছাড়া অন্য কোন চিহ্ন নাই। দুর্গা এখানে ওখানে খোঁজ করিল-একে ওকে জিজ্ঞাসা করিল, কেহ জানে না। সে কোথায় গিয়াছে। ভয়ে দুর্গার মুখ শুকাইয়া গেল-মা শুনিলে কি বলিবে! সংসারের অর্ধেক বাসন তাহার কাছে যে! সে দুর্গাকে বলিয়াছিল, ঝিকরহাটির বাজারে তাহার কাঁসারির দোকান আছে, সেখানে সে খবর পাঠাইয়াছে।–তাহার ভাই একদিনের মধ্যে নতুন বাসন লইয়া আসিয়া পড়িল বলিয়া-আসিলেই ভাঙাচোরা বাসনগুলা সব বদলাইয়া দিবে। কোথায়ই বা সে-আর কোথায়ই বা তাহার ভাই! কোথায় সে যে গেল তাহা দুর্গা অনেক খুঁজিয়াও পাইল না। কেবলমাত্র তাহদেরই জিনিস গিয়াছো-অন্য খুঁশিয়ার লোকের এক টুকরা পিতলও খোয়া যায় নাই।

সারাদিনের পরে সন্ধ্যার সময় দুর্গা কঁদো কঁদো মুখে মাকে সব বলিল। হরিহর বিদেশেকেই বা খোজ করে, কেই বা দেখে। সর্বজয়া অবাক হইয়া যায়! বলে–একবার তোর রায় জেঠামশায়কে গিয়ে বল তো! ওমা এমন কথা তো কখনও শুনিনি!…

হরিহর বাড়ি আসিলে ঝিকরহাটির বাজারে খোজ করা হইয়াছিল-পিতাম নামক কোন লোকের সেখানে কাসারির দোকান নাই বা উক্ত চেহারার কোনো লোকও সেখানে নাই।

কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। ভাদ্র মাস।

অপু বৈকাল বেলা বেড়াইতে যাইবার সংকল্প করিতেছে, এমন সময়তাহার মা পিছনে ডাকিয়া বলিল-কোথায় বেবুছিস রে অপু?-চাল ভাজা আর ছোলা ভাজা ভাজচি-বেরিয়ো না যেন। …এক্ষুনি খাবি–

অপু শুনিয়াও শুনিল না-যদিও সে চাল-ছোলা ভাজা খাইতে ভালোবাসে বলিয়াই মা তাহার জন্য ভাজিতে বসিয়াছে ইহা সে জানে-তবুও সে কি করিতে পারে?—এতক্ষণ কি খেলাটাই চলিতেছে নীলুদের বাড়িতে? সে যখন বাহির দরজায় পা দিয়াছে, মার ডাক আবার কানে গেলবেবুলি বুঝি -ও অপু, বা রে, দ্যাখো মজা ছেলের! গরম গরম খাবি—-আমি তাড়াতাড়ি ঘাট থেকে এসে ভাজতে লাগলাম-ও অপু-উ-উ-

অপু এক ছুট দিয়া নীলুদের বাড়ি গিয়া পৌঁছিল। অনেক ছেলে জুটিয়াছিল, অপু আসিবার আগেই খেলা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। নীলু বলিল-চল অপু, দক্ষিণ মাঠে পাখির ছানা দেখতে যাবি? অপু রাজি হইলে দুজনে দক্ষিণ মাঠে গেল। ধান ক্ষেতের ওপারেই নবাবগঞ্জের বাঁধা সড়কটি পূর্ব পশ্চিমে লম্বা হইয়া যেন মাঠের মাঝখান চিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। গ্রাম হইতে এক মাইলেব উপব হইবে। অপু এতদূর কখনওবেড়াইতে আসে নাই।–তাহার মনে হইল যেন সমস্ত পরিচিত জিনিসের গণ্ডি ছাড়াইয়া কোথায় কতদূরে নীলুদা তাহাকে টানিয়া আনিল। একটুখানি পরেই সে বলিল, বাড়ি চল নীলুদা, আমায় মা বকবে, সন্দে হয়ে যাবে, আমি এক গাবতলার পথ দিয়ে যেতে পারবো না। তুমি বাড়ি চল——

ফিরিতে যাইয়া নীলু পথ হারাইয়া ফেলিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া কাহাদের একটা বড় আমবাগানের ধারা দিয়া একটা পথ মিলিল। সন্ধ্যা হইবার তখনও কিছু বিলম্ব আছে, আকাশে আবার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে—এমন সময় চলিতে চলিতে নীলু হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া অপুর কনুই-এ টান দিয়া সম্মুখ দিকে চাহিয়া ভয়ের সুরে বলিল-ও ভাই আপু!

অপু সঙ্গীর ভয়ের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বলিল-কি রে নীলুদা? পরে সে চাহিয়া দেখিল, যে সুড়িপথটা দিয়া তাহারা চলিতেছিল, তাহা কাহাদের উঠানে গিয়া শেষ হইয়াছে-উঠানে একখানা ছোট্ট চালাঘর ও একটা বিলাতী আমড়ার গাছ। তাহার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই নীলু। ভয়ের সুরে বলিয়া উঠিল-আতুরী ডাইনির বাড়ি!

অপুর মুখ শুকাইয়া গেল.আতুরী ডাইনির বাড়ি: .সন্ধেবেলা কোথায় আসিয়া ব্রাহারা পড়িয়াছে! কে না জানে যে ওই উঠানের গাছে চুরি করিয়া বিলাতি আমড়া পাড়িবার অঙ্গরাধে ডাইনিটা জেলেপাড়ার কোন এক ছেলের প্রাণ কড়িয়া লইয়া কচুর পাতায় বাঁধিয়া জলে ড়ুবাইয়া রাখিয়াছিল, পরে মাছে তাহা খাইয়া ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে বেচারির আমড়া খাইবার সাধ এ জন্মের মতো মিটিয়া যায়! কে না জানে সে ইচ্ছা করিলে চোখের চাহনিতে ছোট ছেলেদের রক্ত চুষিয়া খাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারে, যাহার রক্ত খাওয়া হইল, সে কিছুই জানিতে পরিবে না, কিন্তু বাড়ি গিয়া খাইয়া-দাইয়া সেই যে বিছানায় শুইবে আর পরদিন উঠিবে না! কতদিন শীতের রাত্রে লেপের তলায় শূইয়া দিদির মুখে আতুরী ডাইনির গল্প শুনিতে শুনিতে সে বলিয়াছে।–রাত্রিতে তুই ওসব গল্প বলিসনে দিদি, আমার ভয় করে,-তুই সেই কুচবরণ রাজকন্যের গল্পটা বল দিকি?

ঝাপসা দৃষ্টিতে সে সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে গেল বাড়িতে কেহ আছে কিনা এবং চাহিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত শরীরা যেন জমিয়া হিম হইয়া গেল. বেড়ার বাঁশের আগড়ের কাছে.অন্য কেহ। নয়, একেবারে স্বয়ং আতুরী ডাইনি তাহদের—এমনকি যেন শুধু তাঁহারই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া!...

যাহার জন্য এত ভয়, তাহাকে একেবারে সম্মুখেই এভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অপুর সামনে পিছনে কোনো দিকেই পা উঠিতে চাহিল না।

আতুরী বুড়ি ভুবু কুঁচকাইয়া তোবড়ানো গালটা আরও ঝুলাইয়া ভালো করিয়া লক্ষ করিবার ভঙ্গিতে মুখটা সামনের দিকে একটু বাড়াইয়া দিয়া পায়ে পায়ে তাহদের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল। অপু দেখিল সে ধরা পড়িয়াছে, কোনো দিকেই আর পলাইবার পথ নাই।–যে কারণেই হউক ডাইনির রাগটা তাহার উপরেই—এখনই তাহার প্রাণটি সংগ্রহ করিয়া কচুর পাতায় পুরিবে! মুখের খাবার ফেলিয়া, মায়ের ডাকের উপর ডাক উপেক্ষা করিয়া সে যে আজ মায়ের মনে কষ্ট দিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে তাহার ফল। এই ফলিতে চলিল। সে অসহায়ভাবে চারিদিকে চাহিয়া বলিল-আমি কিছু জানিনে-ও বুড়ি পিসি-আমি আর কিছু করবো নাআমায় ছেড়ে দাও, আমি ইন্দিকে আর কখনও আসবো না-আজ ছেড়ে দাও ও বুড়ি পিসি–

নীলু। তো ভয়ে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল-কিন্তু অপুর ভয় এত হইয়াছিল যে, চোখে তাহার জল ছিল না।

বুড়ি বলিল-ভয় কি মোরে, ও বাবারা? মোরে ভয় কি?... পরে খুব ঠাট্টা করা হইতেছে ভাবিয়া হাসিয়া বলিল, মুই কি ধরে নেবো খোকারা? এসো মোর বাড়িতি এসো-আমচুর দেবানি এসো–

আমচুর!...ডাইনি বুড়ি ফাকি দিয়া ভুলইয়া বাড়িতে পুরিতে চাহিতেছে—গেলেই আর কি! ডাইনিরা রাক্ষসীরা যে এ-রকম ভুলইয়া ফাঁদে ফেলে-এ-রকম কত গল্প তো সে মা'র মুখে শুনিয়াছে।

এখন সে কি করে!...উপায়?

বুড়ি তাহার দিকে আরও খানিক আগাইয়া আসিতে আসিতে বলিল-ভয় কি ও মোরে বাবারা? মুই কিছু বলবো না, ভয় কি মোরে?

আর কি, সব শেষ! মায়ের কথা না শুনিবার ফল ফলিবার আর দেরি নাই, হাত বাড়াইয়া তাহার প্রাণটা সংগ্রহ করিয়া এখনই কচুর পাতায় পু-রিল! প্রতি মুহুর্তেই তাহার আশঙ্কা হইতেছিল যে এখনই এ বুড়ি হাসিমুখ বদলাইয়া ফেলিয়া বিকট মূর্তি ধরিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিবে।–রাক্ষসী রানীর গল্পের মতো! বনের অজগর সাপের দৃষ্টির কুহকে পড়িয়া হরিণশিশু নাকি অন্য দিকে চোখ ফিরাইতে পারে না, তাহারও চোখদুটির কুহক-মুগ্ধ দৃষ্টি সেরূপ বুড়ির মুখের উপর দৃঢ়নিবদ্ধ ছিলসে আড়ষ্ট কণ্ঠে দিশহারা ভাবে বলিয়া উঠিল, ও বুড়ি পিসি, আমার মা কঁদবে, আমায় আজ আর কিছু বোলো না-আমি তোমার গাছে কোনো দিন আমড়া নিতে আসিনি-আমার মা কঁদবেআতঙ্কে সে নীলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।...বাড়ি, ঘরদোর, গাছপালা, নীলু, চারিধারা যেন ধোঁয়া ধোঁয়া। কেহ কোনোদিকে নাই...কেবল একমাত্র সে আর আতুরী ডাইনির ক্রুর দৃষ্টি মাখানো একজোড়া চোখ..আর অনেক দূরে কোথায় যেন মা আর তাহার চাল-ভাজা খাওয়ার ডাক।!...

পরক্ষণেই কিন্তু অত্যধিক ভয়ে তাহার একরূপ মৰীয়া সাহস জোগাইল, একটা অস্পষ্ট আর্তরব করিয়া প্রাণভয়ে দিশাহারা অবস্থায় সে সম্মুখের ভাট, শেওড়া, রাংচিতার জঙ্গল ভাঙিয়া ডিঙাইয়া সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে যেদিকে দুই চোখ যায় ছুটিল-নীলুও ছুটিল তাহার পিছনে পিছনে।...

ইহাদের ভয়ের কারণ কি বুঝিতে না পারিয়া বুড়ি ভাবিল-মুই মাত্তিও যাইনি, ধত্তিও যাইনি-কঁচা ছেলে, কি জানি মোরে দেখে কেন ভয় পালে সন্দেবোলা? খোকাডা কাদের?

অপু যখন বাড়ি আসিল, তখন সন্ধা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সর্বজয়া সবে উনুন ধরাইয়া তালের বড়া ভাজিবার আয়োজন করিতেছে, দুর্গা নিকটে বসিয়া তাল চাচিয়া রস বাহির করিতেছে-ছেলেকে দেখিয়া বলিল-কোথায় ছিলি বল দিকি? সেই বেরিয়েচো বিকেলবেলা, কিছুই তো আজ খাবার খেলিনে-খিদেতেষ্টা পায় না?

মায়ের নিকট বলিবার জিনিস অপুর মনে স্তুপাকার হইয়া সকলেই একসঙ্গে বাহিরে আসিবার জন্য এরূপভাবে চেষ্টা পাইতেছিল যে, পরস্পরের ঠেলা ঠেলিতে পরস্পরের নির্গমপথ এককালীন বুদ্ধ হইয়া গিয়া অপুকে একেবারে নির্বক করিয়া দিল। সে শুধু বলিল-আমি কি কাপড় ছাড়বো মা? আমার এখানা ওবেলার কাপড়–

পরে সে বিস্ময়ের সহিত দেখিল যে, মা তাহাকে চালভাজা দিবার কোনো আগ্রহই না দেখাইয়া তালের রসটা ঘন না পাতলা হইয়াছে, তাহাই অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিতেছে। পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে দুর্গাকে বলিল-দু-চারখানা ভেজে দেখি, না হয়, বড় তক্তপোশের নিচেটায় চালের গুড়ো আছে, আর দুটো নিয়ে আসিস এখন-পরে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল-দাঁড়া অপু, তোকে গরম গরম ভেজে দিচ্ছি।

অপু বলিল-কেন মা, চাল-ছোলা ভাজা কই?

–তা চাল ভাজা তুই খেলি কই? এতবার ডাকলাম, তুই বেরিয়ে চলে গেলি -ঠাণ্ডা হয়ে গেল, দুর্গা খেয়ে ফেল্লে, তা এই বড় তো হয়ে গেল বলে। ভাজবো আর দেবো–

অপু সেই বৈকালবেলা হইতে মনের মধ্যে যে তাসেব ঘর নির্মাণ করিতেছিল, এক ফুযে কে তাহা একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দিল। এই তাহার মা তাহাকে ভালোবাসে! সে বৈকালবেলা বাটীব বাহিরে যাওয়ার পর হইতে অনবরত ভাবিতেছে-মা না জানি কত দুঃখই করিতেছে তাহার জন্য! অপু আমার এখনও কেন যে এলো না, তার জন্যে এত করে ঘাট থেকে এসে ভাঁজলাম, আহা সে দুটো খেলে না-হা, দায় পড়িযছে, তাহার জন্য ভাবিয়া তো মায়েব ঘুম নাই-মা দিব্যি সেগুলি দিদিকে খাওয়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে–সে-ই শুধু এতক্ষণ মিছামিছি ভাবিয়া মরিতেছিল।

দুর্গা বলিল-মা শিগগির শিগগির ভেজে নাও। বড় মেঘ করে আসচে, বিষ্টি এলে আর ভাজা হবে না,-ঘরে যে জল পড়ে!—সেদিনকার মতো হবে কিন্তু–

দেখিতে দেখিতে চারিধার ঘিরিয়া ঘনাইয়া-আসা মেঘের ছায়ায় বাশবনেৰ মাথা কালো হইয়া উঠিল। খুব মেঘ জমিয়া আকাশ অন্ধকার হইয়াছে, অথচ বৃষ্টি এখনও নামে নাই-এসময় মনে এক প্রকার আনন্দ ও কৌতুহল হয়—না জানি কি ভয়ঙ্কর বৃষ্টিই আসিতেছে, পৃথিবী বুঝি ভাসাইয়া লইয়া যাইবে-অথচ বৃষ্টি হয় প্রতিবারই, পৃথিবী কোনোবারেই ভাসায় না, তবুও এ মোহটুকু ঘোচে না! দুর্গার মন সেই অজানার আনন্দে ভরিয়া উঠিল, সে মাঝে মাঝে দাওয়ার ধারে আসিয়া নিচু চালের ছাঁচ হইতে মুখ বাড়াইয়া মেঘান্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল।

সর্বজয়া খানকতক বড়া ভাজিয়া বলিল–এই বাটিটা করে ওকে দে তো দুগগা।-ওরা খিদে পেয়েচে, বিকেল থেকে কিছু তো খায় নি! এই শেষ কথাই কাল হইল-এতক্ষণ অপু যা হয় এক রকম ছিল। কিন্তু মায়ের শেষের দিকের আদরের সুরে তাহার অভিমানের বাঁধি একেবারে ভাঙিয়া পড়িল, সে বড়াসুদ্ধ বাটিটা উঠানে স্টুড়িয়া দিয়া বলিল-আমি খাবো না তো বড়া, কখখনো খাবো না—যাও–

সর্বজয়া ছেলের কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল। গরিবের ঘরকন্না, কত কষ্টে যে কি জোগাড় করিতে হয় সে-ই জানে। আর হতভাগা ছেলেটা কিনা। দু-দুবার সেই কত কষ্টে সংগৃহীত মুখের জিনিস নষ্ট করিল! ক্ষোভে, রাগে সে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল–তোমার আজ হয়েছে কি! তোমার অদৃষ্ট আজ ছাই লেখা আছে, খেয়ো এখন তাই গরম গরম–

এবার অপুর পালা। এ রকম কথা মা'র মুখে সে কখনও শোনে নাই। কোথায় সে চাহিতেছে, মা দুটো আদরের কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিবে, না সন্ধ্যাবেলা এমননিষ্ঠুর কথা! সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, আচ্ছা মা, আমি চালভাজা খাইনি তাতে আমার মনে কষ্ট হয় না? আমি বিকেল থেকে ভাবছিনে বুঝি? আমি-আমি কখখনো তোমার বাড়ি আর আসচিনে-আমি ছাই খাবো, কেন আমি ছাই খাবো? আর দিদি বুঝি সব ভালো ভালো জিনিস খাবে? আমি আসবো না তোমার বাড়ি, কখখনো আসবো না–

পরে সে আতুরী বুড়ির বাড়ি হইতে এইমাত্র যেরূপ অন্ধকার, কঁটাবন, আমবন না মানিয়া ছুটিয়াছিল এখনও রাগে আত্মহারা হইয়া দাওয়া হইতে নামিয়া বাহিরের উঠানের দিকে ঠিক সেইরূপ মরীয়ার মতো ছুটিল। ভাই-এর অভিমান-ভরা দৃষ্টি, ফুলা ঠোঁট ও কথা বলিবার ধরন দুর্গার নিকট এরূপ হাস্যকর ঠেকিল যে, সে হাসিয়া প্রায় গড়াইয়া পড়িল।–হি-হি-অপুটা-একেবারে পাগল মা, কেমন বল্লে-পরে ভাই-এর কথা বলিবার উক্তির নকল করিয়া বলিল-আমি চালভাজা খাইনি-হি-হি-তাতে বুঝি আমার কষ্ট হয় না? বোকা একেবারে যা-ও অপু, শুনে যা, ও অপু-উ-উ–

অপু ছুটিয়া পাচিলের পাশের পথ দিয়া পিছনের বাঁশবাগানের দিকে ছুটিল। আকাশে মেঘ তখনও থমকিয়া আছে, বাশবনের তলাটা ঝোপেঝাড়ে নির্জন বর্ষসিন্ধ্যায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। সহজ অবস্থায় এরূপ স্থানে এ-সময় এক আসিবার কল্পনাই সে করিতে পারিত না কোনদিনও। কিন্তু বর্তমানে চারিধারের নির্জনতা ও অন্ধকার, বাঁশঝাড়ের মধ্যে কিসের খড়মড় শব্দ, অদূরে সলতেখাগী আমগাছে ভূতের প্রবাদ প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল—আমি কখখনো বাড়ি যাবো না তো!—এ জন্মে আর বাড়ি যাবো না–

অভিমানের প্রথম বেগটা কাটিয়া গেলে তাহার একটু গা ছমছম কবিতে লাগিল—ভয়ে ভয়ে সে একবার দূরের সলতে-খাগী আমগাছটার দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার মনে হইল—এখন যদি একটা ভুতে আমায় তুলে একবারে মগডালে নিয়ে যায় তো বেশ হয়-মা খুঁজে খুঁজে কেঁদে মরেভাবে, কেন সন্দেবোলা ছাই খাও বল্লাম, তাই তো খোকা আমার রাগ করে কোথায় অন্ধকারে মেঘ মাথায় বেরিয়ে চলে গেল, আর ফিরে এলো না। ভূতের হাতে সে মরিয়া গেলে মা'র কি রকম কষ্ট হইবে তাহা সে খানিকক্ষণ প্রতিহিংসার আনন্দে উপভোগ করিল। পরে সেখান হইতে সে গিয়া পাচিলের পাশের পথে দাঁড়াইল। তাহার ভয় ভয় করিতেছিল-সম্মুখের বাঁশঝাড়ে একটা যেন অস্পষ্ট শব্দ হইল, অপু একবার ভয়ে ভয়ে চোখ উঁচু করিয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার মা ও দিদি রানুদের বাড়ির দিকে ডাকিতেছে-ও অপু-উ-উ! বাঁশঝাড়ে আবার যেন একটা শব্দ হইল। সে মনে মনে বড় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু মুশকিল। এইযে, তাহাকে খোোশামোদ না করিলে সে নিজেই এত রাগের মাথায় বাড়ি গিয়া ঢুকিবে, সত্য সত্য এতটা আত্মসম্মানজ্ঞানশূন্য সে নয়। নিশ্চয়ই। এবার তাহার দিদি রানুদের বাড়ির খিড়কি দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে যেন। সে ছুটিয়া দরজার সামনে পাচিলের কোণটাতে দাঁড়াইল। হঠাৎ আসিতে আসিতে পাচিলের পাশে চোখ পড়িতেই দুর্গা চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, ওই দাঁড়িয়ে রয়েছে মা! ...এই দ্যাখো পাচিলের পাশে। পরে সে ছুটিয়া গিয়া ভাইয়ের হাত ধরিল। (ছুটিবার আবশ্যকতা ছিল না।)-ওরে দুষ্টু, এখানে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকা হয়েচে, আর আমি আর মা সমস্ত জায়গা খুঁজে বেড়াচ্চি, এই দ্যাখে।

দুজনে মিলিয়া তাহাকে বাড়ির মধ্যে ধরিয়া লইয়া গেল।

# ষোড়শ পরিচ্ছেদ

এবার বাড়ি হইতে যাইবার সময় হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। বলিল- বাড়ি থেকে কিছু খেতে পায় না, তবুও বাইরে বেবুলে দুধটা, ঘিটা-ওর শরীরটা সারবে এখন।

অপু জন্মিয়া অবধি কোথাও কখনও যায় নাই। এ গাঁয়েরই বকুলতলা, গোঁসাইবাগান, চালতোতলা, নদীর ধার-বড়জোর নবাবগঞ্জ যাইবার পাকা সড়ক-এই পর্যন্ত তাহার দৌড়। মাঝে মাঝে বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসে খুব গরম পড়লে তাহার মা বৈকালে নদীর ঘাটে দাঁড়াইয়া থাকিত। নদীর ওপারের খড়ের মাঠে বাবলা গাছে গাছে হলুদ রং-এর ফুল ফুটিয়া থাকিত, গরু, চরিত, মোটা গুলঞ্চলতা-দুলানো শিমুল গাছটাকে দেখিলে মনে হইত যেন কতকালের পুরাতন গাছটা। রাখালেরা নদীর ধারে গরুকে জল খাওয়াইতে আসিত, ছোট্ট একখানা জেলেডিঙি বাহিয়া তাহাদের গায়ের অঙ্কুর মাঝি মাছ ধরিবার দোয়াড়ি পাতিতে যাইত, মাঠের মাঝে মাঝে ঝাড় ঝাড় সৌদালি ফুল বৈকালের ঝিরঝির বাতাসে দুলিতে থাকিত-ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ এক-একদিন ওপারের সবুজ খড়ের জমির শেষে নীল আকাশটা যেখানে আসিয়া দূর গ্রামের সবুজ বনরেখার উপর ঝুকিয়া পড়িয়াছে, সেদিকে চাহিয়া দেখিতেই তাহার মনটা যেন কেমন হইয়া যাইত-সে সব প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া বলিতে জনিত না। শুধু তাহার দিদি ঘাট হইতে উঠিলে সে বলিত-দিদি দিদি, দ্যাখা দ্যাখ ওইদিকে-পরে সে মাঠের শেষের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিত-ওই যে? ওই গাছটার পিছনে? কেমন অনেক দূর, না?

দুর্গা হাসিয়া বলিত-অনেক দূর-তাই দেখাচ্ছিলি? দূর, তুই একটা পাগল!

আজ সেই অপু সর্বপ্রথম গ্রামের বাহিরে পা দিল। কয়েকদিন পূর্ব হইতেই উৎসাহে তাহার রাত্রিতে ঘুম হওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছিল, দিন গুনিতে গুনিতে অবশেষে যাইবার দিন আসিয়া গেল।

তাহাদের গ্রামের পথটি বাঁকিয়া নবাবগঞ্জের সড়ককে ডাইনে ফেলিয়া মাঠের বাহিরে আষাঢ়ু-দুর্গাপুরের কঁচা রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে। দুর্গাপুরের রাস্তায় উঠিয়াই সে বাবাকে বলিল-বাবা, যেখান দিয়ে রেল যায় সেই রেলের রাস্তা কোন দিকে?

তাহার বাবা বলিল-সামনেই পড়বে এখন, চলো না। আমরা রেল লাইন পেরিয়ে যাব এখন–

সেবার তাঁহাদের রাঙী গাইয়ের বাছুর হারাইয়াছিল। নানা জায়গা খুঁজিয়াও দুই তিন দিন ধরিয়া কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। সে তাহার দিদির সঙ্গে দক্ষিণ মাঠে বাছুর খুঁজিতে আসিয়াছিল। পৌষ মাস, ক্ষেতে ক্ষেতে কলাই গাছের ফলে দানা বাঁধিয়াছে, সে ও তাহার দিদি নিচু হইয়া ক্ষেত হইতে মাঝে মাঝে কলাই ফল তুলিয়া খাইতেছিল-তাহাদের সামনে কিছুদূরে নবাবগঞ্জের পাকা রাস্তা, খেজুর গুড় বোঝাই গরুর গাড়ির সারি পথ বাহিয়া ক্যাঁচ ক্যাঁচ করিতে করিতে আষাঢ়ুর হাটে যাইতেছিল।

তাহার দিদি পাকা রাস্তার ওপারে বহুদূরে ঝাপসা মাঠের দিকে একদৃষ্টি চাহিয়া; কি দেখিতেছিল, হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—এক কাজ করবি অপু, চল যাই আমরা রেলের রাস্তা দেখে আসি, যাবি?

অপু বিস্ময়ের সুরে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল-রেলের রাস্তা-সে যে অনেক দূর! সেখানে কি করে যাবি?

তাহার দিদি বলিল—বেশি দূর বুঝি। কে বলেচে তোকে-ওই পাকা রাস্তার ওপারে তো–

অপু বলিল-নিকটে হলে তো দেখা যাবে? পাকা রাস্তা থেকে দেখা যায়—চলদিকি দিদি, গিয়ে দেখি।

দুইজনে অনেকক্ষণ নবাবগঞ্জের সড়কে উঠিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার দিদি বলিলবড় অনেক দূর, না। যাওয়া যাবে না–

–কিছু তো দেখা যায় না-অত দূর গেলে আবার আসব কি করে? তাহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু দূরের দিকে আবদ্ধ ছিল, লোভও হইতেছিল, ভয়ও হইতেছিল। হঠাৎ তাহার দিদি মরীয় ভাবে বলিয়া উঠিল-চল যাই দেখে আসি অপু-কতদূর আর হবে? দুপুরের আগে ফিরে আসবো এখন, হয়তো রেলের গাড়ি যাবে এখন-মাকে বলবো বাছুর খুঁজতে দেরি হয়ে গেল–

প্রথমে তাহারা একটুখানি এ-দিক ও-দিক চাহিয়া দেখিল কেহ তাহাদিগকে লক্ষ করিতেছে কিনা। পরে পাকা রাস্ত হইতে নামিয়া পড়িয়া দুপুর রোদে ভাই বোনে মাঠ বিল জলা ভাঙিয়া সোজা দক্ষিণ মুখে ছুটিল। দৌড়, দৌড়, দৌড়-নবাবগঞ্জের লাল রাস্তা ক্রমে অনেক দূর পিছাইয়া পড়িল-রোয়ার মাঠ, জলসত্রতলা, ঠাকুরঝি পুকুর বামধারে, ডানধাবে দূরে দূরে পড়িয়া রহিলসামনে একটা ছোট বিল নজরে আসিতে লাগিল। তাহার দিদি হাসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিলমা টের পেলে কিন্তু-পিঠের ছাল তুলবে। অপু একবার হাসিল—মরীয়ার হাসি। আবার দৌড়, দৌড় দৌড়,-জীবনে

এই প্রথম বাধাহীন, গণ্ডিহীন মুক্তির উল্লাসে তাহাদের তাজা তরুণ রক্ত তখনমাতিয়া উঠিয়াছিল-পরে কি হইবে, তাহা ভাবিবার অবসর কোথায়?

পরে যাহা হইল, তাহা সুবিধাজনক নয়। খানিক দূরে গিয়া একটা বড় জলা পড়িল একেবারে সামনে-হোগলা আর শোলা গাছে ভরা, তাহার উপব তাহার দিদি পথ হারাইয়া ফেলিল-কোনো গ্রামও চোখে পড়ে না।–সামনে কেবল ধানক্ষেত, জলা, আর বেত-ঝোপ।। ঘন বেতীবনের ভিতর দিয়া যাওয়া যায় না, পাঁকে জলে পা পুতিয়া যায়, রৌদ্র এমন বাড়িয়া উঠিল যে, শীতকালেও তাহাদের গা দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল-দিদির পরনের কাপড় কাটায় নানা স্থানে ছিঁড়িয়া গেল, তাহার নিজের পাযে দু'তিন বার কাটা টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে হইল-শেষে রেলরাস্তা দূরের কথা, বাড়ি ফেরাই মুশকিল হইয়া উঠিল। অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়ছে, পাকা রাস্তাও আর দেখা যায় না, জল ভাঙিয়া ধানক্ষেত পার হইয়া যখন তাহারা বহু কষ্টে আবার পাকা রাস্তায় আসিয়া উঠিল তখন দুপুর ঘুরিয়া গিয়াছে। বাড়ি আসিয়া তাহার দিদি বুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলিয়া তবে নিজের ও তাহার পিঠ বাঁচাইল।

সেই রেলের রাস্তা আজ এমনি সহজভাবেই সামনে পড়িবে—সেজন্য ছুটিতে হইবে না, পথ হারাইতে হইবে না-বকুনি খাইতে হইবে না!

কিছু দূর গিয়া সে বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া দেখিল নবাবগঞ্জের পাকা সড়কের মতো একটা উঁচু রাস্তা মাঠের মাঝখান চিরিয়া ডাইনে বাঁয়ে বহুদূর গিয়াছে। রাঙা রাঙা খোয়ার রাশি উঁচু হইয়া ধারের দিকে সাবি দেওয়া। সাদা সাদা লোহার খুঁটির উপরযেন একসঙ্গে অনেক দড়ির টানা বাধা-যতদূর দেখা যায়, ওই সাদা খুঁটি ও দড়ির টানা বাধা দেখা যাইতেছে—

তাহার বাবা বলিল-ওই দ্যাখো খোকা, রেলের রাস্তা—

অপু একদৌড়ে ফটিক পার হইয়া রাস্তার উপর আসিয়া উঠিল। পরে সে রেলপথের দুইদিকে বিস্ময়ের চোখে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দুইটা লোহা বরাবর পাতা কেন? উহার উপর দিয়া রেলগাড়ি যায়? কেন? মাটির উপর দিয়া না গিয়া লোহার ওপর দিয়া যায় কেন? পিছলাইয়া পড়িয়া যায় না? কেন? ওগুলোকে তার বলে? তাহার মধ্যে সোঁ সোঁ কিসের শব্দ? তারে খবর যাইতেছে? কাহারা খবর দিতেছে? কি করিয়া খবর দেয়? ওদিকে কি ইস্টিশান? এদিকে কি ইস্টিশান?

সে বলিল-বাবা, রেলগাড়ি কখন আসবে? আমি রেলগাড়ি দেখবো বাবা।

–রেলগাড়ি এখন কি করে দেখবে?…সেই দুপুরের সময় রেলগাড়ি আসবে, এখনও দুঘণ্টা দেরি!

–তা হোক বাবা, আমি দেখে যাবো, আমি কখখনো দেখিনি-হ্যাঁ বাবা-ও রকম কোরো না, ওই জন্য তোমায় কোথাও আনতে চাইনে—এখন কি করে দেখবে? সেই দুপুর একটা অবধি বসে থাকতে হবে তা হলে এই ঠায় রোদুরে, চল আসবার দিন দেখাবো।

অপুকে অবশেষে জল-ভরা চোখে বাবার পিছনে পিছনে অগ্রসর হইতে হইল।

তুমি চলিয়া যাইতেছ…তুমি কিছুই জানো না, পথের ধারে তোমার চোখে কি পড়িতে পারে, তোমার ডাগর নবীন চোখ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় চারিদিককে গিলিতে গিলিতে চলিয়াছে–নিজের আনন্দের এ হিসাবে তুমিও একজন দেশ-আবিষ্কারক। অচেনার আনন্দকে পাইতে হইলে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, তাহার মানে নাই। আমি যেখানে আর কখনও যাই নাই, আজ নতুন পা দিলাম, যে নদীর জলে নতুন স্নান করিলাম, যে গ্রামের হাওয়ায় শরীর জুড়াইল, আমার আগে সেখানে কেহ আসিয়াছিল। কিনা, তাহাতে আমার কি আসে যায়? আমার অনুভূতিতে তাহা যে অনাবিষ্কৃত দেশ। আমি আজ সর্বপ্রথম মন, বুদ্ধি, হৃদয় দিয়া উহার নবীনতাকে আস্বাদ করিলাম যে।

আমডোব! ছোট্ট চাষাদের গাঁ-খান-কেমন নামটি! মেয়ে বা উঠানে বিচালি কাটিতেছে, ছাগল বাঁধিতেছে, মুরগিকে ভাত খাওয়াইতেছে, বড় লোকেরা পাট শুকাইতেছে, বাঁশ কাটিতেছে—দেখিতে দেখিতে গাঁ পিছনে ছাড়িয়া একেবারে বাইরের মাঠ…বিলে জল থই থই করিতেছে…উড়ি ধানের ক্ষেতে বক বসিয়া আছে, নাল ফুলের পাতা ও ফুটন্ত ফুলে জল দেখা যায় না।

খলসেমবির বিলের প্রান্তে ঘন সবুজ আউশ ধানের ক্ষেতেব উপবকার বৃষ্টিধৌত, ভাদ্রের আকাশের সুনীল প্রসার। সারা চক্রবাল জুড়িয়া সূর্যাস্তের অপরূপ বর্ণচ্ছটা, বিচিত্র রং-এর মেঘের পাহাড়, মেঘের দ্বীপ, মেঘের সমুদ্র, মেঘের স্বপ্নপুরী.খোলা আকাশের সহিত এরকম পরিচয় তাহাব এতদিন হয় নাই, মাঠের পারের দূরের দেশটা এবার তাহার রহস্য-অবগুণ্ঠন খুলিল আট বছরের ছেলেটির কাছে।

যাইতে যাইতে বড় দেরি হইল। তাহার বাবা বলিল-তুমি বড্ড হাঁ-করা ছেলে, যা দ্যাখো তাতেই হাঁ করে থাকো কেন অমন? জোরে হাঁটো।

সন্ধ্যার পর তাহারা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিল। শিষ্যের নাম লক্ষ্মণ মহাজন, বেশ বড় চাষী ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বাহিরের বড় আটচালা ঘরে মহা আদরে তাঁহাদের থাকিবার স্থান করিয়া দিল।

লক্ষ্মণ মহাজনের ছোটভাইয়ের স্ত্রী সকালে স্নান করিবার জন্য পুকুরের ঘাটে আসিয়াছে–জলে নামিতে গিয়া পুকুরের পাড়ে নজর পড়াতে সে দেখিল পুকুরপাড়ের কলাবাগানে একটি অচেনা ছোট ছেলে একখানি কঞ্চি হাতে কলাবাগানের একবার এদিক একবার ওদিক পায়চারি করিতেছে ও পাগলের মতো আপন মনে বকিতেছে। সে ঘড়া নামাইয়া কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কাদের বাড়ি এসেছ, খোকা?

অপুর যত জারিজুরি তাহার মায়ের কাছে। বাহিরে সে বেজায় মুখচোরা।

প্রথমটা অপুর মাথায় আসিল যে টানিয়া দৌড় দেয়। পরে সংকুচিত সুরে বলিল-ওই ওদের বাড়ি–

বধূটি বলিল-বটুঠাকুরদের বাড়ি? বটুঠাকুরের গুরুমশায়ের ছেলে? ও!

বধূ সঙ্গে করিয়া তাহাকে নিজের বাড়িতে লইয়া গেল। তাহদের বাড়ি পৃথক-লক্ষ্মণ মহাজনের বাড়ি হইতে সামান্য দূরে, কিন্তু মধ্যে পুকুরটা পড়ে।

বধূর ব্যবহারে অপুর লাজুকতা কাটিয়া গেল। সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া ঘরের জিনিসপত্র কৌতুহলের সহিত চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ওঃ কত কি জিনিস!..তাহাদের বাড়িতে এ রকম জিনিস নাই। এরা খুব বড়লোক তো। কড়ির আলনা, রং-বেরং-এর ঝুলন্ত শিকা, পশমের পাখি, কাঁচের পুতুল, মাটির পুতুল, শোলার গাছ-আরও কত কি!-দু-একটা জিনিস সে ভয়ে ভয়ে হাতে তুলিয়া নাড়িয়া চড়িয়া দেখিল।

বধূ এতক্ষণ ভালো করিয়া ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া দেখে নাই-কাছের গোড়ায় দেখিয়া মনে হইল যে, এ এখনও ভারি ছেলেমানুষ, মুখের ভাব যেন পাঁচ বছরের ছেলের মতো কচি। এমন সুন্দর অবোধ চোখের ভাব সে আর কোনো ছেলের চোখে এ পর্যন্ত দেখে নাই-এমন রং, এমন গড়ন, এমন সুন্দর মুখ, এমন তুলি দিয়া আঁকা ডাগর ডাগর নিষ্পাপ চোখ-অচেনা ছেলেটির উপর বধূর বড় মমতা হইল।

অপু বসিয়া নানা গল্প করিল—বিশেষ করিয়া কল্যকার রেলপথের কথাটি। খানিকটা পরে বধূ মোহনভোগ তৈয়ারি করিয়া খাইতে দিল। একটা বাটিতে অনেকখানি মোহনভোগ, এত ঘি দেওয়া যে আঙুলে ঘিয়ে মাখামাখি হইয়া যায়। অপু একটুখানি

মুখে তুলিয়া খাইয়া অবাক হইয়া গেলএমন অপূর্ব জিনিস আব সে কখনও খায় নাই তো!–মোহনভোগে কিসমিস দেওয়া কেন? কই তাহার মায়ের তৈরি মোহনভোগে তো কিসমিস থাকে না? বাড়িতে সে মা'র কাছে আবদার ধরে — মা, আজ আমাকে মোহনভোগ করে দিতে হবে! তাহার মা হাসিমুখে বলে-আচ্ছা ওবেলা তোকে করে দেবো-পরে সে শুধু সুজি জলে সিদ্ধ করিয়া একটু গুড় মিশাইয়া পুলটিসের মতো একটা দ্রব্য তৈয়ারি করিয়া কঁসার সরপুরিয়া থালাতে আদর করিয়া ছেলেকে খাইতে দেয়। অপু তাহাই খুশির সহিত এতদিন খাইয়া আসিয়াছে, মোহনভোগ যে এরূপ হয় তাহা সে জনিত না। আজ কিন্তু তাহাব মনে হইল এ মোহনভোগে আর মাযের তৈয়ারি মোহনভোগে আকাশ-পাতাল তফাত!, সঙ্গে সঙ্গে মায়ের উপর করুণায় ও সহানুভূতিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। হয়তো তাহার মাও জানে না যে, এ রকমের মোহনভোগ হয়!—সে যেন আবছায়া ভাবে বুঝিল, তাহার মা গরিব, তাহরা গরিবতাই তাহাদেব বাড়ি ভালো খাওয়া-দাওয়া হয় না।

একদিন পাড়ার এক ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর বাড়ি অপুর নিমন্ত্রণ হইল। দুপুর বেলা সে-বাড়ির একটি মেয়ে আসিয়া অপুকে ডাকিয়া লইয়া গেল। ওদের রান্নাঘরের দাওয়ায় যত্ন করিয়া পিড়ি পাতিয়া জল ছিটাইয়া অপুকে খাবার জায়গা করিয়া দিল। যে মেয়েটি অপুকে ডাকিতে আসিয়াছিল, নাম তার অমলা, বেশ টকটকে ফরসা রং, বড় বড় চোখ, বেশ মুখখানি, বয়স তার দিদির মতো। আমলার মা কাছে বসিয়া তাহাকে খাওয়াইলেন, নিজের হাতের তৈয়ারি চন্দ্রপুলি পাতে দিলেন। খাওয়ার পরে আমলা তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ি দিয়া গেল। সেদিন বৈকালে খেলিতে খেলিতে অপুর পায়ের আঙুল হঠাৎ বাগানের বেড়ার দুই বাঁশের ফাঁকে পড়িয়া আটকাইয়া গেল। টাট্কা-চেরা নতুন বাঁশের বেড়া, আঙুল কাটিয়া রক্তারক্তি হইল, অমলা ছুটিয়া আসিয়া পা-খানা বাঁশের ফাঁক হইতে বাহির না করিলে গোটা আঙুলটাই কাটা পড়িত। সে চলিতে পাবিতেছিল না, আমলা তাহাকে কোলে করিয়া গোলার পাশ হইতে পাথরকুচির পাতা তুলিয়া বাটিয়া আঙুলে বাঁধিয়া দিল। পাছে বাবার বকুনি খাইতে হয়, এই ভয়ে অপু একথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিল না।

সে রাত্রে শূইয়া অপু শুধু অমলারই স্বপ্ন দেখিল। সে অমলার কোলে বেড়াইতেছে, আমলার কাছে বসিয়া আছে, আমলার সঙ্গে খেলা করিতেছে, আমলা তাহার পায়ের আঙুলে পটি বাঁধিয়া দিতেছে, সে ও অমলা রেলরাস্তায় দুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে-অমলার হাসি ভরা চোখমুখ ঘুমের ঘোরে। সারারাত নিজের কাছে কাছে। ভোরে সে শুধু খুঁজতে লাগিল অমলা কখন আসে। আরও সব ছেলেমেয়েরা আসিল, খেলা আরম্ভ হইয়া গেল, ক্রমে বেশ বেলা হইল-কিন্তু অমলার দেখা নাই। বাড়ির ভিতর হইতে বধূ খাবার খাইবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইল-রোজ সকালে বিকালে বধূ নিজের হাতে খাবার তৈয়ারি করিয়া তাহাকে খাওয়াইত-খাওয়া শেষ করিয়া আসিবার সময় সে

বধূকে জিজ্ঞাসা করিল-সকালে কি অমলাদিদি এসেছিল? না, সে আসে নাই। ক্রমে আরও বেলা হওয়াতে খেলা ভাঙিয়া গেল। তাহার বাবা তাহাকে স্নান করিবার জন্য ডাকিল। তবুও কোথায় অমলা? অভিমানে তাহার মন ছাপাইয়া উঠিল, বেশ, নাই বা আসিল? আমলার সহিত তাহার জন্মের তো আড়ি—আর যদি সে কখনও তাহার সহিত কথা কয়! বৈকালেও খেলা আরম্ভ হইল, আর সকলেই আসিল-অমলা নাই। পাঁচ ছয়টি ছেলেমেয়ে খেলিতে আসিলেও অপুর মনে হইল, কাহার সহিত সে খেলিবে? কেহই উপযুক্ত খেলার সাথী বলিয়া মনে হইল না। উৎসাহহীন ভাবে সে খানিকক্ষণ খেলা করিল, তবুও আমলার দেখা নাই।

পরদিন সকালে আমলা আসিল। অপু কোনো কথা বলিল না। অমলা যেখানে বসে, সে তাহার ত্রিসীমানায় ঘেষে না, অথচ মাঝে মাঝে আড়াচোখে চাহিয়া দেখে, সে যে রাগ করিয়া এরূপ করিতেছে, আমলা তাহা বুঝিয়াছে কিনা। আমলা সত্যই প্রথমটা বুঝিতে পারে নাই, পরে যখন সে বুঝিল যে, কিছু একটা হইয়াছে নিশ্চয়, তখন সে কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল–কি খোকা, কথা বলচো না কেন?... কি হয়েচে?

অপু অতশত বোঝে না, সে অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল-কি হয়েচে বইকি! তা কিছু কি আর হয়েচে? কাল আসিনি কেন?

অমলা অবাক হইয়া বলিল-আসিনি, তাই কি?–সেইজন্যে রাগ করেচ?

অপু ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল, ঠিক তাই। অমলা খিলখিল করিয়া হাসিয়া অপুকে হাত ধরিয়া লইয়া চলিল বাড়ির ভিতর। সেখানে বধূ সব শুনিয়া প্রথমটা হাসিয়া খুন হইল, পাবে মুখে হাসি টিপিয়া বলিল-তা হলে অমলা, তোমার আর এখন বাড়ি যাওয়ার জো নেই তো দেখচি-কি আর করবে, খোকা যখন তোমাকে ছাড়তে পারে না, তখন এখানেই থেকে যাও।–আর না হয়–

বধূর কথার ভঙ্গিতে অমলা কি জানি কি একটা ঠাওরাইয়া লজ্জিত প্রতিবাদের সুরে বলিলআচ্ছা যাও বৌদি-ও-রকম করলে কিন্তু কক্ষনো আর তোমাদের বাড়ি–

খানিকক্ষণ পরে অপু অমলার সঙ্গে তাঁহাদের বাড়ি গেল। আমলা তাহাদের আলমারি খুলিয়া কাঁচের। বড় মেম-পুতুল, মোমের পাখি, গাছ, আরও কত-কি দেখাইল। কালীগঞ্জের স্নানযাত্রার মেলা হইতে সে-সব নাকি কেনা, অপু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল। নতুন নতুন খেলার জিনিস—একটা রবারের বাঁদর, সেটা তুমি যেদিকে যাও, তোমার দিকে চাহিয়া চোখ পিটুপিট্ করিবে—একটা কিসের পুতুল, সেটার পেট টিপিলে দুহাতে মৃগীরোগীব মতো হঠাৎ হাত পা ছুড়িয়া খঞ্জনী বাজাইতে থাকে-সকলের চেয়ে আশ্চর্যের জিনিস হইতেছে একটা টিনের ঘোড়া, রানুদির কোকা

তাহাদের বাড়ির দালানের ঘড়িতে যেমন দম দেয়, ওইরকম দম দিয়া ছাড়িয়া দিলে সেটা খড়খড় করিয়া মেঝের উপর চলিতে থাকে-অনেক দূর যায়—ঠিক যেন একেবারে সত্যিকারের ঘোড়া। সেইটা দেখিয়া অপু অবাক হইয়া গেল। হাতে তুলিয়া বিস্ময়ের সহিত উলটাইয়া-পালটাইয়া দেখিয়া আমলার দিকে চাহিয়া বলিল-এ কি রকম ঘোড়া, বেশ তো! এ কোথা থেকে কেনা, এর দাম কত?

তাহার পর আমলা তাহাকে একটা সিঁদুরের কৌটা খুলিয়া দেখাইল-সেটার মধ্যে রাঙা রংএর একখানা ছোট রাংতার মতো কি। অপু বলিল-ওটা কি? রাংতা?

অমলা হাসিয়া বলিল-রাংতা হবে কেন?–সোনার পাত দেখনি অপু?

অপু সোনার পাত দেখে নাই। সোনার রং কি অত রাঙা? সোনার পাতখানা নাড়িয়া চড়িয়া ভালো করিয়া দেখিতে লাগিল। অমলার সহিত বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে সে ভাবিল—আহ্বা, দিদিটার ও-সব খেলনা কিছুই নেই-মরে কেবল শূকনো নাটাফল আর রীড়ার বিচি কুড়িয়ে, আর শুধু পরের পুতুল চুরি করে মার খায়!..তাহার দিদির বয়সি অন্য কোনো মেয়ের খেলনার ঐশ্বৰ্য কৃত বেশি, তাহা সে এ পর্যন্ত কোনো দিন দেখে নাই, আজ তুলনা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়া দিদির প্রতি অত্যন্ত করুণায় তাহার মনটা যেন গলিয়া গেল। তাহার পয়সা থাকিলে সে দিদিকে একটা কলের ঘোড়া কিনিয়া দিত-আর একটা রবারের বাঁেদর…তুমি যেদিকে যাও, তোমার দিকে চাহিয়া সেটা চোখ পিট্‌পিট্‌ করে…

বধূর কাছে একজোড়া পুরানো তাস ছিল, ঠিক একজোড়া বলা চলে না, সেটা নানা জোড়া তাসের পরিত্যক্ত কাগজগুলি এক জায়গায় জড়ো করা আছে মাত্র-অপু সেগুলি লইয়া মধ্যে মধ্যে নাড়ে চাড়ে। রানুদির বাড়িতে মাঝে মাঝে দুপুরবেলা তাসের আডিডা বাসিত, সে বসিয়া বসিয়া খেলা দেখিত। টেক্কা, গোলাম, সাহেব, বিবি-কাগজ ধরা লইয়া মারামারি হয়।–বেশী খেলা! সে তাস খেলিতে জানে না, তাহার মা দিদি কেহই জানে না। এক-এক দিন তাহার মা তাস খেলিতে যায়, তাহার মাকে লইয়া কেহ বসিতে চায় না, সকলে বলে, ও কিছু খেলা জানে না; এক এক দিন তাহার মা তাস খেলিতে বসে, এমন ভাব দেখায় যেন সে খুব পাকা খেলোয়াড়-খানিকক্ষণ পরেই কিন্তু ধরা পড়ে। কেউ বলে, ও বৌ, একি? এখানে টেক্কা মেরে বসলে যে! দেখলে না ও-হাতে রংয়ের গোলাম কাঁটুলে?–তোমার চোখের সামনে যে? তাহার মা তাড়াতাড়ি অজ্ঞতা ঢাকিতে যায়, হাসিয়া বলে, তাই তো! বড় তো ভুল হয়ে গেছে, ও ঠাকুরঝি, মোটেই তো মনে নেই। পরে সে আবার খেলিতে থাকে, মুখ টিপিয়া হাসে, এর ওরদিকে চায়, এমন ভাবটা দেখায় যে তাহার কাছে সকলের হাতের তাসের খবরই আছে, এবার একটা কিছু না করিয়া সে ছাড়িবে না-কিন্তু খানিকটা পরে একজন অবাক হইয়া বলিয়া উঠে-

একি বৌমা, দেখি? ওমা আমার কি হবে! তোমার হাতে যে, এমন বিন্তি ছিল, দেখাওনি?–তাহার মা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বিজ্ঞের ভাব করিয়া বলে,–আছে, আছে, ওর মধ্যে একটা কথা আছে! ইচ্ছে করেই দেখাই নি। সে আসলে বিন্তি কিসে হয় সব জানে না।–তাহার খেলুড়ে রাগ করিয়া বলে-ওর মধ্যে আবার কথাটা কি শুনি? এমন হাতটা নষ্ট কল্লে? দাও তুমি তাস সেজবৌকে, দাও, তোমার আর খেলতে হবে না-ঢ়ের হয়েছে। তাহার মা অপমান ঢাকিতে গিয়া আবার হাসে-যেন কিছুই হয় নাই, সবই ঠাট্টা, উহারা ঠাট্টা করিয়া বলিতেছে, সেও সেই ভাবেই লইতেছে।...

সে যদি একজোড়া তাস পায় তবে, সে, মা ও দিদি খেলে। খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলা তাদের বাড়ির বনের ধারের দিকের সেই জানালোটা.যেটার কবাটগুলোর মধ্যে কি পোকায় কাটিয়া সরিষার মতো গুঁড়া করিয়া দিয়াছে...নাড়া দিলে ঝুরঝুর করিয়া ঝরিয়া পড়ে, পুরানো কাঠের গুঁড়ার গন্ধ বার হয়—জানালার ধারের বন থেকে দুপুরের হাওয়ায় গন্ধভেদালি লতার কটু গন্ধ আসে, রোয়াকের কালমেঘের গাছের জঙ্গলে দিদির পরিচিত কাঁচপোকাটা একবার ওড়ে, আবার বসে, আবার ওড়ে আবার বসে-নির্জন দুপুরে তারা তিনজনে সেই জানালাটির ধারে মাদুর পাতিয়া বসিয়া আপন মনে তাস খেলিবে। কিসে কিসে বিন্তি হয় তাদের নাই-বা থাকিল জানা, তাদের খেলায় বিন্তি না দেখাইতে পারিলেও চলিবে- সেজন্য কেহ কহাকেও উঠাইয়া দিবে না, কোন অপমানের কথা বলিবে না, কোন হাসি-বিদ্যুপ করিবে না, যে যেরূপ পারে সেইরূপই খেলিবে। খেলা লইয়া কথা-নাই বা হইল বিন্তি দেখানো!

সন্ধার পরে বধূর ঘরে অপুর নিমন্ত্রণ ছিল। খাইতে বসিয়া খাবার জিনিসপত্র ও আয়োজনের ঘটা দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। ছোট একখানা ফুলকাটা রেকবিতে আলাদা করিয়া নুন ও নেবু কেন? নুন নেবু তো মা পাতেই দেয়। প্রত্যেক তরকারির জন্যে খাবার আলাদা আলাদা বাটি!— তরকারিই বা কত! অত বড় গলদা চিংড়ির মাথাটা কি তাহার একার জন্য?

লুচি! লুচি। তাহার ও তাহার দিদির স্বপ্নকামনার পারে এক রূপকথার দেশের নীল-বেলা আবছায়া দেখা যায়.কত রাতে, দিনে, ওলের ডাটোচচ্চড়ি ও লাউ-হেঁচকি দিয়া ভাত খাইতে খাইতে, কত জল-খাবার-খাওয়া-শূন্য সকালে বিকালে, অন্যমনস্ক মন হঠাৎ লুব্ধ উদাস গতিতে ছুটিয়া চলে সেখানে-যেখানে গরম রোদে দুপুরবেলা তাহদের পাড়ার পাকা রাঁধুনী বীবু রায় গামছা কঁধে ঘুরিয়া বেড়ায়, সদ্য তৈয়ারি বড় উনুনের উপর বড় লোহার কড়াই-এ ঘি চাপানো থাকে, লুচিভাজার অপূর্ব সুধা-বুচি-ঘ্রাণ আসে, কত ছেলেমেয়ে ভালো কাপড়-জামা পরিয়া যাতায়াত করে, গাঙ্গুলি বাড়ির বড় নাটমন্দির ও জলপাই-তলা বিছাইয়া গ্রীষ্মের দিনে শতরঞ্চ পাতা হয়, একদিন মাত্র বছরে সে দেশের ঠিকানা খুঁজিয়া মেলে-সেই চৈত্র বৈশাখ মাসে রামনবমী দোলের

দিনটাতাহাদের সেদিন নিমন্ত্রণ থাকে ওপাড়ার গাঙ্গুলি বাড়ি। কিন্তু আজ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সে সুদিনের উদয় হইল কি করিয়া! খাইতে বসিয়া বার বার তাহর মনে হইতেছিল, আহা, তাহার দিদি। এ রকম খাইতে পায় নাই কখনও!

পরদিন সকালে আবার খেলা আরম্ভ হইল। অমলা আসিতেই অপু ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিল-আমি আর অমলাদি একদিকে, আর তোমরা সব একদিকে–

খানিকটা খেলা হইবার পর অপুর মনে হইল অমলা তাহাকে দলে পাওয়ার অপেক্ষা বিশ্বকে দলে পাইতে বেশি ইচ্ছক। ইহার প্রকৃত কারণ অপু জানিত না-অপু একেবারে কাঁচা খেলুড়ে, তাহাকে দলে লওয়ার মানেই পরাজয়-বিশ্ব ডানপিটে ছেলে, তাহাকে দৌড়িয়া ধরা কি খেলায় হারানো সোজা নয়। একবার অমলা স্পষ্টই বিরক্তি প্রকাশ করিল। অপু প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল যাহাতে সে জেতে, যাহাতে আমলা সন্তুষ্ট হয়-কিন্তু বিস্তর চেষ্টা সত্ত্বেও সে আবার হারিয়া গেল।

সে-বার দল গঠন করিবার সময় অমলা ঝুঁকিল বিশুর দিকে।

অপুর চোখে জল ভরিয়া আসিল। খেলা তাহার কাছে হঠাৎ বড় বিস্বাদ মনে হইল-অমলা বিশুর দিকে ফিরিয়া সব কথা বলিতেছে, হাসিখুশি সবই তাহার সঙ্গে। খানিকটা পরে বিশু কি কাজে বাড়ি যাইতে চাহিলে অমলা তাহাকে বার বার বলিল যে, সে যেন আবার আসে। অপুর মনে অত্যন্ত ঈর্ষ হইল, সারা সকালটা একেবারে ফাঁকা হইয়া গেল! পরে সে মনে মনে ভাবিল-বিশ্ণু খেলা ছেড়ে চলে যাচ্ছে-গেলে খেলার খেলুড়ে কমে যাবে, তাই অমলাদি ওইরকম বলচে, আমি গেলে আমাকেও বলবে, ওর চেয়েও বেশি বলবে। হঠাৎ সে চলিয়া যাইবার ভান করিয়া বলিল-বেলা হয়ে যাচ্ছে, আমি যাই, নাইবো।

অমলা কোনো কথা বলিল না, কেবল কামারদের ছেলে নাড়ুগোপাল বলিল-আবার ওবেলা এসো ভাই!

অপু খানিক দূর গিয়া একবার পিছনে চাহিল।–তাহাকে বাদ দিয়া কাহারও কোনো ক্ষতি হয় নাই, পুরাদমে খেলা চলিতেছে, অমলা মহা উৎসাহে খুঁটির কাছে বুড়ি হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহার। দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না।

অপু আহত হইয়া অভিমানে বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল, কাহারও সঙ্গে কোনো কথা বলিল না। ভারি তো অমলাদি। না চাহিল তাহাকে-তাতেই বা কি?..

দুই দিন পরে হরিহর ছেলে লইয়া বাড়ি আসিল।

এই মোটে কয়দিন, এরই মধ্যে সর্বজয়া ছেলেকে না দেখিয়া আর থাকিতে পারিতেছিল না।

দুর্গার খেলা কয়দিন হইতে ভালোরকম জমে নাই, অপুর বিদেশ-যাত্রার দিনকতক আগে দেশী কুমড়ার শূকনো খোলার নীেকা লইয়া ঝগড়া হওয়াতে দুজনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইয়া গিয়াছিলএখন আরও অনেক কুমড়ার খোলা জমিয়াছে, দুর্গা কিন্তু আর সেগুলি জলে ভাসাঁইতে ঝায় নাকেন মিছিমিছি এ নিয়ে ঝগড়া করে তার কান ম' লে দিলাম? আসুক সে ফিরে, আর কক্ষনো তাব সঙ্গে ঝগড়া নয়, সব খোলা সেই নিয়ে নিক।

বাড়ি আসিয়া অপু দিন পনেরো ধরিয়া নিজের অদ্‌ভুত ভ্রমণকাহিনী বলিয়া বেড়াইক্ষে লাগিল। কত আশ্চর্য জিনিস সে দেখিয়াছে এই কয়দিনে! রেলের রাস্তা, যেখান দিয়া সত্যিকারের রেলগাড়ি যায়! মাটির আতা, পেঁপে, শস্য-অবিকল যেন সত্যিকার ফল। সেই পুতুলটা, যেটার পেট টিপিলে। মৃগীরোগীর মতো হাত-পা ছুড়িয়া হঠাৎ খঞ্জনী বাজাইতে শুরু করে! অমলাদি। কতদূর যে সে গিয়াছিল, কত পদ্মফুলে ভরা বিল, কত অচেনা নতুন গা পার হইয়া কত মাঠের উপরকার নির্জন পথ বাহিয়া, সেই যে কোন গাঁয়ে পথের ধারের কামার-দোকানে বাবা তাহাকে জল খাওয়াইতে লইয়া গেলে, তাহারা তাহাকে বাড়ির মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গিয়া যত্ন করিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসাইয়া দুধ, চিড়ে, বাতাসা খাইতে দিয়াছিল! কোনটা ফেলিয়া সে কোনটার গল্প করে!

রেলরাস্তার গল্প শুনিয়া তাহার দিদি মুগ্ধ হইয়া যায়, বার বার জিজ্ঞাসা করে-কত বড় নোয়াগুনো দেখলি অপু? তার টাঙানো বুঝি? খুব লম্বা? রেলগাড়ি দেখতে পেলি? গেল?

না-রেলগাড়ি অপু দেখে নাই। ওইটাই কেবল বাদ পড়িয়াছে—সে শুধু বাবার দোষে। মোটে ঘণ্টা চার-পাঁচ রেলরাস্তার ধারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেই রেলগাড়ি দেখা যাইত-কিন্তু বাবাকে সে কিছুতেই বুঝাইয়া উঠিতে পারে নাই।

বেলা হইয়া যাওয়াতে ব্যস্ত অবস্থায় সর্বজযা তাড়াতাড়ি অন্যমনস্কভাবে সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়া উঠানে পা দিতেই কি যেন একটা সরু দড়ির মতো বুকে আটকাইল ও সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা পটাং করিয়া ছিঁড়িয়া যাইবার শব্দ হইল এবং দুদিক হইতে

দুটা কি, উঠানে ঢিলা হইয়া পড়িয়া গেল। সমস্ত কার্যটি চক্ষের নিমেষে হইয়া গেল, কিছু ভালো করিয়া দেখিবার কি বুঝিবার পূর্বেই।

অল্পখানিক পরেই অপু বাড়ি আসিল। দরজা পার হইয়া উঠানে পা দিতেই সে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া গেল—নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না-এ কি! বা রে, আমার টেলিগিরাপের তার ছিঁড়লে কে?

ক্ষতির আকস্মিকতায্য ও বিপুলতায় প্রথমটা সে কিছু ঠাহর করিতে পারিল না। পরে একটু সামলাইয়া লইয়া চাহিয়া দেখিল উঠানের মাটিতে ভিজা পায্যের দাগ এখনও মিলায় নাই। তাহাব মনের ভিতর হইতে কে ডাকিয়া বলিল—ম ছাড়া আর কেউ নয়। ককখনো আর কেউ নয়, ঠিক মা! বাড়ি ঢুকিযা সে দেখিল মা বসিয়া বসিযা বেশ নিশ্চিন্ত মনে কাঁঠালবীচি ধুইতেছে। সে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল এবং যাত্রা দলের অভিমনুর মতো ভঙ্গিতে সামনেব দিকে ঝুঁকিয়া বাঁশির সপ্তমের মতো রিনারিনে তীব্র মিষ্টসুবে কহিল-আচ্ছা মা, আমি কষ্ট করে ছোটাগুলো বুঝি বন বাগান ঘেঁটে নিয়ে আসি নি?

সর্বজয়া পিছনে চাহিয়া বিস্মিতভাবে বলিল–কি নিয়ে এসেচিস? কি হয়েচে—

আমার বুঝি কষ্ট হয় না? কীটায় আমার হাতপা ছড়ে যায় নি বুঝি?

–কি বলে পাগলের মতো? হযেচে কি?

—কি হয়েচে! আমি এত কষ্ট করে টেলিগিরাপের তার টাঙালাম আর ছিড়ে দেওয়া হয়েচে না?

—তুমি যত উদঘুট্টি কাণ্ড ছাড়া তো এক দণ্ড থাকো না বাপু!-পথের মাঝখানে কি টাঙানো রয়েচে-কি জানি টেলিগিরিপ কি কি-গিরাপ, আসচি তাড়াতাড়ি ছিড়ে গেল।–তা এখন কি করবো বলো–

পরে সে পুনরায় নিজ কাজে মন দিল।

উঃ! কি ভীষণ হৃদয়হীনতা! আগে আগে সে ভাবিত বটে যে, তাহার মা তাহাকে ভালোবাসে। অবশ্য যদিও তাহার সে ভ্রান্ত ধারণা অনেকদিন ঘুচিয়া গিয়াছে—তবুও মাকে এতটা নিষ্ঠুর পাষাণীরূপে। কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। কাল সারাদিন কোথায় নীলমণি জেঠার ভিটা, কোথায় পালিতদের বড় আমবাগান, কোথায় প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের বাঁশবন-ভয়ানক ভয়ানক জঙ্গলে একা ঘুরিয়া বহু কষ্ট উঁচু ডাল হইতে

দোলানো গুলঞ্চলত কত কষ্টে জোগাড় করিয়া সে আনিল, এখুনি রোল-রেল খেলা হইবে, সব ঠিকঠাক, আর কি না…

হঠাৎ সে মাকে একটা খুব কড়া, খুব রূঢ়, খুব একটা প্রাণ-বিধানো কথা বলিতে চাহিল—এবং খানিকটা দাঁড়াইয়া বোধ হয় অন্য কিছু ভাবিয়া না পাইয়া আগের চেয়েও তীব্র নিখাদে বলিল-আমি আজ ভাত খাবো না যাও-কখখনো খাবো না–

তাহার মা বলিল-মা খাবি না খাবি যা-ভাত খেয়ে একেবারে রাজা করে দেবেন। কিনা? এদিকে তো রান্না নামাতে তার সয় না-না খাবি যা, দেখবো ক্ষিদে পেলে কে খেতে দ্যায়?

ব্যস! চক্ষের পলকে-সব আছে, আমি আছি তুমি আছ–সেই তাহার মা কাঁটালবীচি ধুইতেছে-কিন্তু অপু কোথায়? সে যেন কপূরের মতো উবিয়া গেল! কেবল ঠিক সেই সময়ে দুর্গা বাড়ি ঢুকিতে দরজার কাছে তাহাকে পাশ কাটাইয়া ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া বিস্মিত সুরে ডাকিয়া বলিল-ও অপু, কোথায় যাচ্ছিস আমন করে, কি হয়েচে, ও অপু শোন–

তাহার মা বলিল-জানিনে আমি, যত সব অনাছিষ্টি কাণ্ড বাপু তোমাদের, হাড় মাস কালি হয়ে গেল।–কি এক পথের মাঝখানে টাঙিয়ে রেখেচে, আসচি, ছিড়ে গেল-তা এখন কি হবে? আমি কি ইচ্ছে করে ছিাঁড়চি? তাই ছেলের রাগ-আমি ভাত খাবো না-না খাস যা, ভাত খেয়ে সব একেবারে স্বগগে ঘণ্টা দেবে কিনা তোমরা?

মাতাপুত্রের এরূপ অভিমানের পালায় দুর্গাকেই মধ্যস্থ হইতে হয়-সে। অনেক ডাকাডাকির পরে বেলা দুইটার সময় ভাইকে খুঁজিয়া বাহির করিল। সে শুল্কমুখে উদাসীনয়নে ও-পাড়ার পথে রায়েদের বাগানে পড়ন্ত আমগাছের গুড়ির উপরবসিয়া ছিল।

বৈকালে যদি কেহ আপুদের বাড়ি আসিয়া তাহাকে দেখিত তবে সে কখনই মনে করিতে পারিত না যে, এ সেই অপু-যে আজ সকালে মায়ের উপর অভিমান করিয়া দেশত্যাগী হইয়াছিল। উঠানের এ-প্রস্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত তার টাঙানো হইয়া গিয়াছে। অপু বিস্ময়ের সহিত চাহিয। চাহিয়া দেখিতেছিল, কিছুই বাকি নাই, ঠিক যেন একবারে সত্যিকার রেলরাস্তার তার।

সে সতুদের বাড়ি গিয়া বলিল-সতুদা, আমি টেলিগিরাপের তার টাঙিয়ে রেখেচি আমাদের বাড়িব উঠানে, চল রেল-রেল খেলা করি–আসবে?

–তার কে টাঙিয়ে দিল রে?

–আমি নিজে টাঙালাম। দিদি ছোটা এনে দিয়েছিল—

সতু বলিল-তুই খেলগে যা, আমি এখন যেতে পাববো না—

অপু মনে মনে বুঝিল, বড় ছেলেদের ড্রাকিযা দল বাঁধিয খেলার জোগাড় করা তাহব কর্ম নয়। কে তাহার কথা শুনিবে? তবুও আর একবার সে সত্যুর কাছে গেল। নিরাশ মুখে রোয়াকের কোণটা ধরিয়া নিরুৎসাহভাবে বলিল-চল না। সত্যুদ, যাবে? তুমি আমি আর দিদি খেলবো এখন? পরে সে প্রলোভনজনক ভাবে বলিল-আমি টিকিটের জন্যে এতগুলো বাতাবি নেবুব পাতা তুলে এনে রেখেচি। সে হাত ফাক করিয়া পরিমাণ দেখাইল।-যাবে?

সতু আসিতে চাহিল না। অপু বাহিরে বড় মুখ-চোরা, সে আর কিছু না বলিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেল। দুঃখে তাব চোখে প্রায় জল আসিতেছিল-এত করিয়া বলিতেও সতুদা শুনিল না!

পরদিন সকালে সে ও তাহার দিদি দুজনে মিলিয়াইট দিয়া একটা বড় দোকানঘর বাঁধিয়া জিনিসপত্রের জোগাড়ে বাহির হইল। দুর্গা বনজঙ্গলে উৎপন্ন দ্রব্যের সন্ধান বেশি রাখে-দুজনে মিলিয়া নোনাপাতার পান, মোট আলু, ফলের আলু, রাধালতা ফুলের মাছ, তেলাকুচির পটল, চিচ্চিড়ের বরবটি, মাটির ঢেলার সৈন্ধব লবণ-আরও কত কি সংগ্রহ করিয়া আসিয়া দোকান সাজাইতে বড় বেলা করিয়া ফেলিল। অপু বলিল-চিনি কিসের করবি রে দিদি?

দুর্গা বলিল-বাঁশতলার পথে সেই টিবিটায় ভালো বালি আছে-মা চাল-ভাজা ভাজাবার জন্যে আনে! সেই বালি চল আনি গো-সাদা চক চক করচে-ঠিক একেবারে চিনি–

বাঁশবনে চিনি খুঁজিতে খুঁজতে তাহারা পথের ধারের বনের মধ্যে ঢুকিল। খুব উঁচু একটা বন, চটকা গাছের আগাড়ালে একটা বড় লতার ঘন সবুজ আড়ালে, টুকটুকে রাঙা, বড় বড় সুগোল কি ফল দুলিতেছে। অপু ও দুর্গা দুজনেই দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। অনেক চেষ্টায় গোটা কয়েক ফল নিচের দিকে লতার খানিকটা অংশ ছিঁড়িয়া তলায় পড়িতেই মহা আনন্দে দুজনে একসঙ্গে ছুটিয়া গিয়া সেগুলিকে মাটি হইতে তুলিয়া লইল।

পাকা ফল মোটে তিনটি। প্রধানত বিপণি-সজ্জার উদ্দেশ্যেই তাহা দোকানে এরূপ ভাবে রক্ষিত হইল যে, খরিদার আসিলে প্রথমেই যেন নজরে পড়ে। পুরাদমে

বেচাকেনা আরম্ভ হইয়া গেল। দুর্গা নিজেই পান কিনিয়া দোকানের পান প্রায় ফুরাইয়া ফেলিল। খেলা খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে এমন সময় সদর দরজা দিয়া সতুকে ঢুকিতে দেখিয়া অপু মহা আনন্দে তাহাকে আগাইয়া আনিতে দৌড়িয়া গেল—ও সত্যুদা, দ্যাখো না কি রকম দোকান হয়েচে, কেমন ফল দ্যাখো। আমি আর দিদি পেড়ে আনলাম-কি ফল বলো দিকি? জানো?

সতু বলিল-ও তো মাকাল ফল-আমাদের বাগানে ক-ত ছিল!

সতু আসিতে অপু যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। সত্যুদা তাহাদের বাড়িতে তো বড় একটা আসে না-তা ছাড়া সত্যুদা বড় ছেলেদের দলের চাই। সে আসাতে খেলার ছেলেমানুষিটুকু যেন ঘুচিয়া গেল।|

অনেকক্ষণ পুরা মরসুমে খেলা চলাবার পর দুর্গা বলিল-ভাই আমাকে দুমণ চাল দাও, খুব সবু, কাল আমার পুতুলের বিয়ের পাকা দেখা, অনেক লোক খাবে—-

সতু বলিল-আমাদের বুঝি নেমন্তন্ন, না?

দুর্গা মাথা দুলাইয়া বলিল-না বই কি! তোমরা তো হলে কনে-যাত্রী-কাল সকালে এসে নকুতো করে নিয়ে যাবো—সতুদা, রানুকে বলবে আজ রাত্তিরে যেন একটু চন্দন বেটে রাখে। কাল সকালে নিয়ে আসব–

দুর্গার কথা ভালো কবিয়া শেষ হয় নাই এমন সময় সন্তু দোকানে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত পণ্যেৰ মধ্য হইতে কি-একটা তুলিয়া লইয়া হঠাৎ দৌড় দিয়া দরজার দিকে ছুটিল-সঙ্গে সঙ্গে অপুও, ওরে দিদি রে-নিয়ে গেল রে—বলিয়া তাহার রিনারিনে তীব্র মিষ্ট গলায় চিৎকার করিতে করিতে তাহার পিছনে পিছনে ছুটিল।

বিস্মিত দুর্গা ভালো করিয়া ব্যাপাবটা কি বুঝিবার আগেই সন্তু ও অপু দৌড়াইয়া দরজার বাহির হইয়া চলিয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে খেলাঘরের দিকে চোখ পড়িতেই দুর্গা দেখিল, সেই পাকা মাকাল ফল তিনটির একটিও নাই!..

দুর্গা একছুটে দরজার কাছে আসিয়া দেখিল, সন্তু গাবতলার পথে আগে আগে ও অপু তাহা হইতে অল্প নিকটে পিছু পিছু ছুটিতেছে। সত্যুর বয়স অপুর চেয়ে তিন চার বৎসরের বেশি, তাহা ছাড়া সে অপুর মতো ওরকম ছিপছিপে মেয়েলি গড়নের ছেলে নয়।–বেশ জোরালো হাত-পা- ওয়ালা ও শক্ত-তাহার সহিত ছুটিয়া অপুর পারিবার কথা নহে-তবুও যে সে ধরি-ধরি করিয়া তুলিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ এই যে সন্তু ছুটিতেছে। পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া এবং অপু ছুটিতেছে প্রাণের দায়ে।

হঠাৎ দুর্গা দেখিল যে সন্তু ছুটিতে ছুটিতে পথে একবারটি যেন নিচু হইয়া পিছনে ফিরিয়া চাহিল—সঙ্গে সঙ্গে অপুও হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল-সন্তু ততক্ষণ ছুটিয়া দৃষ্টির বাহির হইয়া চালতেতলার পথে গিয়া পড়িয়াছে।

দুর্গা ততক্ষণে দৌড়িয়া গিয়া অপুর কাছে পৌঁছিল। অপু একদম চোখ বুজিয়া একটু সামনের দিকে নিচু হইয়া বুকিয়া দুই হাতে চোখ রাগড়াইতেছে-দুর্গা বলিল-কি হয়েছে রে অপু?

অপু ভালো করিয়া চোখ না চাহিয়াই যন্ত্রণার সুরে দু'হাত দিয়া চোখ রগড়াইতে রাগড়াইতে বলিল-সতুদা চোখে ধুলো ছুড়ে মেরেচে। দিদি-চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না রে—

দুর্গা তাড়াতাড়ি অপুর হাত নামাইয়া বলিল-সরসর দেখি-ওরকম করে চোখ রাগড়াস নে, দেখি?–

অপু তখনই দু'হাত আবার চোখে উঠাইয়া আকুল সুরে বলিল-উষ্ণু ও দিদি-চোখের মধ্যে কেমন হচ্ছে-আমার চোখ কানা হয়ে গিয়েচে দিদি–

–দেখি দেখি ওরকম করে চোখে হাত দিসনে-সর-পরে সে কাপড়ে ফু পাড়িয়া চোখে ভাপ দিতে লাগিল। কিছু পরে অপু একটু একটু চোখ মেলিয়া চাহিতে লাগিল-দুর্গা তাহার চোখের পাতা তুলিয়া অনেকবার ফু দিয়া বলিল-এখন বেশ দেখতে পাচ্ছিস?– আচ্ছা তুই বাড়ি যা..আমি ওদের বাড়ি গিয়ে ওর মাকে আর ঠাকমাকে সব বলে দিয়ে আসচি-রানুকেও বলবো-আচ্ছা দুষ্টু ছেলে তো-তুই যা আমি আসছি। এখখনি—

রানুদের খিড়কি দরজা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া দুর্গা কিন্তু আর যাইতে সাহস করিল না। সেজঠাকুবুনকে সে ভয় করে। খানিকক্ষণ খিড়কির কাছে দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিয়া সে বাড়ি ফিরিল। সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়া সে দেখিল অপু দরজার বাম ধারের কবাটখানি একটুখানি সামনে ঠেলিয়া দিয়া তাহারই আড়ালে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছে। সে ছিচর্কাদুনে ছেলে নয়, বড় কিছুতেই সে কখনও কঁদে না-রাগ করে, অভিমান করে বটে, কিন্তু কঁদে না। দুর্গা বুঝিল আজ তাহার অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে, অত সাধের ফলগুলি গেল...তাহা ছাড়া আবার চোখে ধূলা দিয়া এরূপ অপমান করিল! অপুর কান্না সে সহ্য করিতে পারে না।–তাহার বুকের মধ্যে কেমন যেন করে।

সে গিয়া ভাইয়ের হাত ধরিল-সান্ত্বনার সুরে বলিল-কাঁদিস নে অপু-আয় তোকে আমার সেই কড়িগুলো সব দিচ্চি-আয়-চোখে কি আর ব্যথা বাড়চে?...দেখি, কাপড়খানা বুঝি ছিড়ে ফেলেচিস?

খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলা অপু কোথাও বাহির না হইয়া ঘরে থাকে। অনেকদিনের জীর্ণ পুরাতন কোঠ-বাড়ির পুরাতন ঘর। জিনিসপত্র, কাঠের সেকালের সিন্দুক, কটা রং-এর সেকালের বেতের প্যাট্রা, কড়ির আলনা, জলচৌকিতে ঘর ভরানো। এমন সব বাক্স আছে যাহা অপু কখনও খুলিতে দেখে নাই, তাহাতে রক্ষিত এমন সব হ্যাঁড়ি-কলসি আছে, যাহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

সব-সুদ্ধ মিলিয়া ঘরটিতে পুরানো জিনিসের কেমন একটা পুরানো পুরানো গন্ধ বাহির হয়সেটা কিসের গন্ধ সে জানে না, কিন্তু সেটা যেন বহু অতীত কালের কথা মনে আনিয়া দেয়। সে অতীত দিনে অপু ছিল না, কিন্তু এই কড়ির আলনা ছিল, ওই ঠাকুরদাদার বেতের বাঁপিটা ছিল, ওই বড় কাঠের সিন্দূকটা ছিল, ওই যে সৌদালি গাছের মাথা বনের মধ্যে হইতে বাহির হইয়া আছে, ওই পোড়াজঙ্গলে-ভরা জায়গাটাতে কাহাদের বড় চণ্ডীমণ্ডপ ছিল, আরও কত নামের কত ছেলেমেয়ে একদিন এই ভিটাতে খেলিয়া বেড়াইত, কোথায় তারা ছায়া হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে, কতকাল আগে!

যখন এক ঘরে থাকে, মা ঘাটে যায়–তখন তাহার অত্যন্ত লোভ হয়। ওই বাক্সটা, বেতের ঝাঁপিটা খুলিয়া দিনের আলোয় বাহির করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে কি অদ্‌ভুত রহস্য উহাদের মধ্যে গুপ্ত আছে। ঘরের আড়ার সর্বোচ্চ তাকে কাঠের বড় বারকোশে যে তালপাতার পুথির স্তুপ ও খাতাপত্র আছে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছিল সেগুলি তাহার ঠাকুরদাদা রার্মচাঁদ তর্কালঙ্কারের—তাহার বড় ইচ্ছা ওইগুলি যদি হাতের নাগালে ধরা দেয়, তবে সে একার নিচে নামাইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে। এক-একদিন বনের ধারে জানালাটায় বসিয়া দুপুরবেলাসে সেই ছেড়া কাশীদাসের মহাভারতখানা লইয়া পড়ে, সে নিজেই খুব ভালো পড়িতে শিখিয়াছে, আগেকার মতো আর মুখে শুনিতে হয় না, নিজেই জলের মতো পড়িয়া যায় ও বুঝিতে পারে। পড়াশুনায় তাহার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ, তাহার বাবা মাঝে মাঝে তাহাকে গাঙ্গুলিবাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে বৃদ্ধদের মজলিশে লইয়া যায়, রামায়ণ কি পাঁচালী পড়িতে দিয়া বলে, পড়ে তো বাবা, এদের একবার শুনিয়ে দাও তো? বৃদ্ধেরা খুব তারিফ করেন, দীনু চাটুজ্যে বলেন–আর আমার নাতিটা, এই তোমার খোকারই বয়স হবে, দুখানা বর্ণপরিচয় ছিঁড়লে বাপু, শুনলে বিশ্বাস করবে না, এখনও ভালো করে অক্ষর চিনলে না-বাপের ধারা পেয়ে বসে আছে-ওই যে-কদিন আমি আছি রে বাপু, চক্ষু বুজলেই লাঙলের মুঠো ধরতে হবে। পুত্রগর্বে হরিহরের বুক ভরিয়া যায়। মনে মনে ভাবে-ও

কি তোমাদের হবে? কল্লে তো চিরকাল সুদের কারবার!-হলামই বা গরিব, হাজার হোক পণ্ডিত-বংশ তো বটে, বাবা মিথ্যেই তালপাত ভরিয়ে ফেলেন নি পুথি লিখে, বংশে একটা ধারা দিয়ে গিয়েছেন, সেটা যাবে কোথায়?

তাহাদের ঘরের জানলার কয়েক হাত দূরেই বাড়ির পাঁচিল এবং পাচিলের ওপাশ হইতেই পাঁচিলের গা ঘেষিয়া কি বিশাল আগাছার জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে। জানালায় বসিয়া শুধু চোখে পড়ে সবুজ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ভাট্রিশেওড়া গাছের মাথাগুলো, এগাছে ওগাছে দোদুল্যমান কত রকমের লতা, প্রাচীন বাঁশঝাড়ের শীর্ষ বয়সের ভারে যেখানে সৌদালি, বন-চালতা গাছের উপর কুকিয়া পড়িয়াছে, তাহার নিচের কালো মাটির বুকে খঞ্জন পাখির নোচ! বড় গাছপালার তলায় হলুদ, বনকচু, কটু ওলের ঘন সবুজ জঙ্গল ঠেলাঠেলি করিয়া সূর্যের আলোর দিকে মুখ ফিরাইতে প্রাণপণ করিতেছে, এই জীবনের যুদ্ধে যে গাছটা অপারগ হইয়া গর্বদৃপ্ত প্রতিবেশীর আওতায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে, তাহার পাতাগুলি বিবর্ণ, মৃত্যুপাণ্ডুর ডাটা গলিয়া আসিল,-মরণাহত দৃষ্টির সম্মুখে শেষশরতের বন-ভরা পরিপূর্ণ ঝলমলে রৌদ্র, পরগাছার ফুলের আকুল আর্দ্র সুগন্ধ মাখানো পৃথিবীটা তাহার সকল সৌন্দর্য রহস্য, বিপুলতা লইয়া ধীরে ধীরে আড়ালে মিলাইয়া চলিয়াছে।

তাহাদের বাড়ির ধার হইতে এ বনজঙ্গল একদিকে সেই কুঠির মাঠ, অপরদিকে নদীর ধার পর্যন্ত একটানা চলিয়াছে। অপুর কাছে। এ বন অফুরন্ত ঠেকে, সে দিদির সঙ্গে কতদূর এ বনের মধ্যে তো বেড়াইয়াছে, বনের শেষ দেখিতে পায় নাই—শুধু এইরকম তিক্তিরাজ গাছের তলা দিয়া পথ, মোটা মোটা গুলঞ্চলতা-দুলানো থোলো থোলো বানচালতার ফল চারিধারে। সুড়ি পথটা একটা আমবাগানে আসিয়া শেষ হয়, আবার এগাছের ও গাছের তলা দিয়া বন-কলমি, নাটা-কঁটা, ময়না-ঝোপের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে কোথায় কোন দিকে লইয়া গিয়া ফেলিতেছে, শুধুই বন-ধুধুলের লতা কোথায় সেই ত্রিশূন্যে দোলে, প্রাচীন শিরীষ গাছের শ্যাওলা-ধরা ডালের গায়ে পরগাছার ঝাড় নজরে আনে!

এই বন তার শ্যামলতার নবীন স্পর্শটুকু তার আর তার দিদির মনে বুলাইয়া দিয়াছিল। জন্মিয়া অবধি এই বন তাহদের সুপরিচিত, প্রতি পলের প্রতিমুহূর্তের নীরব আনন্দে তাঁহাদের পিপাসুহৃদয় কত বিচিত্র, কত অপূর্ব রসে ভরিয়া তোলে। বর্ষাসতেজ, ঘন সবুজ ঝোপের মাথায় নাটা-কঁটার সুগন্ধ ফুলের হলুদ রং-এর শিষ, আসন্ন সূর্যাস্তের ছায়ায় মোটা ময়না-কাটা ডালের আগায় কাঠবিড়ালীর লঘুগতি আসাযাওয়া, পত্রপুস্পফলের সে প্রাচুর্য সবাকার অপেক্ষা যখন ঘন বনের প্রান্তবতী, ঝোপঝাপের সঙ্গীহীন বঁকা ডালে বনের কোনো অজানা পাখি বসিয়া থাকে, তখন তাহার মনের বিচিত্র, অপূর্ব, গভীর আনন্দরসের বর্ণনা সে মুখে বলিয়া কাহাকেও বুঝাইতে পারে

না। সে যেন স্বপ্ন, যেন মায়া, চারিপাশ ঘিরিয়া পাখি গান গায়, কুর ঝুরি করিয়া ঝরিয়া ফুল পড়ে, সূর্যাস্তের আলো আরও ঘন ছায়াময় হয়।

এই বনের মধ্যে কোথায় একটা মজা পুরানো পুকুর আছে, তারই পাড়ে যে ভাঙা মন্দিরটা আছে, আজকাল যেমন পঞ্চানন্দ ঠাকুর গ্রামের দেবতা, কোনো সময় ওই মন্দিরের বিশালাক্ষী দেবী সেই রকম ছিলেন। তিনি ছিলেন গ্রামের মজুমদার বংশের প্রতিষ্ঠিত দেবতা, এক সময়ে কি বিষয়ে যে তিনি মন্দির পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, আর কখনও ফিরিবেন না। অনেক কালের কথা, বিশালাক্ষীর পূজা হইতে দেখিয়াছে এরূপ কোনো লোক আর জীবিত নাই, মন্দির ভাঙিয়া চুরিয়া গিয়াছে, মন্দিরের সম্মুখের পুকুর মজিয়া ডোবায় পরিণত হইয়াছে, চারিধার বনে ছাইয়া ফেলিয়াছে, মজুমদার বংশেও বাতি দিতে আর কেহ নাই।

কেবল-সেও অনেকদিন আগে-গ্রামের স্বরূপ চক্রবর্তী ভিন-গাঁ হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া ফিরিতেছিলেন-সন্ধ্যার সময় নদীর ঘাটে নামিয়া আসিতে পথের ধারে দেখিলেন একটি সুন্দরী ষোড়শী মেয়ে দাঁড়াইয়া। স্থানটি লোকালয় হইতে দূরে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, পথে কেহ কোথাও নাই, এ সময় নিরালা বনের ধারে একটি অল্পবয়সি সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়া স্বরূপ চক্রবর্তী দস্তুর মতো বিস্মিত হইলেন। কিন্তু তিনি কোনো কথা কহিবার পূর্বেই মেয়েটি ঈষৎ গর্বমিশ্রিত অথচ মিষ্টসুরে বলিল-আমি এ গ্রামের বিশালাক্ষী দেবী। গ্রামে অল্পদিনে ওলাওঠার মড়ক আরম্ভ হবেবলে দিয়ো চতুর্দশীর রাত্রে পঞ্চানন্দতলায় একশ আটটা কুমড়ো বলি দিয়ে যেন কালীপূজা করে। কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই স্তম্ভিত স্বরূপ চক্রবর্তীর চোখের সামনে মেয়েটি চারিধারে শীত-সন্ধ্যার কুয়াশায় ধীরে ধীরে যেন মিলাইয়া গেল। এই ঘটনার দিন কয়েক পরে সত্যই সেবার গ্রামে ভয়ানক মড়ক দেখা দিয়াছিল।

এ সব গল্প কতবার শুনিয়াছে। জানালার ধারে দাঁড়াইলেই বিশালাক্ষী ঠাকুরের কথা তাহার মনে ওঠে। দেবী বিশালাক্ষীকে একটিবার দেখিতে পাওয়া যায় না? হঠাৎ সে বনের পথে হয়তো গুলঞ্চের লতা পাড়িতেছে–সেই সময়–

খুব সুন্দর দেখিতে, রাঙাপাড় শাড়ি পরনে, হাতে গলায় মা-দুর্গার মতো হার বালা।

–তুমি কে?

-আমি অপু।

–তুমি বড় ভালো ছেলে, কি বর চাও?

সে বিছানায় গিয়া শোয়। এক একবার বিরবিরে হাওয়ায় কত কি লতাপাতার তিক্তমধুর গন্ধ ভাসিয়া আসে, ঠিক দুপুরবেলা, অনেক দূরের কোনো বড় গাছের মাথার উপর হইতে গাঙচিল টানিয়া টানিয়া ডাকে, যেন এই ছোট্ট গ্রামখানির অতীত ও বর্তমান সমস্ত ছোটখাটো দুঃখ শান্তি দ্বন্দ্বের উর্ধে, শরৎ-মধ্যাহ্নের রৌদ্রভরা, নীল নির্জন আকাশ-পথে, এক উদাস, গৃহবিবাগী পথিকদেবতার সুকণ্ঠের অবদান দূর হইতে দূরে মিলাইয়া চলিয়াছে।

কখন সে ঘুমাইয়া পড়ে বুঝিতে পারে না, ঘুমাইয়া উঠিয়া দেখে বেলা একেবারে নাই। জানালার বাহিরে সারা বনটায় ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে, বাঁশঝাড়ের আগায় রাঙা রোদ।

প্রতিদিন এই সময়-ঠিক এই ছায়া-ভরা বৈকালটিতে, নির্জন বনের দিকে চাহিয়া তাহার অতি অদ্‌ভুত কথা সব মনে হয়। অপূর্ব খুশিতে মন ভরিয়া ওঠে, মনে হয় এ রকম লতাপাতার মধুর গন্ধভরা দিনগুলি ইহার আগে কবে একবার যেন আসিয়াছিল, সে সব দিনের অনুভূত আনন্দের অস্পষ্ট স্মৃতি আসিয়া এই দিনগুলিকে ভবিষ্যতের কোন অনির্দিষ্ট আনন্দের আশায় ভরিয়া তোলে। মনে হয় একটা যেন কিছু ঘটিবে, এ দিনগুলি বুঝি বৃথা যাইবে না—একটা বড় কোনো আনন্দ ইহাদের শেষে অপেক্ষা করিয়া আছে যেন!

এই অপরাহ্ণগুলির সঙ্গে আজন্মসাথী সুপরিচিত এই আনন্দভরা বহুরূপী বনটার সঙ্গে কত রহস্যময়, স্বপ্ন-দেশের বার্তা যে জড়ানো আছে! বাঁশঝাড়ের উপরকার ছায়া-ভরা আকাশটার দিকে চাহিয়া সে দেখিতে পায়, এক তরুণ বীরের উদারতার সুযোগ পাইয়া কে প্রাথী একজন তাহার অক্ষয় কবচ-কুণ্ডল মাগিয়া লইতে হাত পাতিয়াছে, পিটুলি-গোলা পান করিয়া কোথাকার এক ক্ষুদ্র দরিদ্র বালক খেলুড়েদের কাছে দুধ খেয়েছি, দুধ খেয়েছি বলিয়া উল্লাসে নৃত্য করে-ওই যে গ্লোড়ো ভিটার বেলতলাটা-ওইখানেই তো শরশয্যাশায়িত প্রবীণ বীর ভীষ্মদেবের মরণাহত ওষ্ঠে তীক্ষ্ণবাণে পৃথিবী ফুড়িয়া অর্জ্জুন ভোগবতীধারা সিঞ্চন করিয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে সরযুতা◌িটর কুসুমিত কাননে মৃগয়া করিতে গিয়া রাজা দশরথ মৃগভ্রমে যে জল আহরণগত দরিদ্র বালককে বধ করেন-সে ঘটিয়াছিল ওই রানুদিদিদের বাগানের বড় জাম গাছটার তলায় যে ডোবা-তাহারই ধারে।

তাহাদের বাড়ি একখানা বই আছে, পাতাগুলো সব হলদে, মলাটটার খানিকটা নাই, নাম লেখা আছে ‘বীরাঙ্গনা কাব্য’, কিন্তু লেখকের নাম জানে না, গোড়ার দিকের পাতাগুলি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। বইখানা বড় ভালো লাগে।–তাহাতে সে পড়িয়াছে–

অদূরে দেখিনু হ্রদ, সে হ্রদের তীরে

রাজরথী একজন যান গড়াগড়ি
ভগ্নঊরু! দেখি উচ্চে উঠিনু কাঁদিয়া
এ কি কুস্বপন নাথ দেখাইলা মোরে!

কলুইচণ্ডী ব্রতের দিন মায়ের সঙ্গে গ্রামে উত্তর মাঠে যে পুরানো মজা পুকুরের ধারে সে বনভোজন করিতে যায়-কেউ জানে না-চারিধারে বনে ঘেরা সেই ছোট্ট পুকুরটাই মহাভারতের সেই দ্বৈপায়ন হ্রদ। ওই নির্জন মাঠের পুকুরটার মধ্যে সে ভগ্নউবু, অবমানিত বীর থাকে একা একা, কেউ দেখে না, কেউ খোঁজ করে না। উত্তর মাঠের কলাবেগুনের ক্ষেত হইতে কৃষাণেরা ফিরিয়া আসে, জনমানুষের চিহ্ন থাকে না কোনো দিকে-সোনাডাঙা মাঠের পারের অনাবিষ্কৃত, বসতিশূন্য, অজানা দেশে চন্দ্রহীন রাত্রির ঘন অন্ধকার ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে, তখন হাজার হাজার বছরের পুরাতন মানব-বেদনা কখনও বা দরিদ্র পিতার প্রবঞ্চনা-মুগ্ধ অবোধ বালকের উল্লাসে, কখনও বা এক ভাগ্যহত, নিঃসঙ্গ অসহায় রাজপুত্রের ছবিতে তাহার প্রবর্ধমান, উৎসুক মনের সহানুভূতিতে জাগ্রত ও সার্থক হয়। ওই অজ্ঞাতনামা লেখকের বইখানা পড়িতে পড়িতে কতদিন যে তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিয়াছে!

তাহার বাবা বাড়ি নাই। বাড়ি থাকিলে তাহাকে এক মনে ঘরে বসিয়া দপ্তর খুলিয়া পড়িতে হয়। একেবারে বেলা শেষ হইয়া যায়। তবুও ছুটি হয় না। তাহার মন ব্যাকুল হইয়া ওঠে। আর কতক্ষণ বসিয়া বসিয়া শুভঙ্করীর আর্য মুখস্থ করিবে? আজ আর বুঝি সে খেলা করিবে না? বেলা বুঝি আর আছে? বাবার উপর ভারি রাগ হয়, অভিমান হয়।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে ছুটি হইয়া যায়। বইদপ্তর কোনোরকমে ঝুপ করিয়া এক জায়গায় ফেলিয়া রাখিয়া ছায়াভরা উঠানে গিয়া খুশিতে সে নাচিতে থাকে।

অপূর্ব অদ্ভুত বৈকাল ট্রা.নিবিড় ছায়াভরা গাছপালার ধারে খেলাঘর.গুলঞ্চলতার তার টাঙানো... খেজুর ডালের ঝাঁপ...বনের দিক থেকে ঠাণ্ড ঠাণ্ডা গন্ধ বাহির হয়.রাঙা রোদটুকু জেঠমহাশয়দের পোড়ো ভিটায় বাতাবিলেবু গাছের মাথায় চিক্ চিক করে...চকচকে বাদামী রঙ-এর ডানাওয়ালা তেড়ো পাখি বনকলামি ঝোপে উড়িয়া আসিয়া বসে...তাজা মাটির গন্ধ...ছেলেমানুষের জগৎ ভরপুর আনন্দে উছলিয়া ওঠে, কাহাকে সে কি করিয়া বুঝাইবে সে কি আনন্দ!

সন্ধ্যার পর সর্বজয়া ভাত চড়াইয়াছিল। অপু দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া আছে। খুব অন্ধকার, একটানা বিবি পোকা ডাকিতেছে।

অপু জিজ্ঞাসা করিল-পুজোর আর কদিন আছে, মা?

দুর্গা বঁটি পাতিয়া তরকারি কাটিতেছিল। বলিল, আর বাইশ দিন আছে, না মা?

সে হিসাব ঠিক করিয়াছে। তাহার বাবা বাড়ি আসিবে, অপুর, মায়ের, তাহার জন্য পুতুল, কাপড়, আলতা।

আজকাল সে বড় হইয়াছে বলিয়া তাহার মা অন্য পাড়ায় গিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে দেয় না। লুচি খাইতে কেমন তাহা সে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। ফুটুফুটে কোজাগরী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-ভরা রাত্রে বাঁশবনের আলোছায়ায় জাল-বুনানি পথ বাহিয়া সে আগে আগে পাড়ায় পাড়ায় বেড়াইয়া লক্ষ্মীপূজার খই-মুড়ি ভাজা আঁচল ভরিয়া লইয়া আসিত। বাড়িতে বাড়িতে শাঁখ বাজে, পথে লুচিভাজার গন্ধ বাহির হয়, হয়তো পাড়ার কেউ পূজার শীতলের নৈবেদ্য একখানা তাহাদের বাড়িতে পাঠাইয়া দেয়। সেও অনেক খই-মুড়ি আনিত, তাহার মা দুইদিন ধরিয়া তাহাদের জলপান খাইতে দিত, নিজেও খাইত। সেবার সেজ ঠাকরুন বলিয়াছিল-ভদ্র লোকের মেয়ে আবার চাষা লোকের মতো বাড়ি-বাড়ি ঘুরে খই-মুড়ি নিয়ে বেড়াবে কি? ওসব দেখতে খারাপ.ওরকমআর পাঠিয়ে না। বৌমা-সেই হইতে সে আর যায় না।

দুর্গা বলিল-তাস খেলবে?

–তা। যা, ও ঘর থেকে তাসটা নিয়ে আয়, একটু খেলি—

দুর্গা বিপন্নমুখে অপুর দিকে চাহিল।

অপু হাসিয়া বলিল-চল আমি দাঁড়াচ্চি—

তাহাদের মা বলিল-আহ্যাঁ-হা, মেয়ের ভয় দেখে আর বাঁচিনে, সারাদিন বলে হেঁটি-মাটি ওপর করে বেড়াবার সময় ভয় থাকে না, আর রাত্রিতে এঘর থেকে ওঘর যেতে একেবারে সব আড়ষ্ট;...

শিষ্যবাড়ি হইতে অপুর আনা সেই তাসজোড়াটা। তাস খেলায় তিনজনেরই কৃতিত্ব সমান। অপু এখনও সব রং চেনে না-মাঝে মাঝে হাতের তাস বিপক্ষদলের খেলোয়াড় মাকে দেখাইয়া বলে, এটা কি রং, বুইতন? দ্যাখো না মা–

দুর্গার মন আজ খুব খুশি আছে। রাত্রিতে রান্না প্রায়ই হয় না, ওবেলার বাসি ভাত তবকারি থাকে। আজ ভাত চড়িয়াছে, তরকারি রান্না হইবে, ইহাতে তাহার মহা আনন্দ। আজ যেন একটা উৎসবের দিন। অপু বলিল-তাস খেলতে খেলতে সেই গল্পটা বলে না। মা, সেই শ্যামলঙ্কার গল্পটা?

হঠাৎ সে মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া শূইয়া পড়ে। মায়ের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে আবদারের সুরে বলে—সেই ছড়াটা বলে না। মা, সেই–শ্যামলঙ্কা বাটনা বাটে মাটিতে লুটায় কেশ।

দুর্গা বলে-খেলার সময় ছড়া বললে খেলা কি করে হবে অপু? ওঠ—

সর্বজয়া বলিল-দুগগা, পাতালকোঁড় আজ কোথায় পেলি রে? –সেই যে গোঁসাইদের বড় বাগানটা আছে? সেই রাষ্ট্রী গাই খুঁজতে একবার তুই আবি আমি, অপু? সেখানে অনেক ফুটেছিল, কেউ টের পায়নি, মা, খুব বন কি না? তা হলে লোকে তুলে নিয়ে যেত–

অপু বলিল-সেখানে গিইছিলি? উঃ, সে যে বড় বন রে দিদি! ‘

সর্বজয়া সস্নেহে বার বার ছেলের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। সেদিনকার সেই অপু- আয় চাঁদ আয় চাদ, খোকনের কপালে টি-ই-ই-ই দিয়ে যা—বলিলে বার বার কলের পুতুলের মতো চাদের মতো কপালখনি অঙ্গুলিবদ্ধ হস্তের দিকে ঝুকাইয়া দিত, সে কি না। আজ তাস খেলিতে বসিয়াছে! তাহার কাছে দৃশ্যটা বড় অভিনব ঠেকে। অপু খেলিতে না পারিলে বা আশা করিয়া কোনো পিটু জিতিতে না পারিলে কিংবা অপুর হাতে খারাপ তাসগুলো গিয়া নিজের হাতে ভালো তাস আসিলে, বিপক্ষদলের খেলোয়াড় হইয়াও তাহার মনে কষ্ট হইতেছিল।

দুর্গা বলিল-আজ কি হয়েছে জানো মা—

অপু বলিল-যাঃ, তা হলে তোর সঙ্গে আড়ি করবো, বলে দ্যাখ-

–করগে যা আড়ি-শোনো মা, ও পোস্তদানার নাম জানে না, আজ রাজীদের বাড়ি পোস্তদানা রদুরে দিয়েচে, ও বল্লে, কি রাজীদি? রাজী বল্লে, যষ্টিমধু, খেয়ে দ্যাখ-ও খেয়ে এলো মা সেখানে দাঁড়িয়ে, বুঝতে পাল্লে না যে পোস্ত-এমন বোকা-না মা?

অপু মুখে বলিল বটে কিন্তু দিদির সহিত সে আড়ি করিবে না। সেই যে যেদিন তাহঙ্ক পাকা মাকাল ফলগুলো সত্যুদা লইয়া পলাইয়াছিল, সেদিন তাহার দিদি সারাদিন বন বাগান খুঁজিয়া সন্ধ্যার সময় কোথা হইতে আঁচলে। বাঁধিয়া একরাশ মাকাল ফল

আনিয়া তাহার সম্মুখে খুলিয়া দেখাইয়া বলিয়াছিল–কেমন হল এখন? বড় যে কাঁদছিলি সকালবেলা? সে সন্ধ্যায় কিসে সে বেশি আনন্দ পাইয়াছিল—মাকাল ফলগুলো হইতে কি দিদির মুখের, বিশেষ করিয়া তাহার ডাগর চোখের মমতা ভরা স্নিগ্ধ হাসি হইতে-তাহা সে জানে না।

-ছক্কার খেলা অপু বুঝে সুজে খেলিস?-দুর্গা মহাখুশির সহিত তাস কুড়াইয়া সাজাইতে লাগিল।

–কি ফুলের গন্ধ বেরুচ্চে, না দিদি?

তাহাদের মা বলিল, তাহদের জেঠামশায়দের ভিটার পিছনে ছাতিমগাছ আছে, সেই ফুলের গন্ধ। অপু ও দুর্গা দুজনেই আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল-হ্যাঁ মা, ওই ছাতিমতলায় একবার বাঘ এসেছিল বলেছিলে না? কিন্তু তাহার মা তাড়াতাড়ি তাস ফেলিয়া উঠিয়া বলিল-ওই যাঃ ভাত পুড়ে গেল, ধরাগন্ধ বেরিয়েছে-ভাতটা নামিয়ে দাঁড়া বলচি–

খাইতে বসিয়া দুর্গা বলিল-পাতালকোঁড়ের তরকারিটা কি সুন্দর খেতে হয়েচে মা!

তাহার মুখ স্বগীয় তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে অপুও বলিল-বাঃ খেতে ঠিক মাংসের মতো, না দিদি? পাতালকোঁড় এক জায়গায় কত ফুটে আছে মা, আমি ভাবি ব্যাঙের ছাতা, তাই তুলি নে—

উভয়ের উচ্ছসিত প্রশংসা-বাক্যে সর্বজয়ার বুক গর্বে ও তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। তবুও কি আর উপযুক্ত উপকরণ সে পাইয়াছে? লোকের বাড়িতে ভোজে রাঁধিতে ডাকে সেজঠাকরুনকে, ডাকুক না দেখি একবার তাহাকে, রান্না কাহাকে বলে সেজঠাকরুনকে সে-হ্যাঁ।

সর্বজয়া বলিল-অপুর হাতে জল ঢেলে দে দুগগা, ও কি ছেলেব কাণ্ড? ওই রাস্তার মাঝখানে মুখ ধোয়? রোজই রাত্রে তুমি ওই পথের উপর–

কিন্তু অপু আর এক পাও নড়িতে চাহে না, সম্মুখের সেই ভাঙা পাচিলের ফাক, অন্ধকার বাঁশবন, ঝোপ-জঙ্গলের অন্ধকার ঝিঙের বিচির মতো কালো। পোড়ো ভিটেবাড়ি…আরও অজানা কত কি বিভীষিকা! সে বুঝিতে পারে না যেখানে প্রাণ লইয়া টানাটানি সেখানে পথের উপর আঁচানোটাই কি এত বেশি; তাহার পরে সকলে গিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। রাত্রি গভীর হয়, ছাতিম ফুলের উগ্র সুবাসে হেমন্তের আঁচ-লাগা শিশিরাদ্র নৈশ বায়ু ভরিয়া যায়। মধ্যরাত্রে বেণুবনশীর্ষে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের ম্লান

জ্যোৎস্না উঠিয়া শিশিরসিক্ত গাছপালায়, ডালে-পাতায় চিকচিক্ করে। আলো-আঁধারের অপরূপ মায়ায় বনপ্রান্ত ঘুমন্ত পরীর দেশের মতো। রহস্য-ভরা। শন শন করিয়া হঠাৎ হয়তো এক ঝলক হাওয়া সৌদালির ডাল দুলাইয়া, তেলাকুচা ঝোপের মাথা কঁপাইয়া বহিয়া যায়।

এক-একদিন এই সময়ে অপুর ঘুম ভাঙিয়া যাইত।

সেই দেবী যেন আসিয়াছেন, সেই গ্রামের বিস্মৃত অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশালাক্ষী।

পুলিনশালিনী ইছামতীর ডালিমের রোয়ার মতো স্বচ্ছ জলের ধারে, কুচা শ্যাওলা ভরা। ঠাণ্ডা কাদায় কতদিন আগে যাহাদের চরণ-চিহ্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তীরের প্রাচীন সপ্তপর্ণটাও হয়তো যাদের দেখে নাই, পুরানো কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরে তারাই এক সময়ে ফুল-ফল-নৈবেদ্যে পূজা দিত, আজকালকার লোকেরা কে তাঁহাকে জানে?

তিনি কিন্তু এ গ্রামকে এখনও ভোলেন নাই।

গ্রাম নিযুতি হইয়া গেলে অনেক রাত্রে, তিনি বনে বনে ফুল ফুটাইয়া বেড়ান, বিহঙ্গ-শিশুদের দেখাশুনা করেন, জ্যোৎস্না-রাত্রের শেষ প্রহরে ছোট্ট ছোট্ট মৌমাছিদের চাকগুলি বুনো-ভাওরা, নাটুকান, পুয়ো ফুলের মিষ্ট মধুতে ভরাইয়া দেন।

তিনি জানেন কোন ঝোপের কোণে বাসক ফুলের মাথা লুকাইয়া আছে, নিভৃত বনের মধ্যে ছাতিম ফুলের দল কোথায় গাছের ছায়ায় শূইয়া, ইছামতীর কোন বাঁকে সবুজ শ্যাওলার ফাঁকে ফাঁকে নীল-পাপড়ি কলমিফুলের দল ভিড় পাকাইয়া তুলিতেছে, কঁটা গাছের ডালপালার মধ্যে ছোট্ট খড়ের বাসায় টুনটুনি পাখির ছেলেমেয়েরা কোথায় ঘুম ভাঙিয়া উঠিল।

তার রূপের স্নিগ্ধ আলোয় বন যেন ভরিয়া গিয়াছে। নীরবতায়, জ্যোৎস্নায়, সুগন্ধে, অস্পষ্ট আলো-আঁধারের মায়ায় রাত্রির অপরূপ শ্রী।

দিনের আলো ফুটিবার আগেই কিন্তু বনলক্ষ্মী কোথায় মিলাইয়া যান, স্বরূপ চক্রবতীর পর তাহাকে কেহ কোনোদিন দেখে নাই।

# সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

গ্রামের অন্নদা রায় মহাশয় সম্প্রতি বড় বিপদে পড়িয়াছেন।

গ্রামের জরিপ আসাতে উত্তর মাঠে তাঁবু পড়িয়াছে। জরিপের বড় কর্মচারী মাঠের মধ্যে নদীর ধারে অফিস খুলিয়াছেন, ছোটখাটো আমলাও সঙ্গে আসিয়াছে বিস্তর। গ্রামের সকল ভদ্রলোকই কিছু জমিজমার মালিক; পিতৃপুরুষের অর্জিত এই সব সম্পত্তির নিরাপদ কূলে জীবনতরণীর লগি কষিয়া পুঁতিয়ে জড় পদার্থের ন্যায় উদ্যমহীন, গতিহীন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় দিনগুলি একরূপ বেশই কাটিতেছিল। কিন্তু এবার সকলেই একটু বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। রাম হয়তো শ্যামের জমি নির্বিবাদে নিজের বলিয়া ভোগ করিয়া আসিতেছে, যদু দশ বিঘার খাজনায় বারো বিঘা নিরুপদ্রবে দখল করিতেছে, এতদিন যাহা পূর্ণ শান্তিতে নিষ্পন্ন হইতেছিল, এইবার সেই সকলের মধ্যে গোলমাল পৌঁছিল। বিপদ একরূপ সর্বজনীন হইলেও অন্নদা রায়ের বিপদ একটু অন্য ধরনের বা একটু বেশি গুরুতর। তাঁহার এক জ্ঞাতিভ্রাতা বহুদিন যাবৎ পশ্চিমপ্রবাসী। এতদিন তিনি উক্ত প্রবাসী জ্ঞাতির আম-কঁঠালের বাগান ও জমি নির্বিঘ্নে ভোগ করিতেছিলেন এবং সম্পূর্ণ ভরসা ছিল জরিপের সময় পারিয়া উঠিলে সবই, অন্ততপক্ষে কতকাংশ নিজের বলিয়া লিখাইয়া লইবেন, কিন্তু কি জানি গ্রামের কে উক্ত প্রবাসী জ্ঞাতিকে কি পত্র লিখিয়াছে।–ফলে অদ্য দিন দশেক হইল জ্ঞাতিভ্রাতার জ্যেষ্ঠপুত্রটি জরীপের সময় বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনা করিতে আসিয়াছে। মুখের গ্রাস তো গেলই, তাহা ছাড়া বিপদ আরও আছে। ওই আত্মীয়ের অংশের ঘরগুলিই বাড়ির মধ্যে ভালো, রায় মহাশয় গত বিশ বৎসর সেগুলি নিজে দখল করিয়া আসিতেছেম, সেগুলি ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে।–জ্ঞাতিপুত্রটি শৌখিন ধরনের কলেজের ছেলে, একখানিতে শোয়, একখানিতে পড়াশুনা করে উপরের ঘরখানি হইতে লোহার সিন্দুক, বন্ধকী মাল, কাগজপত্রাদি সরাইয়া ফেলিতে হইয়াছে। নিচের যে ঘরে পালিত-পাড়া হইতে সস্তাদরে কেনা কড়িবারগা রক্ষিত ছিল, সে ঘরও শীঘ্র ছাড়িয়া দিতে হইবে।

বৈকালবেলা। অন্নদা রায়ের চণ্ডীমণ্ডপে পাড়ার কয়েকটি লোক আসিয়াছেন- এই সময়েই পাশা খেলার মজলিশ বসে। কিন্তু অদ্য এখনও কাজ মেটে নাই। অন্নদা রায় একে একে সমাগত খাতকপত্র বিদায় করিতেছিলেন।

উঠানের রোয়াকের ঠিক নিচেই একটি অল্পবয়সি কৃষক-বধূ একটা ছোট ছেলে সঙ্গে লইয়া অনেকক্ষণ হইতে ঘোমটা দিয়া বসিয়া ছিল, সে এইবার তাহর পালা আসিয়াছে ভাবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রায় মহাশয় মাথা সামনে একটু নিচু করিয়া চশমার উপর হইতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন-কে? তোর আবার কি?

কৃষক-বন্ধুটি আঁচলের খুঁট খুলিতে খুলিতে নিম্নকণ্ঠে বলিল-মুই কিছু টাকার জোগাড়া করিচি অনেক কষ্টে, মোর টাকাডা নেন.আর গোলার চাবিটা খুলে দ্যান, বড় কষ্ট যাচ্ছে মনিব ঠাকুর, সে আর কি বলবো।–

অন্নদা রায়ের মুখ প্রসন্ন হইল, বলিলেন-হরি, নেও তো ওর টাকাটা গুনে। খাতাখানায় দেখো তারিখটা, সুদটা আর একবার হিসেব করে দেখো–

কৃষক-বধূ আঁচলের খুঁট হইতে টাকা বাহির করিয়া হরিহরের সম্মুখে রোয়াকের ধারে রাখিয়া দিল। হরিহর গুনিয়া বলিল-পাঁচ টকা?

রায় মহাশয় বলিলেন-আচ্ছা-জমা করে নাও-তারপর আর টাকা কই?

-ওই এখন ন্যান, তারপর দেবো-মুই গতির খাটিয়ে-শোধ করে তোলবো, এখন ওই নিয়ে মোর গোলার চাবিড়া খুলে দ্যান, মোর মাতোরে দুটো খেইয়ে তো আগে বঁচাই, তার পর ঘরদোর ফুটো হয়ে গিয়েছে, সে না হয়-।

এমন নিরুদ্বেগে কথা বলিতেছিল যেন গোলার চাবি তাহার করতলগতহইয়া গিয়াছে। রায় মহাশয়কে চিনিতে তাহার বিলম্ব ছিল।

রায় মহাশয় কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন-ওঃ, ভারি যে দেখছি মাগীর আবদার, চল্লিশ টাকার কাছাকাছি সুদে আসলে বাকি-পাঁচ টাকা এনিচি, নিয়ে গোলা খুলে দ্যান, ছোট লোকের কাণ্ডই আলাদা।—যা এখন দুপুরবেলা দিক করিস নে—

কৃষক-বধূ চণ্ডীমণ্ডপের অন্য কাহারও অপরিচিত নহে, দীনু ভট্টচায্যি চোখে ভালো দেখিতেন না, বলিলেন-কে ও অন্নদা?

-ওই ও-পাড়ার তমরেজের বৌ-দিন চারেক হোল তমরেজ না মারা গিয়েচে? সুদে আসলে চল্লিশ টাকা বাকি, তাই মরবার দিনই বিকেল থেকে গোলায় চাবি দিয়ে রেখেচি, এখন গোলা খুলিয়ে দ্যান-হেন করুন-তেন করুন–

পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া গেলেও তমুরেজের বৌ অত চমকিয়া উঠিত না-সে ব্যাপার এখন অনেকটা বুঝিল, আগাইয়া আসিয়া বলিল-ওকথা বলবেন না। মনিব ঠাকুর, মোর খোকার একটা বুপোর নিমফল ছেল, ও বছর গড়িয়ে দিইছিল! তাই ভোঁদা সেকরার দোকানে বিক্রি কল্লে পাঁচটা টাকা দেলে–ছেলেমানুষের জিনিস ব্যাচবার ইচ্ছে ছেল না, তা কি করি, এখন দুটো খেইয়ে বঁচি, ভাবলাম এর পর দিন দেন মালিক তো মোর বাছারে মুই আবার নিমফল গড়িয়ে দেবো! তা দেন মনিব ঠাকুর চাবিডা গিয়ে–

–যা যা-এখন যা-এ সব টাকাকড়ির কাণ্ড কি নাকে কঁদিলেই মেটো? তা মেটে না। সে তুই কি বুঝবি, থাকতো তোর সোয়ামী তো বুঝতে, যা এখন দিক্ করিস নি-ওই পাঁচ টাকা তোর নামে জমা রৈল-বাকি টাকা নিয়ে আয় তারপর দেখা যাবে।

অন্নদা রায় চশমা খুলিয়া খাপের মধ্যে পুরিতে পুরিতে উঠিয়া পড়িলেন ও বাড়ির ভিতরে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। তমরেজের বৌ আকুল সুরে বলিয়া উঠিল-কনে যান ও মনিব ঠাকুর, মোর খোকার একটা উপায় করে যান, ওরে মুই খাওয়াবো কি, এক পয়সার মুড়ি কিনে দেবার যে পয়সা নেই।–মোর গোলা না খুলে দ্যান, মোর টাকা কড়া মোরে ফেরত দ্যান–

রায় মহাশয় মুখ খিচাইয়া বলিলেন—যা যা সন্দে বেলা মাগী ফ্যাচু ফ্যাচু করিস নে-এক মুঠো টাকা জলে যাচ্চে তার সঙ্গে খোঁজ নেই, গোলা খুলে দাও, টাকা ফেরত দাও-গোলায় আছে কি তোরা? জোর শালি চারেক ধান, তাতে টাকা শোধ যাবে? ও পাঁচ টাকাও উশুল রয়ে রৈল, আমার টাকা দেখবো না! ওঁর ছেলে কি খাবে বলে দাও-ছেলে কি খাবে তা আমি কি জানি? যা, পরিস তো নালিশ করে খোলাগে যা–

রায় মহাশয় বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেলে দীনু ভট্টচায্যি বলিলেন-হ্যাগো বৌ, তমরেজ ক'দিন হল—কই তা তো–

-বুধবারের দিন বাবা ঠাকুর, হাট থে। ভাওন মাছ আনলে, পেয়াজ দিয়ে রাঁধলাম-ভাত দেলাম-সহজ মানুষ ভালো খেলে দিব্যি-খেয়ে বললে মোর শীত করচে, কাঁথা চাপা দিয়ে দাও, দেলাম-ওমা সইতে তারা উঠতি না উঠতি মানুষ দেখি আর সাড়াশব্দ দেয় না, দুপুর হাতি না হতি মোরে পথে বসিয়ে-মোর খোকারে পথে বসিয়ে-চোখের জলে তাহার গলা আটকাইয়া গেল; মিনতির সুরে বলিল-আপনারা এটু বলেন-বলে গোলার চাবিড়া দিইয়ে দ্যান, সংসারে বড় কষ্ট হয়েচে-কর্জ কি মুই বাকি রাখবো।–ঝে করে হোক–

এই সময়ে নবাগত জ্ঞাতিপুত্রটি আসিয়া পড়াতে কথাবার্তা বন্ধ হইল। দীনু বলিলেন-এসো হে নীরেন বাবাজী, মাঠের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলে বুঝি? এই তোমার বাপ-ঠাকুরদার দেশ বুঝলে হে, কি রকম দেখলে বল?

নীরেন একটু হাসিল। তাহার বয়স একুশ-বাইশের বেশি নয়, বেশ বলিষ্ঠ গড়ন, সুপুরুষ। কলিকাতার কলেজে আইন পড়ে, অত্যন্ত মৌনী প্রকৃতির মানুষ-দেখিবার জন্য পিতা কর্তৃক প্রেরিত হইলেও কাজকর্ম সে কিছুই দেখে না বোঝেও না, দিনরাত

নভেল পড়িয়া ও বন্দুক ছুঁড়িয়া কাটায়। সঙ্গে একটি বন্দুক আনিয়াছে, শিকারের ঝোঁক খুব।

নীরেন উপরে নিজের ঘরে ঢুকিতে গিয়া দেখিল, গোকুলের স্ত্রী ঘরের মেজেতে বসিয়া পড়িয়া মেজ হইতে কি খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিতেছে। দোরের কাছে যাইতেই তাহার নজর পড়োল, তাহার দামি বিলাতী আলোটা মেজেতে বসানো; উহার কাচের ডুমটা ভাঙিয়া চুরমার হইয়াছে, সাবা মেজেতে কাঁচ ছড়ানো। দোরের কাছে জুতাব শব্দ পাইয়া গোকুলেৰ স্ত্রী চমকাইয়া পিছন ফিরিয়া চাহিল, সে আঁচল পাতিয়া মেজে হইতে কাঁচের টুকরাগুলি খুটিয়া খুটিযা তুলিতেছিল,-ভাবে মনে হয় প্রতিদিনেব মতো ঘর পরিষ্কার করিতে আসিয়া আলোটি জ্বলিতে গিয়াছিল, কি কবিয়া ভাঙিযা ফেলিয়াছে এবং আলোর মালিক আসিবার পূর্বেই নিজেই অপবাধের চিহ্নগুলি তাড়াতাড়ি সরাইযা ফেলিবার চেষ্টায় ছিল, হঠাৎ বামাল ধরা পড়িয়া অত্যন্ত অপ্রতিভ হইল।ক্ষতিকারিণীব লজ্জাব ভারটা লঘু করিয়া দিবার জন্যই নীরেন হাসিযা বলিয়া উঠিল–এই যে বৌদি, আলোটা ভেঙে বসে আছেন বুঝি? এই দেখুন ধরা পড়ে গেলেন, জানেন তো আইন পড়ি। আচ্ছা এখন একটু চা কবে নিয়ে আসুন তো বৌদি, চাটু করে, দেখি কেমন কাজের লোক। দাঁড়ান আলোটা জেলে নিই, ভাগ্যিস বাক্সে আর একটা ডুম আছে।

গোকুলের স্ত্রী। সলজ্জ সুরে বলিল, দেশলাই আনবো ঠাকুরপো?

নীরেন কৌতুকের সুরে বলিল-দেশলাই আনেন নি। তবে আলো পেড়ে কি করছিলেন শুনি?

বধূ এবার হাসিয়া ফেলিল, নিম্নসুরে বলিল-বুল পড়ে রয়েচে, ভাবলুম একটু মুছে দিই, তা যেমন কঁচটা নামাতে গেলাম, কি জানি ও সব ইংরিজি কলের আলো-কথা শেষ না কবিয়াই সে পুনরায় সলজ হাসিয়া নিচে পলাইল!

নীরেন। দশ বারো দিন আসিয়াছে বটে, সম্পর্কে বৌদিদি হইলেও গোকুলের স্ত্রীর সঙ্গে তাহার বিশেষ আলাপ হয় নাই। কঁচ ভাঙার সন্ধ্যা হইতে কিন্তু উভয়ের মধ্যে নূতন পরিচযেব সংকোচটা কাটিয়া গেল। নীরেন অবস্থাপন্ন পিতাব পুত্র, তাহার উপর বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে এই প্রথম আসা, নিঃসঙ্গ আনন্দহীন প্রবাসে দিনগুলি কাটিতে চাহিতেছিল না। সমবয়সি বৌদির সহিত পবিচাযের পথটা সহজ হইয়া যাওয়ার পর হইতে সকাল-সন্ধ্যায় চা-পানের সময়টি সহজ আদান-প্রদানের মাধুর্যে আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল!...

দুপুরে সেদিন দুর্গা বেড়াইতে আসিল। রান্নাঘরের দুয়ারে উঁকি মারিয়া বলিল-কি রাধচো ও খুড়িমা?

বধূ বলিল-আয় মা আয়, একটু কাজ করে দিবি? একা আর পেরে উঠ্‌চিনে।...

দুর্গা মাঝে মাঝে যখনই আসে, খুড়িমার কার্যে সাহায্য করে। সে মাছ কুটিতে কুটিতে বলিল-হ্যাঁ খুড়িমা, এ কাঁকড়া কোথায় পেলো? এ কাঁকড়া তো খায় না।

-কেন খাবে না রে, দূর। বিধু জেলেনি বলে গেল এ কাঁকড়া সবাই খায়।

-হ্যাঁ খুড়িমা, ওমা সেকি, তুমি কিনলে?

-কিনালামই তো, ওই অতগুলো পাঁচ পয়সায় দিয়েচে বিধু।

দুর্গা কিছু বলিল না। মনে মনে ভাবিল-খুড়িমার আর সব ভালো, কেবল একটু বোকা! এ কাঁকড়া আবার পয়সা দিয়ে কেনেই বা কে, খায়ই বা কে? ভালোমানুষ পেয়ে বিধু ঠকিয়ে নিয়েচে। সঙ্গে সঙ্গে এই সরলা খুড়িমাটির উপর তাহার স্নেহ নিবিড়তার হইয়া উঠিল।

সেদিন নাকি গোকুল-কাক খুড়িমার মাথায় খড়মের বাড়ি মারিয়াছিল—স্বর্ণ গোয়ালিনী তাহাদের বাড়ি গল্প করে। সে-ও সেদিন নদীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়েছিল। খুড়িমা স্নান করিতে আসিয়া মাথা ডুবাইয়া স্নান করিল না, পাছে জ্বালা করে। সেদিন দুঃখে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল; কিন্তু কিছু বলে নাই পাছে খুড়িমা অপ্রতিভ হয়—এক ঘাট লোকের সামনে লজ্জা পায়। তবুও রায়-জেঠি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।–বৌমা, নইলে না?..

খুড়িমা হাসিয়া উত্তর দিল-নাবো না। আজ আর দিদিমা, শরীরটা ভালো নেই।...

খুড়িমা ভাবিয়াছিল। তাহার মার খাওয়ার কথা বুঝি কেহ জানে না। কিন্তু খুড়িমা ঘাট হইতে উঠিয়া গেলেই রায়-জেঠি বলিল-দেখেচো বেঁটাকে কি রকম মেরেচে গোকুলো, মাথার চুলে রক্ত একেবারে আঠা হয়ে এটি আছে!..রায়-জেঠির ভারি অন্যায়। জানো তো বাপু, তবে আবার জিজ্ঞেস করাই বা কেন, আর সকলকে বলাই বা কেন?

মাছ ধুইয়া রাখিয়া চলিয়া যাইবার সময় দুর্গা ভয়ে ভয়ে বলিল—খুড়িমা, তোমাদের চিড়ের ধান আছে? মা বলছিল। অপু চিড়ে খেতে চেয়েছে, তা আমাদের তো এবার ধান কেনা হয়নি।.

গোকুলের বুক চুপি চুপি বলিল-আসিস এখন দুপুরের পর।.দালানের দিকে ইশারায় দেখাইয়া কহিল-ঘুমুল আসিস!

দুর্গা জিজ্ঞাসা করিল-খুড়িমা, তোমাদের বাড়ি কে এসেছে, আমি একদিনও দেখিনি কিন্তু।

—ঠাকুরপোকে দেখিসনি? এখন নেই কোথায় বেরিয়েচে, বিকেলবেলা আসিস, দেখা হবে এখন .তারপর গোকুলের বউ হাসিয়া বলিল—তোর সঙ্গে ঠাকুরপোর বিয়ে হলে কিন্তু দিব্যি মানায়।

দুর্গা লজ্জায় রাঙা হইয়া বলিল-দূর!

গোকুলের বউ আবার হাসিয়া বলিল-কেন রে, দূর কেন? কেন, আমাদের মেয়ে কি খারাপ? দেখি?...সে দুর্গার চিবুকে হাত দিয়া মুখখানা একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া বলিল-দ্যাখ তো এমন দুগগা প্রতিমার মতো সুন্দর মুখখানি? হলই বা বাপের পয়সা নেই?

দুর্গা ঝাঁকুনি দিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া কহিলা-যাও, খুড়িমা যেন কি...পরে সে একপ্রকার ছুটিয়াই খিড়কি দোর দিয়া বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতে সে ভাবিল-খুড়িমার আর সব ভালো, কেবল একটু বোকা, নইলে দ্যাখো না...? দূর!

দুর্গা চলিয়া যাইতে না যাইতে স্বর্ণ গোয়ালিনী দুধ দুহিতে আসিল। বধূ ঘর হইতে বলিল— ও সন্ন, আমার হাত জোড়া, বাছুরটা ওই বাইরের উঠোনে পিটুলি-গাছে বাধা আছে–নিয়ে আয়, আর রোয়াকে ঘটিটা মাজা আছে দ্যাখ।

সখী ঠাকরুনের এতক্ষণে পুজাহিক সমাপ্ত হইল। তিনি বাহিরে আসিয়া উত্তর দিকে স্থানীয় কালীমন্দিরের উদ্দেশে মুখ ফিরাইয়া প্রণাম করিতে করিতে টানিয়া টানিয়া আবৃত্তির সুরে বলিতে লাগিলেন-দোহাই মা সিদ্ধেশ্বরী, দিন দিয়ো মা, ভাবসমুদুর পার কোরো মা-মা রক্ষেকালী, রক্ষে কোরো, মা-গো!

গোকুলের বউ রান্নাঘর হইতে ডাকিয়া বলিল-ও পিিসমা, নারকোলের নাড়ু রেখে দিইচি, দুটো খেয়ে জল খান।

হঠাৎ সখী ঠাকরুন রোয়াক হইতে ডাক দিলেন-বৌমা, দেখে যাও তো এদিকে।

স্বর শুনিয়া গোকুলের বউ-এর প্রাণ উড়িয়া গেল। সখী ঠাকরুনকে সে যমের মতো ভয় করে। মায়া-দয়া বিতরণ সম্বন্ধে ভগবান সখী ঠাকরুনের প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব দেখান নাই-একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। রোয়াকের কোণে জড়ো-করা মাজা বাসনগুলির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, আঙুল দিয়া দেখাইয়া কহিলেন-দ্যাখো তো চক্ষু

দিয়ে, দেখতে পাচ্ছে? একেবারে স্পষ্ট জলের দাগ দেখলে তো? এইখান থেকে সন্ন ঘটি তুলে নিয়ে গিয়েচে, তারপর সেই শূদ্দূরের ছোঁয়া এঁটো বাসন আবার হেঁসেলে নিয়ে সাত-রাজ্যি জাজানো হয়েচে! হাঃ! জাতজন্মো একেবারে গেল!

সখী ঠাকরুন হতাশভাবে রোয়াকে বসিয়া পড়িলেন। যেন উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ পাইলে ইহার চেয়ে বেশি হতাশ হইতে পারিতেন না।

—হাঘরে হাড়হাবাতে ঘরের মেয়ে আনলেই অমনি হয়, ভদ্রলোকের রীত শিখবেই বা কোথা থেকে-জানবেই বা কোথা থেকে? বাসন মজলি তো দেখলি নে এটো গেল কি রৈল? তিনপহার বেলা হয়েচে, ভাবলাম একটু জল মুখে দিই! শূন্দুরের এটো, এখখনি নেয়ে মরতে হোতভাগ্যিস ঘটিটা ছুইনি।

গোকুলের বউ বিষণ্নমুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল-কেন মত্তে সন্ন পোড়ারমুখীকে ঘটি তুলে নিতে বল্লাম, নিজে দিলেই হত।

সখী ঠাকরুন মুখ খিচাইয়া বলিলেন–ধিঙ্গি হয়ে দাঁড়িয়ে রৈলে যে? যাও হ্যাঁড়ি কুড়ি ফেলে দাও গিয়ে। বাসন-কোসন মেজে আনো ফের। রান্নাঘরে গোবর দিয়ে নেয়ে এসো। যত লক্ষ্মীছাড়া ঘরের মেয়ে জুটে সংসারটাকে ছারখারে দিলে।.সখী ঠাকরুন রাগে গরগর করিতে করিতে ঘরে ঢুকিলেন, বাহিরের খররৌদ্র তাঁহার সহ্য হইতেছিল না।

কুকুম-মতো সকল কোজ সারিতে বেলা একেবারে পড়িয়া গেল। নদীতে সে যখন পুনরায় স্নান করিতে গেল, তখন রৌদ্রে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় ও পরিশ্রমে তাহার মুখ শুকাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছে!

ঘাটে বৈকালের ছায়া খুব ঘন, ওপারে বড় শিমুল গাছটায় রোদ চিক চিক করিতেছে। নদীর বঁকে একখানা পাল-তোলা নৌক দাঁড় বাহিয়া বঁক ঘুরিয়া যাইতেছে। হালের কাছে একজন লোক দাঁড়াইয়া কাপড় শূকাইতেছে, কাপড়টা ছাড়িয়া দিয়াছে, বাতাসে নিশানের মতো উড়িতেছে, মাঝনদীতে একটা বড় কচ্ছপ মুখ তুলিয়া নিঃশ্বাস লইয়া আবার ডুবিয়া গেল-সো-ও-ও-ও-ভুস!

নদীর জলের কেমন একটা ঠাণ্ড ঠাণ্ডা সুন্দর গন্ধ আসে, ছোট্ট নদী; ওপারের চরে একটা পানকৌড়ি মাছ-ধরা বাঁশের দোয়াড়ির উপর বসিয়া আছে।

এই সময় প্রতিদিন তাহার শৈশবের কথা মনে পড়ে

পানকৌড়ি পানকৌড়ি, ডাঙায় ওঠোসে…

গোকুলের বউ খানিকক্ষণ পানকৌড়িটার দিকে চাহিয়া রহিল। মায়ের মুখ মনে পড়ে। সংসারে আর কেহ নাই যে, মুখের দিকে চায়। মায়ের কি মরিবার বয়স হইয়াছিল? গরিব পিতৃকুলে কেবল এক গাঁজাখের ভাই আছে, সে কোথায় কখন থাকে-তার ঠিকানা নাই। গত বৎসর পূজার সময় এখানে আসিয়া চার দিন ছিল। সে লুকাইয়া লুকাইয়া ভাইকে নিজের বাক্স হইতে যাহা সামান্য কিছু পুজি-সিকিটা দুয়ানিটা বাহির করিয়া দিত। পরে একদিন সে হঠাৎ এখান হইতে উধাও হয়। চলিয়া গেলে প্রকাশ পাইল যে, এক কাবুলি আলোয়ান-বিক্রেতার নিকট একখানি আলোয়ান ধারে কিনিয়া তাহার খাতায় ভগ্নীপতির নাম লিখাইয়া দিয়াছে। তাহা লইয়া অনেক হৈ চৈ হইল। পিতৃকুলের অনেক সমালোচনা, অনেক অপমান! ভাইটির সেই হইতে আর কোন সন্ধান নাই।

নিঃসহায় ছন্নছাড়া ভাইটার জন্য সন্ধ্যাবেলা কাজের ফাঁকে মনটা সু-দু করে। নির্জন মাঠের পথের দিকে চাহিয়া মনে হয়, গৃহহারা পথিক ভাইটা হয়তো দূরের কোন জনহীন আঁধার মেঠো-পথ বাহিয়া একা কোথায় চলিয়াছে, রাত্রে মাথা গুজিবার স্থান নাই, মুখের দিকে চাহিবার কোনো মানুষ নাই।...

বুকের মধ্যে উদ্বেল হইয়া উঠে, চোখের জলে ছায়াভিরা নদীর জল, মাঠ, ঘাট, ওপরের শিমুল গাছটা, বাঁকের মোড়ে বড় নৌকাখানা-সব ঝাপসা হইয়া আসে।

# অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অপু সেদিন জেলেপাড়ায় কড়ি খেলিতে গিয়াছিল। বেলা দুইটা বা আড়াইটার কম নয়, রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর। প্রথমে সে তিনকড়ি জেলের বাড়ি গেল। তিনকড়ির ছেলে বঙ্কা পেয়ারাতলায় বাখারি চাচিতেছিল, অপু বলিল–এই কড়ি খেলবি?

খেলিবার ইচ্ছা থাকিলেও বঙ্কা বলিল, তাহাকে এখনই নৌকায় যাইতে হইবে, খেলা করিতে গেলে বাবা বকিবে! সেখান হইতে সে গেল রামচরণ জেলের বাড়ি।

রামচরণ দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল; অপু বলিল-হৃদয় বাড়ি আছে?

রামচরণ বলিল-হৃদয়কে কেন ঠাকুরী? কড়ি খেলা বুঝি? এখন যাও, হৃদে বাড়ি নেই।

ঠিক-দুপুর বেলায় ঘুরিয়া অপুর মুখ রাঙা হইয়া গেল। আরও কয়েক স্থানে বিফলমনোরথ হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে বাবুরাম পাড়ুইয়ের বাড়ির নিকটবর্তী তেঁতুলতলার কাছে আসিয়া তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তেঁতুলতলায় কড়ি খেলার আডডা খুব জমিয়াছে। সকলেই জেলেপাড়ার ছেলে কেবল ব্রাহ্মণপাড়ার ছেলের মধ্যে আছে। পটু। অপুর সঙ্গে পটুর তেমন আলাপ নাই, কারণ পটুর যে পাড়ায় বাড়ি, অপুদের বাড়ি হইতে তাহা অনেক দূর। অপুর চেয়ে বয়সে পটু কিছু ছোট; অপুর মনে আছে, প্রথম যেদিন সে প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালায় ভর্তি হইতে যায়, সেদিন এই ছেলেটিকেই সে শান্তভাবে বসিয়া তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতে দেখিয়াছিল।...অপু তাহার কাছে গিয়া বলিল-কটা কড়ি?... পটু কড়ির গেজে বাহির করিয়া দেখাইল। রাঙা সুতার বুনানি ছোট্ট গেজেটি-তাহার অত্যন্ত শখের জিনিস। বলিল, সতেরোটা এনেছি।–সাতটা সোনাগেটে; হেরে গেলে আরও আনবো।... পরে সে গেজেটা দেখাইয়া হাসিমুখে কহিল-কেমন দেখচিস? গেজেটায় একপণ কড়ি ধরে।

খেলা আরম্ভ হইল। প্রথমটা পটু হারিতেছিল, পরে জিতিতে শুরু করিল। কয়েকদিন মাত্র আগে পটু আবিষ্কার করিয়াছে যে, কড়ি-খেলায় তাহার হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ হইয়া উঠিয়াছে; সেইজন্যই সে দিগ্বিজয়ের উচ্চাশায় প্রলুব্ধ হইয়া। এতদূর আসিয়াছিল। খেলার নিয়মানুসারে পটু উপর হইতে টুক করিয়া বড় কড়ি দিয়া তাক ঠিক করিয়া মারিতেই যেমন একটা কড়ি বৌ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া যায় অমনি পটুর মুখ অসীম আহ্লাদে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। পরে সে জিতিয়া পাওয়া কড়িগুলি তুলিয়া গেজের মধ্যে পুরিয়া লোভে ও আনন্দে বার বার গেজেটির দিকে চাহিয়া দেখে, সেটা ভর্তি হইতে আর কত বাকি!

কয়েকজন জেলের ছেলে কি পরামর্শ করিল। একজন পটুকে বলিল-আর এক হাত তফাত থেকে তোমায় মারতে হবে ঠাকুর, তোমার হাতে টিপ বেশি!

পটু বলিল-বা রে, তা কেন, টিপ বেশি থাকাটা দোষ বুঝি? তোমরাও জেতো না, আমি তো কাউকে বারণ করিনি।

পরে সে চারদিকে চাহিয়া দেখিল, জেলের ছেলেরা সব একদিকে হইয়াছে। পটু ভাবিল-এত বেশি কড়ি আমি কোনদিন জিতি নি; আজ আর খেলচি নে-খেল্লে কি আর এই কড়ি বাড়ি নিয়ে যেতে পারবো? আবার একহাত বাধা বেশি! সব হেরে যাব!..হঠাৎ সে কড়ির ছোট্ট থলিটি হাতে লইয়া বলিল-আমি এক হাত বেশি নিয়ে খেলবো না, আমি বাড়ি যাচ্ছি।... পরে জেলের ছেলেদের ভাবভঙ্গি ও চোখের নিষ্ঠুর দৃষ্টি দেখিয়া সে নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের কড়ির থলিটি শক্ত মুঠায় চাপিয়া রাখিল।

একজন আগইয়া আসিয়া বলিল—তা হবে না ঠাকুর, কড়ি জিতে পালাবে বুঝি?.সঙ্গে সঙ্গে সে হঠাৎ পিটুর থলিসুন্ধ হাতটা চাপিয়া ধরিল। পটু ছাড়াইয়া লইতে গেল, কিন্তু জোরে পরিল না; বিষণ্নমুখে বলিল-বা-রে, ছেড়ে দাও না। আমার হাত-পিছন হইতে কে একজন তাহাকে ঠেলা মারিল; সে পড়িয়া গেল বটে, কিন্তু কড়ির থলি ছাড়িল না। সে বুঝিয়াছে এইটিই কাড়িবার জন্য ইহাদের চেষ্টা!! পড়িয়া গিয়া সে প্রাণপণে থলিটা পেটের কাছে চাপিয়া রাখিতে গেল; কিন্তু একে সে ছেলেমানুষ, তাহাতে গায়ের জোরও কম, জেলেপাড়ার বলিষ্ঠ ও তাহার চেয়ে বয়সে বড় ছেলেদের সঙ্গে কতক্ষণ যুঝিতে পরিবে! হাত হইতে কড়ির থলিটি অনেকক্ষণ কোন ধারে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল-কড়িগুলি চারিধারে ছত্রাকার হইয়া গেল।

অপু প্রথমটা পটুর দুর্দশায় একটু খুশি না হইয়াছিল তাহা নহে, কারণ সে-ও অনেক কড়ি হারিয়াছে। কিন্তু পটুকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া, বিশেষ করিয়া তাহাকে অসহায় ভাবে পড়িয়া মার খাইতে দেখিয়া তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল, সে ভিড় ঠেলিয়া আগাইয়া গিয়া বলিলছেলেমানুষ। ওকে তোমরা মারচ কেন? বা রে, ছেড়ে দাও-ছাড়ো! পরে সে পটুকে মাটি হইতে উঠাইতে গেল, কিন্তু পিছন হইতে কাহার হাতেব ঘুষি খাইয়া খানিকক্ষণ সে চোখে কিছু দেখিতে পাইল না; তারপর ঠেলা ঠেলিতে সে-ও মাটিতে পড়িয়া গেল।

অপুকেও সেদিন বেদম প্রহার খাইতে হইত নিশ্চয়ই, কারণ তাহার মেয়েলী ধরনের হাতেপায়ে কোন জোর ছিল না, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে নীরেন এই পথে আসিয়া পড়াতে বিপক্ষদল সরিয়া পড়িল। পটুর লাগিয়াছিল খুব বেশি; নীরেন তাহাকে মাটি হইতে উঠাইয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিল। একটু সামলাইয়া লইয়াই সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল-ছড়ানো কড়িগুলার দু'একটি ছাড়া বাকিগুলি অদৃশ্য, প্রায়

কড়ির থলিটি পর্যন্ত। পরে সে অপুর কাছে সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল– অপুদা, তোমার বেশি লাগে নি তো?

এতদূরে ঠিক দুপুরবেলা জেলের ছেলেদের দলে মিশিয়া কড়ি খেলিতে আসিবার জন্য নীরেন দুজনকেই বকিল। সময় কাটাইবার জন্য নীরেন পাড়ার ছেলেদের লইয়া অন্নদা রায়ের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা খুলিয়াছিল, সেখানে গিয়া কাল হইতে পড়িবার জন্য দুজনকেই বার বার বলিল। পটু চলিতে চলিতে শুধুই ভাবিতেছিল–কেমন সুন্দর কড়ির গেজেটা আমার, সেদিন অত করে ছিবাসেব কাছে চেয়ে নিলাম-গেল!! আমি যদি কড়ি জিতে আর না খেলি তা ওদের কি? সে তো আমার ইচ্ছে!…

বাড়ি ঢুকিয়াই অপু দুর্গাকে বলিল-দিদি, শিউলিতলায় গুড়ির কাছে আমি একটা বাঁকা কঞ্চি রেখে গিাইছি, আর তুই বুঝি সেটাকে ভেঙে দুখণ্ড করে রেখেচিস?

দুর্গা সেখানাকে ভাঙিয়াছিল ঠিকই। —আহা, ভাবি তো একখানা বাঁকা-কঞ্চি! তোর যত পাগলামি—বাঁশ-বাগানে খুঁজলে কঞ্চি আর মিলবে না বুঝি। কঞ্চির ভারি অমিল কিনা!

অপু লজ্জিত মুখে বলিল-অমিল না তো কি? তুই এনে দে দিকি ওইরকম একখানা কঞ্চি! আমি কত খুঁজেপেতে নিয়ে আসবো, আর তুই সব ভেঙেচুবে রাখবি।–বেশ তো!

তার চোখে জল আসিয়া গেল।

দুর্গা বলিল-দেবো এখন এনে যত চাস, কান্না কিসের?

বাঁকা-কঞ্চি অপুর জীবনে এক অদ্ভুত জিনিস! একখানা শুকনো, হালকা, গোড়ার দিক মোটা, আগার দিক সরু বাঁকা-কঞ্চি হাতে করিলেই অপুর মন পুলকে শিহরিয়া ওঠে, মনে অদ্ভুত সরু কল্পনা জাগে। একখানা বাঁকা-কঞ্চি হাতে করিয়া একদিন সে সারা সকাল কি বৈকাল আপনমনে বাঁশবনের পথে কি নদীর ধারে বেড়াইয়া বেড়ায়; কখনও রাজপুত্র, কখনও তামাকের দোকানী, কখনও ভ্রমণকারী, কখনও বা সেনাপতি, কখনও মহাভারতের অর্জন-কল্পনা করে ও আপনমনে বিড় বিড় করিয়া কাল্পনিক ঘটনা যাহা ওই অবস্থায় তাহার জীবনে ঘটিলে তাহার আনন্দ হইত, সেই সব ঘটনা বলিয়া যায়। কঞ্চি যত মনের মতো হালকা হইবে ও পরিমাণমতো বাঁকা হইবে, তাহার আনন্দ ও কল্পনা ততই পরিপূর্ণতা লাভ করে; কিন্তু সে রকম কঞ্চি সংগ্রহ করা যে কত শক্ত অপু ত্যাহা বোঝে। কত খুঁজিয়া তবে একখানা মেলে।

অপু যে বাঁকা-কঞ্চি হাতে এরকম করিয়া বেড়ায়, এ কথা কেউ না শুনিতে পারে অপুর সেদিকে অত্যন্ত চেষ্টা। এরূপ অবস্থায় লোকে তাহাকে আপনমনে বকিতে দেখিলে পাগল ভাবিবে বা অন্য কিছু মনে করিবে, এই আশঙ্কায় সে পারতপক্ষে জন-সমাগমপূর্ণ স্থানে অথবা যেদিকে কেহ হঠাৎ আসিয়া পড়িতে পারে, সে সবদিকে না গিয়া নদীর ধারে-নির্জন বাঁশবনেব পথেনিজেদের বাড়ির পিছনে তেঁতুল-তলায় ঘোরে। এ অবস্থায় তাহকে কেহ না দেখে, সেদিকে তাহার অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি! কাচিৎ যদি কেহ আসিয়া পড়ে, তখনই সে জিভ কাটিয়া হাতের কঞ্চিখানা ফেলিয়া দেয়-পাছে কেহ কিছু মনে করে—এজন্য তাহারা ভারি লজ্জা।

কেবল জানে তাহার দিদি। দিদি তাহাকে এ অবস্থায় দু' একবার দেখিয়া ফেলিয়াছিল, কাজেই দিদির কাছে আর লুকাইয়া কি হইবে? তাই সে বাঁকা-কঞ্চির কথা দিদিকে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিল। অন্য লোক হইলে, লজ্জায় অপু কখনই এ কথার উল্লেখ করিতে পারিত না, যদিও কেহই জানে না অপুর সহিত বাঁকা-কঞ্চির কি রহস্যময় সম্পর্ক, তবুও অপুর মনে হয়। সকলেই সেকথা জানে, বলিলেই সকলে তাহাকে পাগল বলিয়া ঠাট্টা করিবে। কে বুঝিবে-একখানা বাঁকা-কঞ্চি হাতে পাইলে, সে না খাইয়া-দাইয়া নদীর ধারে কি কোনো জনহীন বনের পথে কি অপূর্ব আনন্দেই সারাদিন একা একা কাটাইয়া দিতে পারে!...

দিদিকে অনুরোধ করিয়াছিল-মাকে যেন এসব বলিসনে দিদি!...দুর্গা বলে নাই!

সে জানে, অপু একটা পাগল! ভারি মমতা হয় ওর ওপর, ছোট বোকা আদুরে ভাইটা—এসব মাকে বলিয়া কি হইবে?...

মধুসংক্রান্তির ব্রতের পূর্বদিন সর্বজয়া ছেলেকে বলিল-কাল তোদের মাস্টার মশায়কে নেমন্তন্ন করে আসিস–বলিস দুপুর-বেলা এখানে খেতে।

মোটা চালের ভাত, পেঁপের ডালনা, ডুমুরের সুক্তনি, থোড়ের ঘণ্ট, চিংড়ি মাছের ঝোল, কলার বড়া ও পায়েস।

দুর্গাকে তাহার মা পরিবেশন-কার্যে নিযুক্ত করিয়াছে। নিতান্ত আনাড়ি-ভয়ে ভয়ে এমন সন্তর্পণ সে ডালের বাটি নিমন্ত্রিতের সম্মুখে রাখিয়া দিল–যেন তাহার ভয় হইতেছে এখনই কেহ বকিয়া উঠিবে। অত মোটা চালের ভাত নীরোনের খাওয়া অভ্যাস নাই; এত কম তৈলঘৃতেব বান্না তরকারি কি করিয়া লোকে খায় তাহা সে জানে না। পায়েস পানসে-জলমিশানো দুধের তৈরি, একবার মুখে দিয়াই পাযোস-ভোজনের উৎসাহ তাহার অর্ধেক কমিয়া গেল। অপু মহা খুশি ও উৎসাহসহকারে খাইতেছিল;

এত সুখাদ্য তাঁহাদের বাড়িতে দু'একদিন মাত্র হইয়াছে।–আজ তাহার স্মরণীয় উৎসবের দিন!—আপনি আর একটু পায়েস নিন মাস্টার মশায়।. নিজে সে এটা-ওটা বার বার দিদির কাছে চাহিয়া লইতেছিল।

বাড়ি ফিরিলে গোকুলের বউ হাসিমুখে বলিল-দুগগাকে পছন্দ হয়। ঠাকুরপো? দিব্যি দেখতে শুনতে! আহা! গরিবের ঘরের মেয়ে, বাপের পয়সা নেই। কার হাতে যে পড়বে?–সারা জীবন পড়ে পড়ে ভুগবে। তা তুমি ওকে বিয়ে করো না কেন ঠাকুরপো, তোমাদেরই পালটি ঘর-মেয়েও দিব্যি; ভাইবোনের দুজনেরই কেমন বেশ পুতুল-পুতুল গড়ন!...

জরিপের তাঁবু হইতে ফিরিতে গিয়া নীরেন সেদিন গ্রামের পিছনের আমবাগানের পথ ধরিয়াছিল। একটা বনে-ঘেরা সবু পথ বাহিয়া আসিতে আসিতে দেখিল বাগানের ভিতর হইতে একটি মেয়ে সম্মুখের পথের উপরে আসিয়া উঠিতেছে, সে চিনিল।–অপুর বোন দুর্গা। জিজ্ঞাসা করিল–কি খুকি, তোমাদের বাগান বুঝি এইটে?

দুর্গা পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া লজ্জিত হইল, কিছু বলিল না।

পরে সে পথের পাশে দাঁড়াইয়া নীরেনকে পথ ছাড়িয়া দিতে গেল। নীরেন বলিল-না না খুকি, তুমি চল আগে আগে। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালেই হল। ওইদিকে একটা পুকুরের ধারে গিয়ে পড়েছিলাম, তারপর পথ খুজে হয়রান। যে বন তোমাদের দেশে!

দুর্গা যাইতে যাইতে হঠাৎ থামিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া নীরেনের মুখের দিকে চাহিবার চেষ্টা করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার কাপড়ের ভিতর হইতে কিসের ফল গোটাকতক পথের উপর পড়িয়া গেল।

নীরেন বলিল-কি যেন পড়ে গেল খুকি! কিসের ফল ওগুলো?

দুর্গা নিচু হইয়া কুড়াইতে কুড়াইতে সংকুচিতভাবে বলিল-ও কিছু না, মেটে আলু।

–মেটে আলু? খেতে ভালো লাগে বুঝি? কি করে খায়?

এ প্রশ্ন দুর্গার কাছে অত্যন্ত কৌতুহলজনক ঠেকিল। একটি পাঁচ বছরের ছেলে যা জানে, চশমাপরা একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা জানে না! সে বলিল -এ ফল তো খায না, এ তো তেতো।

–তবে তুমি যে—

দুর্গা সলজ্জসুরে বলিল-আমি নিয়ে যাচ্ছি। এমনি-খেলবার জন্যে।... একথা তাহার মনে ছিল যে, এই চশমা-পরা ছেলেটির সঙ্গেই সেদিন খুড়িমা ঠাট্টাচ্ছলে তাহার বিবাহের কথা তুলিয়াছিল। তাহারা ভারি কৌতুহল হইতেছিল, ছেলেটিকে সে ভালো করিয়া দেখে। কিন্তু মধুসংক্রান্তির ব্রতের দিনেও তাহা সে পাবে নাই, আজও পারিল না।

—অপুকে বোলো কাল সকালে যেন বই নিয়ে যায়–বলবে তো?

দুর্গা চলিতে চলিতে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। আর একটু গিয়া পাশেব একটা পথ দেখাইয়া বলিল–এই পথ দিয়ে গেলে আপনাব খুব সোজা হবে।

নীরেন বলিল-আচ্ছা, আমি চিনে যাবো এখন, তোমাকে একটু এগিয়ে দিই। তুমি একলা যেতে পারবে?

দুর্গা আঙুল দিযা দেখাইযা কহিল—ওই তো আমাদেব বাড়ি একটু এগিযে গিয়েই, আমি তো-এইটুকু একলা যাবো এখন। আপনি আর

দুর্গাকে ইহার আগে নীরেন কখনও ভালো করিয়া দেখে নাই,-চোখ দুটির অমনসুন্দর ভাব কেবল দেখিয়াছে ইহারই ভাই অপুব মধ্যে। যেন পল্লীপ্রান্তের নিভৃত চুত-বকুল-বীথির প্রগাঢ় শ্যামস্নিগ্ধতা ডাগর চোখ দুটির মধ্যে অর্ধসুপ্ত রহিয়াছে। প্রভাত এখনও হয় নাই, রাত্রিশেষের অলস অন্ধকার এখনও জড়াইয়া আছে। তবে তাহা প্রভাতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় বটে, -ক'ত সুপ্ত আঁখির জাগরণ, কত কুমারীর ঘাটে যাওয়া, ঘরে ঘরে কত নবীন জাগরণের অমৃত উৎসবজানালায় জানালায় ধূপগন্ধ।

দুর্গা খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া কেমন যেন উসখুসি করিতে লাগিল। নীরেনের মনে হইল সে কি বলিবে মনে করিতে পারিতেছে না। সে বলিল-না খুকি, তোমাকে আর একটু এগিয়ে দিই? চল, তোমাদের বাড়ির সামনে দিয়েই যাই।

দুর্গা ইতস্তত করিতে লাগিল, পরে একটু মুখ টিপিয়া হাসিল। নীরেনের মনে হইল এবার সে কথা বলিবে। পরীক্ষণে কিন্তু দুর্গা ঘাড় নাড়িয়া তাহার সহিত যাইতে হইবে না জানাইয়া দিয়া, বাড়ির পথ ধরিয়া চলিয়া গেল।

দুপুর বেলা। ছাদে কাপড় তুলিতে আসিয়া গোকুলের বউ নীরেনের ঘরের দুয়ারে উঁকি দিয়া দেখিল। গরমে নীরেন বিছানায় শুইয়া খানিকটা এপাশ-ওপাশ করিবার পর, নিদ্রার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, মেজেতে মাদুর পাতিয়া বাড়িতে পত্র লিখিতেছিল।

গোকুলের বউ হাসিয়া বলিল-ঘুমোও নি যে ঠাকুরপো? আমি ভাবলাম ঠাকুরপো ঘুমিয়ে পড়েচে বুঝি, আজ মোচার ঘণ্ট যে বড় খেলে না-পাতেই রেখে এলে, সেদিন তো সব খেয়েছিলে?

–আসুন বৌদি। মোচার ঘণ্টা খাবো কি? বাঙালে কাণ্ড সব; যে ঝাল তাতে খেতে বসে কি চোখে দেখতে পাই-কোনটা ঘণ্ট, কোনটা কি?

গোকুলের বউ ঘরের দুয়ারের গবরাট মাথাটা হেলাইয়া ঠেস দিয়া অভ্যস্তভাবে মুখের নিচু দিকটা আঁচল দিয়া চাপিয়া দাঁড়াইল।

-ইস, ঠাকুরপো, বড় শহুরে চাল দিচ্ছ যে! ওইটুকু ঝাল আর তোমাদের সেখানে কেউ খায় ক্বা-ন্ম?

–মাপ করবেন বৌদি, এতে যদি "ওইটুকু' হয়, তবে আপনাদের বেশিটা একবার খেয়ে না। দেখে আমি এখান থেকে যাচ্ছি নে! যা থাকে কপালে-যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্না! দিন একদিন চক্ষুলজার মায়া কাটিয়ে যত খুশি লঙ্কা।

-ওমা আমার কি হবে! চক্ষুলজার ভয়েই শিল-নোড়ার পাঠ তুলে দিয়ে চুপ করে বসে আছি নাকি ঠাকুরপো? শোনো কথা ঠাকুরপোর-বলে কিনা যাহা বাহান্ন...হাসির চোটে তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। খানিকটা পরে সামলাইয়া লইয়া বলিল-আচ্ছা তোমাদের সেখানে গরম কেমন ঠাকুরপো?

—সেখানে, কোথায়? কলকাতায় না। পশ্চিমে? পশ্চিমের গরম কি রকম সে এখান থেকে কি বুঝতে পারবেন! সে বাংলাদেশে থেকে বোঝা যাবে না। বোশেখ মাসের দিকে রাত্রে কি কেউ ঘরের মধ্যে শূতে পারে? ছাদে বিকেলে জল ধরে ছাদ ঠাণ্ডা করে রেখে তাইতে রাত্রে শূতে হয়।

-আচ্ছা, তোমরা যেখানে থাকো এখান থেকে কতদূর?

—এখান থেকে রেলে প্রায় দু'দিনের রাস্তা। আজ সকালের গাড়িতে মাঝেরপাড়া স্টেশনে চড়লে কাল দুপুর-রাত্রে পৌছানো যায়।

–আচ্ছা ঠাকুরপো, শুনিচি নাকি গয়াকাশীর দিকে পাহাড় কেটে রেল নিয়ে গিয়েচে- সত্যি?

–সত্যি। অনেক বড় বড় পাহাড়, ওপরে জঙ্গল—তার ভেতর দিয়ে যখন রেলগাড়ি যায়। — একেবারে অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না, গাড়ির মধ্যে আলো জ্বলে দিতে হয়।

গোকুলের বউ উৎসুকভাবে বলিল-আচ্ছা, ভেঙে পড়ে না?

–ভেঙে পড়বে কেন বৌদি? বড় বড় এঞ্জিনিয়ারে সুড়ঙ্গ তৈরি করেচে, কত টাকা খরচ করেচে, ভাঙলেই হল! এ কি আপনাদের রায়পাড়ার ঘাটের ধাপ যে দু' বেলা ভাঙচে?

এঞ্জিনিয়ার কোন জিনিস গোকুলের বউ তাহা বুঝিতে পারিল না। বলিল-পাহাড়টা মাটির না পাথরের?

–মাটিরও আছে, পাথরেরও আছে। নাঃ বৌদি, আপনি একেবারে পাড়াগোঁয়ে। আচ্ছা! আপনি রেলগাড়িতে কতদূর গিয়েছেন?

গোকুলের বউ আবার কৌতুকের হাসি হাসিয়া উঠিল। চোখ প্রায় বুজিয়া মুখ একটুখানি উপরের দিকে তুলিয়া ছেলেমানুষের ভঙ্গিতে বলিল-ওঃ, ভারি দূর গিঁইচি, একেবারে কাশী গয়া মক্কা গিইচি! সেই ও-বছর পিসশাশুড়ি আর সতুর মা'র সঙ্গে আড়ংঘাটার যুগলকিশোর দেখতে গিইছিলাম। সেই আমার জন্মের মধ্যে কর্ম্ম– রেলগাড়িতে চড়া!

এই মেয়েটি অল্পক্ষণের মধ্যেই সামান্য সূত্র ধরিয়া তাহার চারিপাশের এমন একটা হাসিকৌতুকের জাল বুনিতে পারে-যাহা নীরেনের ভারি ভালো লাগে। যে ধরনের লোকের মনের মধ্যে আনন্দের এমন অফুরন্ত ভাণ্ডার থাকে, যার কারণে অকারণে অন্তর্নিহিত আনন্দের উৎস মনের পত্র উপচাইয়া পড়িয়া অপরকেও সংক্রামিত করিয়া তোলে, এই পল্লীবধুটি সেই দলের একজন আজকাল নীরেন মনে মনে ইহারই আগমনের প্রতীক্ষা করে– না আসিলে নিরাশ হয়, এমন কি যেন একটু গোপনু অভিমানও হইয়া থাকে।

-আচ্ছা বৌদি, আপনাদের সবাই চলুন, একবার পশ্চিমে সব বেড়িয়ে নিয়ে আসি।

-এ বাড়ির লোকে বেড়াতে যাবে পশ্চিম! তুমিও যেন ঠাকুরপো! তাহলে উত্তর মাঠের বেগুন-ক্ষেতে চৌকি দেবে কে?

কথার শেষে সে আর একদফা ব্যঙ্গমিশ্রিত কৌতুকের হাসি হাসিয়া উঠিল। একটু পরে গম্ভীর হইয়া নিচু সুরে বলিল-দ্যাখো ঠাকুরপো, একটা কথা রাখবে?

–কি কথা বলুন আগে?

—যদি রাখো তো বলি!

-ও সাদা কাগজে সই করা আমার দ্বারা হবে না, বৌদি! জানেন তো আইনপড়ি। আগে কথাটা শুনবো, তারপর কথার উত্তর দেবো।

গোকুলের বউ দুয়ার ছাড়িযা ঘরের মধ্যে আসিল। কাপড়ের ভিতর হইতে একটা কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া বলিল-এই মাকড়ি দুটো রেখে আমায় পাঁচটা টাকা দেবে?

নীরেন বিস্ময়ের সুরে বলিল-কেন বলুন তো?

-সে এখন বলবো না। দেবে ঠাকুরপো?

–আগে বলুন টাকা দিয়ে কি হবে? নইলে কিন্তু—

গোকুলের বৌ নিম্নসুরে বলিল-আমি এক জায়গায় পাঠাবো। দ্যাখো তো এই চিঠিখানার ওপরের ঠিকানাটা ইংরিজিতে কি লেখা আছে!

নীবেন পড়িয়া বলিল-আপনার ভাই, না বৌদি?

—চুপ চুপ, এবাড়ির কাউকে বোলো না যেন। পাঁচটা টাকা চেয়ে পাঠিয়েচে, কোথায পাবো ঠাকুরপো, কি রকম পরাধীন জানো তো? তাই ভাবলাম এই মাকড়ি দুটো-টাকা পাঁচটা দাও গিযে ঠাকুরপো-হতভাগা ছোঁড়াটির কি কেউ আছে ভূভারতে?...গোকুলের বউ-এবা গলাব স্বর চোখের জলে ভারী হইয়া উঠিল।

নীরেন বলিল-টাকা আমি দেবো বৌদি, পাঁচটা হয় দশটা হয়, আপনি যখন হয় শোধ দেবেন; কিন্তু মাকড়ি আমি নিতে পারবো না

গোকুলের বউ কৌতুকের ভঙ্গিতে ঘাড় দুলাইয়া হাসিমুখে বলিল—তা হবে না ঠাকুরপো, বাঃ বেশ তো তুমি! তারপর আমি তোমার ঋণ রেখে মরে যাই আর তুমি-সো হবে না, ও তোমায় নিতেই হবে। আচ্ছ। যাই ঠাকুরপো, নিচে অনেক কাজ পড়ে রয়েচে–

সে দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, কিন্তু সিঁড়ির কাছ পর্যন্ত গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় নিম্নস্বরে বলিল-কিন্তু টাকার কথা যেন কাউকে বোলো না ঠাকুরপো! কাউকে না–বুঝলে?

দুর্গা কাঁথার তলা হইতে অত্যন্ত খুশির সহিত ডাকিল।–অপু, ও অপু!

অপু জাগিয়াই ছিল, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন কথা বলে নাই। বলিল-দিদি, জানালাটা বন্ধ করে দিবি? বড় ঠাণ্ডা হাওয়া আসচে।

দুর্গা উঠিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল-রানুর দিদির বিয়ে কবে জানিস? আর কিন্তু বেশি দেরি নেই। খুব ঘটা হবে, ইংরিজি বাজনা আসবে। দেখিচিস্তুই ইংরিজি বাজনা?

-হ্যাঁ, সব মাথায় টুপি পরে বাজায়, এই বড় বড় বাঁশি-মস্ত বড় ঢাক, আমি দেখেচি-আর একরকম বাঁশি বাজায়, কালো কালো, অত বড় নয়, ফুলেট বাঁশি বলে–এমন চমৎকার বাজে! ফুলোট বাঁশি শুনিচিস?

দুর্গা আর একটা কথা ভাবিতেছিল।

কাল সে বৈকালে ওপাড়ার খুড়িমার কাছে বেড়াইতে যায়। একথা-সেকথার পর খুড়িমা জিজ্ঞাসা করিল, দুগগা, তোর সঙ্গে ঠাকুরপোর কোথায় দেখা হয়েছিল রে?

সে বলিল-কেন খুড়িমা?… পরে সে সেদিনের কথা বলিল। কৌতুকের সুরে বলিল, পথ হারিয়ে খুড়িমা ওতেই-একেবারে গড়ের পুকুর-সেই বনের মধ্যে

খুড়িমা হাসিয়া বলিল-আমি কাল ঠাকুরপোকে বলছিলাম তোর কথা-বলছিলামগরিবের মেয়ে ঠাকুরপো, কিছু দেবার থোবার সাধ্যি তো নেই বাপের-বড্ড ভালো মেয়ে-যেন একালেরই মেয়ে না।–তা। ওকে নাওগে না? তাই ঠাকুরপো তোর কথা-টথা জিজ্ঞেস করছিলবল্লে, ঘাটের পথে সেদিন কোথায় দেখা হল-পথ ভুলে ঠাকুরপো কোথায় গিয়ে পড়েছিল–এই সব। তারপর আমি আজ তিনদিন ধরে বলচি শ্বশুর-ঠাকুরকে দিয়ে তোর বাবাকে বলবো। ঠাকুরপোর যেন মত আছে মনে হল, তোকে যেন মনে লেগেচে

দুর্গা গোয়াল হইতে বাছুর বাহির করিয়া রৌদ্রে, বাঁধিল বটে, কিন্তু অন্যদিন বাড়ির কাজ তবু তো যাহোক কিছু করে, আজ সে ইচ্ছা তাহার মোটেই হইতেছিল না। এক-

একদিন, তাহার এরকম মনের ভাব হয়; সেদিন সে কিছুতেই বাড়ির গণ্ডিতে আটকাইয়া থাকিতে পারে না-কে তাহাকে পথে পথে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। আজ যেন হাওয়াটা কেমন সুন্দর, সকালটা নাগরম-না-ঠাণ্ডা, কেমন মিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায় লেবু ফুলের—যেন কি একটা মনে আসে, কি তাহা সে বলিতে পারে না।

বাড়ির বাহির হইয়া সে রানুদের বাড়ি গেল। ভুবন মুখুজ্যে অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, এই তার প্রথম মেয়ের বিবাহ, খুব ঘটা করিয়াই বিবাহ হইবে। বাজিওয়ালা আসিয়া বাজির দরদস্তুর করিতেছে। সীতানাথ ও-অঞ্চলের বিখ্যাত রসুনাচৌকি বাজিয়ে, তাহারও বায়না হইয়াছে, বিবাহ উপলক্ষে নানাস্থান হইতে কুটুম্বের দল আসিতে শুরু করিয়াছে। তাহাদের ছেলেমেয়েতে বাড়ির উঠান সরগরম। দুর্গার মনে ভারি আনন্দ হইল-আর দিনকতক পরে ইহাদেরই বাড়িতে কত বাজি পুড়িবে। সে কোনো বাজি কখনও দেখে নাই, কেবল একবার গাঙ্গুলি বাড়ির ফুলদোলে একটা কি বাজি দেখিয়াছিল, হুস করিয়া আকাশে উঠিয়া একেবারে যেন মেঘের গায়ে গিয়া ঠেকে, সেখান হইতে আবার পড়িয়া যায়, এমন চমৎকার দেখায়! অপু বলে, হাউই বাজি।

দুপুরের পর মা দালানে আঁচল বিছাইয়া একটু ঘুমাইয়া পড়লে, সে সুড়ুৎ করিয়া পুনরায় বাড়ির বাহির হইল। ফাল্গুনের মাঝামাঝি, রৌদ্রের তেজ চড়িয়াছে, একটানা তপ্ত হাওয়ায় রানুদের বাগানের বড় নিমগাছটার হলদে পাতাগুলো ঘুরিতে ঘুরিতে ঝরিয়া পড়িতেছে-কেহ কোনদিকে নাই, নেড়াদের বাড়ির দিকে কে যেন একটা টিন বাজাইতেছে। বু-উ-উ-উ করিয়া কি একটা শব্দ হইল। কঁচপোকা! দুর্গা নিজের অনেকটা অজ্ঞাতসারে তাড়াতাড়ি আঁচল মুঠার মধ্যে পাকাইয়া চকিত দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল।

কাঁচপোকা নয়, সুদর্শন পোকা।

তাহার মুঠার আঁচল আপনা-আপনি খুলিয়া গেল—আগ্রহের সহিত পা টিপিয়া টিপিয়া সে পোকাটার দিকে আসিতে লাগিল। সামনের পথের উপর বসিয়াছে, পাখ্যার উপর শ্বেত ও রক্ত চন্দনের ছিটার মতো বিন্দু বিন্দু দাগ।

সুদর্শন পোকা-ঠিক পোকা নয়—ঠাকুর। দেখিতে পাওয়া অত্যন্ত ভাগ্যের কাজ-তাহার মোর মুখে, আরও অনেকের মুখে সে শুনিয়াছে। সে সন্তর্পণে ধুলার উপর বসিয়া পড়িল, পরে হাত একবার কপালে ঠেকাইয়া আর একবার পোকার কাছে লইয়া গিয়া বার বার দ্রুতবেগে আবৃত্তি করিতে লাগিল—সুদর্শন, সুভালাভালি রেখো…সুদর্শন, সুভালাভালি দেখো…সুদর্শন, সুভালাভালি রেখো (অবিকল এইরূপই সে অপরের মুখে বলিতে শুনিয়াছে)। পরে সে নিজের কিছু কথা মন্ত্রের মধ্যে জুড়িয়া

দিল–অপুকে ভালো রেখো, মাকে ভালো রেখো, বাবাকে ভালো রেখো, ওপাড়ার খুড়িমাকে ভালো রেখো-পরে একটু ভাবিয়া ইতস্তত করিয়া বলিল-নীরেনবাবুকে ভালো রেখো, আমার বিয়ে যেন ওখানেই হয়। সুদর্শন, রানুর দিদির মতো বাজিবাজনা হয়।

ভক্তের অর্ঘ্যের আতিশয্যে পোকাটা ধুলার উপর বিপন্নভাবে চক্রাকারে ঘুরিতেছিল, দুর্গা মনের সাধ মিটাইয়া প্রার্থনা শেষ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত পাশ কাটাইয়া গেল।

পাড়ার ভিতরকার পথে পথে মাথার উপর প্রথম ফাল্গুনের সুনীল, এমন কি অনেকটা ময়ুরকণ্ঠী রং-এর আকাশ গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে।

শ্যাওড়া বনের মাঝখান দিয়া নদীর ঘাটের সরু পথ। স্টুড়ি পথের দুধারেই আমবাগান। তপ্ত বাতাস আল-বাউলের মিষ্ট গন্ধে, বনে বনে মৌমাছি ও কাঁচপোকার গুঞ্জনরবে, ছায়াগহন আমবনে কোকিলের ডাকে, স্নিগ্ধ হইয়া আসিতেছে।

বাগানগুলি পার হইয়া চড়কতলার মাঠ। ঘাসে-ভরা মাঠে ছায়া পড়িয়া গিয়াছে। দুর্গা ঝোপের মধ্যে মধ্যে সেয়াকুল খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল-সেঁয়াকুল এখন আর বড় থাকে না, শীতের শেষে ঝরিয়া যায়। ওই উঁচু ঢিবিতে ঝোপের মধ্যের একটা গাছে অনেক সেয়াকুল সেদিনও তো সে খাইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখন আর নাই, সব ঝরিয়া গিয়াছে, গোলমরিচের মতো শুকনা সেয়াকুল ঘন ঝোপের তলা বিছাইয়া পড়িয়া আছে। এক ঝাক শালিক পাখি ঝোপের মধ্যে কিছু কিচু করিতেছিল, দুর্গা নিকটে যাইতে উড়িয়া গেল।

তাহার মনে খুশির আবার একটা প্রবল ঢেউ আসিল। উৎসবের নৈকট্য, রানুর দিদিব বাসরে রাত জাগা ও গান শুনিবার আশা

খুশিতে তাহার ইচ্ছা হইল সে মাঠের এধাব হইতে ওধার পর্যন্ত ছুটিয়া বেড়ায়।

একবার সে হাত দুটা ছড়াইয়া ডানার মতো লম্বা করিয়া দিয়া খানিকটা ঘুরপাক খাইযা খানিকটা ছুটিয়া গেল। সে উড়িতে চায়!..শরীর তো হালকা জিনিস-হাত ছড়াইয়া ডানার মতো বাতাস কাটিতে কাটিতে যদি যাওয়া হইত!

শুধু শব্দ করিবার আনন্দে সে শূকনো ঝবাপাতার রাশির উপর ইচ্ছা করিয়া জোরে জোরে পা ফেলিয়া মাচু মচু শব্দ করিতে করিতে চলিল। পাতা ভাঙিয়া গিয়া শুকনা শুকনা ধূলা মিশানো, খানিকটা সোদা সোদা খানিকটা তিক্ত গন্ধে জায়গাটা ভরিয়া গেল।

সামনে একটু দূরে সোনাডাঙার মাঠের দিকে যাইবার কাঁচা সড়ক। একখানা গরুর গাড়ি ক্যাঁচু ক্যাঁচু শব্দে মাঠের পথের দিকে যাইতেছে। টাটকা কাটা কঞ্চির ঘেরা বাঁধিযা তাহার উপর কাঁথা ও ছেড়া লাল নকশাপাড় কাপড় ঘিরিয়া ছাই তৈয়ারি করিয়াছে। ছাঁই-এর মধ্যে কাহাদের একটা ছোট মেয়ে একঘেয়ে, একটানা ছেলেমানুষ ধরনে কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছে-কোন গায়ের চাষাদের মেয়ে বোধ হয় বাপের বাড়ি হইতে শ্বশুরবাড়ি চলিয়াছে।

দুর্গা অবাক হইয়া একদৃষ্টি গাড়িখানার দিকে চাহিয়া রহিল।

বিয়ের পর মা, বাবা, অপু-সব ছাড়িয়া এই রকম কোথায় কতদূরে চলিয়া যাইতে হইবে হয়তো-যখন তখন সেখান হইতে তাহারা আসিতে দিবে কি? সে এতক্ষণ একথা ভাবিয়া দেখে নাই—এই বাগান, বাসকফুলের ঝাড়, রান্তী গাইটা, উঠানের কাঁঠালতলাটা যাহা সে এত ভালোবাসে, এই শূকনো পাতার গন্ধ, ঘাটের পথ এইসব ছাড়িয়া যাইতে হইবে চিরকালের জন্য! ছই-এর মধ্যের ছোট্ট মেয়েটা বোধ হয় সেই দুঃখেই কাঁদিতেছে।

কাঁচা সড়কটা ছাড়াইয়া আর একটা ছোট্ট পোড়ো মাঠ পার হইলেই নদী।

ওপারের জেলেরা কি মাছ ধরিতেছে? খয়রা? এপারে আসিলে দু' পয়সার মাছ কিনিয়া বাড়ি লইয়া যাইত। অপু খয়রা মাছ খাইতে বড় ভালোবাসে।

বাড়ি ফিরিয়া সন্ধ্যার পর সে অনেকক্ষণ ধরিয়া পুতুলের বাক্স গোছাইল। ঘরের মেঝেতে তাহার মা তেল পুরিতে গিয়া অনেকটা কেরোসিন তেল ফেলিয়া দিয়াছে, তাহার গন্ধ বাহির হইতেছে, হাওয়াটা যেন একটু গরম। পুতুল-গুছানো প্রায় শেষ হইয়াছে, অপু আসিয়া বলিল-তুই, বুঝি আমার বাক্স থেকে ছোট্ট আরশিখানা বের করে নিয়েচিস দিদি?

–হুঁ-আরশি তো আমার-আমিই তো আগে দেখতে পেয়েছিলাম, তক্তপোশের নিচে পড়েছিল। যাও, আমি আরশি আমার বাক্সে রাখবো। বেটা ছেলে আবার আরশি নিয়ে কি হবে?

—বা রে, তোমার আরশি বই কি? ও-পাড়ার খুড়িমাদের বাড়ি থেকে মা তো কি বের্তোতে আরশি এনেছিল, আমি তো আগেই মা'র কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলাম। না দিদি, দাও

কথা শেষ করিয়াই সে দিদির পুতুলের বাক্সের কাছে বসিয়া পড়িয়া তাহার মধ্যে আরশি খুঁজিতে লাগিল।

দুর্গা ভাইয়ের গালে এক চড় লাগাইয়া দিয়া বলিল-দুন্‌টু কোথাকার-আমি পুতুল গুছিয়ে রাখচি আর উনি হাণ্‌ডুল-পাণ্‌ডুল করছেন- যা আমার বাক্সে হাত দিতে হবে না তোমায়-দোবো না আমি আরশি।

কিন্তু কথা শেষ না হইতেই অপু ঝাপাইয়া তাহার ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহার বৃক্ষ চুলের গোছা ধরিয়া টানিয়া আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। কান্না আটকানো গলায় বলিতে লাগিল-কেন তুমি আমাকে মারবে? আমার লাগে না বুঝি?–দাও আমায়া-মাকে বোলে দেবো-লক্ষ্মীর চুপড়ি থেকে আলতা চুরি কোরেচ–

আলতা চুরির কথায় দুর্গা ক্ষেপিয়া গেল। ভাই-এর কান ধরিয়া তাহাকে কঁকুনি দিয়া উপরি উপরি পটাপট কয়েকটা চড় দিতে দিতে বলিল-আলতা নিইচি?-আমি আলতা নিইচি, লক্ষ্মীছাড়া দুষ্ট বাঁদর! আর তুমি যে লক্ষ্মীর চুপড়ির থেকে কড়িগুলো খুলে লুকিয়ে রেখেচ, মাকে বলে দেবো না?

চিৎকার, কান্না ও মারামারির শব্দ শুনিয়া সর্বজয়া ছুটিয়া আসিল।

ততক্ষণে দুর্গা অপুর কান ধরিয়া তাহাকে মাটিতে প্রায় শোয়াইয়া ফেলিয়াছে।–অপুও প্রাণপণে দুর্গার চুলের গোছা মুঠি পাকাইয়া টানিয়া এরূপ ধরিয়া আছে, যে দুর্গার মাথা তুলিবার ক্ষমতা নাই।

অপুর লাগিয়াছিল বেশি। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল-দ্যাখো না মা, আমার আরশিখানা বাক্স থেকে বের করে নিজের বাক্সে রেখে দিয়েচে-দিচ্ছে না-এমন চড় মেরেচে। গালে–

দুর্গা প্রতিবাদ করিয়া বলিল-না মা, দ্যাখো না আমার পুতুলের বাক্স গোছাচ্ছি, ও এসে সেগুলো সব–

সর্বজয়া আসিয়া মেয়ের পিঠের উপর দুম দুম করিয়া সজোরে কয়েকটি কিল বসাইয়া দিয়া বলিল-ধাড়ি মেয়ে-কেন তুই ওর গায়ে হাত দিবি যখন তখন?-ওতে আর তোতে অনেক তফাৎ জনিস?—আরশি-আরশি তোমার কোন পিণ্ডিতে লাগবে শুনি? কথায় কথায় উনি যান ওকে তেড়ে মারতে। মরণ আর কি! পুতুলের বাক্স-রোসো–

কথা শেষ না করিয়াই সে মেয়ের গুছানো পুতুলের বাক্স উঠাইয়া একটান মারিয়া বাহির উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

-ধাড়ি মেয়ের কোনো কাজ নেই, কেবল খাওয়া আর পাড়ায় পাড়ায় টো টো করে বেড়ানো-আর কেবল পুতুলের বাক্স আর পুতুলের বাক্স! ও সব টেনে এক্ষুনি বাঁশবাগানে ফেলে দিয়ে আসচি। দিচ্চি তোমার খেলা ঘুচিয়ে একেবারে–

দুর্গার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। পুতুলের বাক্স তাহার প্রাণ, দিনের মধ্যে দশবার সে পুতুলের বাক্স গোছায়া-পুতুল, রাংতা, ছোপানো কাপড়, আলতা, কত কষ্টের সংগ্রহ করা নাটফল, টিনমোড়া আরশিখানা, পাখির বাসা-সব অন্ধকার উঠানের মধ্যে কোথায় কি ছড়াইয়া পড়িল। মা যে তাহার পুতুলের বাক্স এরূপ নির্মমভাবে ফেলিয়া দিতে পারে, একথা কখনও সে ভাবিতে পারিত না! কত কষ্টে কত জায়গা হইতে জোগাড় করা কত জিনিস উহার মধ্যে!

কোনো কথা বলিতে সাহস না করিয়া সে কেমন অবাক হইয়া রহিল।

অপুর কাছেও বোধ হয় শাস্তিটা কিন্তু বেশি কঠোর বলিয়াই ঠেকিল। সে আর কোনো কথা না বলিয়া চুপচাপ গিয়া শুইয়া পড়িল।

রাত্রি অনেক হইয়াছে, মেজেতে কেরোসিন তেলের গন্ধ বাহির হইতেছে, ঘরের মধ্যে বাঁশবাগানের মশা বিন বিনা করিতেছে। খানিকক্ষণ বসিয়া বসিয়া দুর্গা গিয়া চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল।

ভাঙা জানোলা দিয়া ফাগুন জ্যোৎস্নার আলো বিছানায় পড়িয়াছে, পোড়ো ভিটার দিক হইতে ভুর ভুর করিয়া লেবু ফুলের গন্ধ আসিতেছে।

একবার তাহার মনে হইল উঠিয়া গিয়া পুতুলের বাক্সট ও ছড়ানো জিনিসগুলা তুলিয়া আনে-কাল সকালে কি আর পাওয়া যাইবে? কত কষ্টের জিনিসগুলা! কিন্তু সাহস পাইল না। আনিতে গেলে মা যদি আবার মারে?

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। হঠাৎ সে গায়ের উপর কাহার হাত অনুভব করিল। অপু ভয়ে ভায়ে ডাকিল-দিদি? দুর্গা কোনো জবাব দিবার পূর্বেই অপু বালিশে মুখ গুজিয়া হাউ হাউ কবিয়া কঁদিয়া উঠিল-আমি আর করবো না-আমার ওপর রাগ করিসনে দিদি-তোর পায়ে পড়ি। কান্নাব আবেগে তাহার গলা আটকাইয়া যাইতে লাগিল।

দুর্গা প্রথমটা বিস্মিত হইল-পরে সে উঠিয়া বসিয়া ভাইয়ের কান্না থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল-কাঁদিসনে, চুপ চুপ, মা শুনতে পেলে আবার আমায় বকবে, চুপ, কঁদতে নেই-আচ্ছা! আমি রাগ করবো না, কেঁদে না ছিঃ-চুপ–

তাহার ভয় হইতেছিল অপুর কান্না শুনিলে মা আবাব হয়তো তাহাকেই মারিাবে।

অনেক করিয়া সে ভাইয়ের কান্না থামাইল। পরে শুইয়া শুইয়া তাহাকে নানান গল্প, বিশেষত রানুর দিদির বিয়ের গল্প বলিতে লাগিল। একথা-ওকথাব পর অপু দিদিব গায়ে হাত দিয়া চুপি চুপি বলিল-একটা কথা বলবো দিদি?–তোর সঙ্গে মাস্টার মশায়ের বিয়ে হবে। —

দুর্গার লজ্জা হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অত্যন্ত কৌতূহলও হইল; কিন্তু ছোট ভাই-এর কাছে এ সম্বন্ধে কোনো কথাবার্তা বলিতে তাহার সংকোচ হওয়াতে সে চুপ করিয়া রহিল।

অপু আবার বলিল—খুড়িমা বলছিল রানুর মায়ের কাছে আজ বিকালে। মাস্টার মশায়ের নাকি অমত নেই–

কৌতুহলের আবেগে চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সে তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল— হ্যাঁ বলছিল-যাঃ-তোর সব যেমন কথা–

অপু প্রায় বিছানায় উঠিয়া বসিল,—সত্যি বলচি দিদি, তোর গা ছুঁয়ে বলচি। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে, আমাকে দেখেই তো কথা উঠল। বাবাকে দিয়ে পত্তর লেখাবে সেই মাস্টার মশায়ের বাবা যেখানে থাকেন সেখানে–

–মা জানে?

—আমি এসে মাকে জিজ্ঞেস করবো ভাবলাম-ভুলে গিইচ। জিজ্ঞেস করবো দিদি মা বোধ হয় শোনে নি; কাল খুড়িমা মাকে ডেকে নিয়ে বলবে বলছিল–

পরে সে বলিল-তুই কত রেলগাড়ি চড়বি দেখিস, মাস্টার মশাইরা থাকেন। এখান থেকে অনেক দূরে-রেলে যেতে হয়–

দুর্গা চুপ করিয়া রহিল।

সে রেলগাড়ির ছবি দেখিয়াছে।–অপুর একখানা বইয়ের মধ্যে আছে। খুব লম্বা, অনেকগুলো চাকা, সামনের দিকে কল, সেখানে আগুন দেওয়া আছে, ধোঁয়া ওড়ে। রেলগাড়িখানা আগাগোড়া লোহার, চাকাও তাই-গরুর গাড়ির মতো কাঠের চাকা নয়। রেল লাইনের ধারে কোনো খড়ের বাড়ি নাই, থাকিতে পারে না, পুড়িয়া যায়। রেলগাড়ি যখন চলে তখন তাহার নল হইতে আগুন বাহির হয়। কিনা! সে ভাই-এর গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল-তোকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। তাহার পর দুজনেই চুপ করিয়া

ঘুমাইবার জোগাড় করিল। ঘুমাইতে গিয়া একটা কথা বার বার দুর্গার মনে হইতেছিল–ঠাকুর সুদর্শন তাহার কথা শুনিয়াছেন! আজই তো সুদর্শনের কাছে সে-ঠাকুরের বড় দয়া-মা তো ঠিক কথা বলে!

অপু বলিল-লীলাদির জন্যে কেমন চমৎকার শাড়ি কেনা হযোচে, আজ লীলাদির কাকা বিয়ের জন্যে কিনে এনেচে রানাঘাট থেকে, সেজ জেঠিমা বললে-বালুচরের শাড়ি–

দুর্গা হাসিমুখে বলিল–একটা ছড়া জানিস?...পিসি বলতো,

বালুচরের বালুর চরে একটা কথা কই–
মোষের পেটে ময়ুরছানা দেখে এলাম সই।

# ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

অপু কাউকে একথা এখনও বলে নাই।–তাহার দিদিকেও না।

সেদিন চুপি চুপি দুপুরে সে যখন তাহার বাবার ওই বই-বোঝাই কাঠের সিন্দুকটা লুকাইয়া খুলিয়াছিল, সিন্দুকটার মধ্যে একখানা বই-এর মধ্যেই এই অদ্‌ভুত কথাটার সন্ধান পাইয়াছে!

উঠানের উপর বাঁশঝাড়ের ছায়া তখন পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ হয় নাই, ঠিক-দুপুরে সোনাডাঙার তেপান্তর মাঠের সেই প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের ছায়ার মতো এক জায়গায় একরাশ ছায়া জমাট বাধিয়া ছিল।

একদিন সে দুপুরবেলা বাপের অনুপস্থিতিতে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া চুপি চুপি বই-এর বাক্সটা লুকাইয়া খুলিল। অধীর আগ্রহের সহিত সে এ-বই ও-বই খুলিয়া খানিকটা করিয়া ছবি দেখিতে এবং খানিকটা করিয়া বই-এর মধ্যে ভালো গল্প লেখা আছে কি না দেখিতে লাগিল। একখানা বই-এর মলাট খুলিয়া দেখিল নাম লেখা আছে সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ। ইহার অর্থ কি, বইখানা কোন বিষয়ের তাহা সে বিন্দুবিসর্গও বুঝিল না। বইখানা খুলিতেই একদল কাগজ-কাটা পোকা নিঃশব্দে বিবর্ণ মার্বেল কাগজের নিচে হইতে বাহির হইয়া উধর্বশ্বাসে যেদিকে দুই চোখ যায় দৌড় দিল। অপু বইখানা নাকের কাছে লইয়া গিয়া ঘ্রাণ হইল, কেমন পুরানো গন্ধ! মেটে রঙের পুরু পুরু পাতাগুলোর এই গন্ধটা তাহার বড় ভালো লাগে-গন্ধটায় কেবলই বাবার কথা মনে করাইয়া দেয়। যখনই এ গন্ধ সে পায় তখনই কি জানি কেন তাহার বাবার কথা মনে পড়ে।

অত্যন্ত পুরানো মার্বেল কাগজের বাধাই করা মলাটের নানাস্থানে চটা উঠিয়া গিয়াছে। এই পুরানো বই-এর উপরই তাহার প্রধান মোহ। সেজন্য সে বইখানা বালিশের তলায় লুকাইয়া রাখিয়া অন্যান্য বই তুলিয়া বাক্স বন্ধ করিয়া দিল।

লুকাইয়া পড়িতে পড়িতে এই বইখানিতেই একদিন সে পড়িল বড় অদ্‌ভুত কথোটা! হঠাৎ শুনিলে মানুষ আশ্চর্য হইয়া যায় বোট-কিন্তু ছাপার অক্ষরে বইখানার মধ্যে এ কথা লেখা আছে, সে পড়িয়া দেখিল। পারদের গুণ বর্ণনা করিতে করিতে লেখক লিখিয়াছেন-শকুনির ডিমের মধ্যে পারদ পুরিয়া কয়েকদিন রৌদ্রে রাখিতে হয়, পরে সেই ডিম মুখের ভিতর পুরিয়া মানুষ ইচ্ছা করিলে শূন্যমার্গে বিচরণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

অপু নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না,-আবার পড়িল-আবার পড়িল।

পরে নিজের ডালাভাঙা বাক্সটার মধ্যে বইখানা লুকাইয়া রাখিয়া বাহিরে গিয়া কথাটা ভাবিতে ভাবিতে সে অবাক হইয়া গেল।

দিদিকে জিজ্ঞাসা করে-শকুনিরা বাসা বঁধে কোথায় জানিস দিদি?

তাহার দিদি বলিতে পারে না। সে পাড়ার ছেলেদের-সতু, নীলু, কিনু, পটল, নেড়াসকলকে জিজ্ঞাসা করে। কেউ বলে সে এখানে নয়; উত্তর মাঠে উঁচু গাছের মাথায়। তাহার মা বকে—এই দুপুরবেলা কোথায় ঘুরে বেড়াস! অপু ঘরে ঢুকিয়া শুইবার ভান করে, বইখানা খুলিয়া সেই জায়গাটা আবার পড়িয়া দেখে-আশ্চর্য! এত সহজে উড়িবার উপায়টা কেউ জানে না? হয়তো এই বইখানা আর কাহারও বাড়ি নাই, শুধু তাহার বাবারই আছে; হয়তো এই জায়গাটা আর কেহ পড়িয়া দেখে নাই, শুধু তাহারই চোখে পড়িয়াছে এতদিনে।

বইখানার মধ্যে মুখ গুজিয়া আবার সে আঘাণ লয়-সেই পুরানো পুরানো গন্ধটা! এই বইয়ে যাহা লেখা আছে, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোন অবিশ্বাস থাকে না।

পারদের জন্য ভাবনা নাই-পারদ মানে পারা সে জানে। আয়নার পেছনে পারা মাখানো থাকে, একখানা ভাঙা আয়না বাড়িতে আছে, উহা জোগাড় করিতে পরিবে এখন। কিন্তু শকুনির ডিম এখন সে কোথায় পায়?

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে এক একদিন তাহার দিদি ডাকে-আয় শোন অপু, মজা দেখবি আয়। পরে সে একমুঠো পাতের ভাত লইয়া বাড়ির খিড়কি-দোরের বাঁশবাগানে গিয়া হ্যাঁক দেয়আয় ভুলো-তু-উ-উ-উ। ডাক দিয়াই দুর্গা ভাইয়ের দিকে হাসি হাসি মুখে চুপ করিযী চাহিয়া থাকে, যেন কি অপূর্ব রহস্যপুরীর দুয়ার এখনই তাঁহাদের চোখের সামনে খুলিয়া যায়! হঠাৎ কোথা হইতে কুকুরটা আসিয়া পড়িতেই দুর্গা হাত তুলিয়া বলিয়া উঠে-ওই এসেচে! কেথেকে এলো দেখলি?– খুশিতে সে হিহি। করিয়া হাসে।

রোজ রোজ এই কুকুরকে ভাত খাওয়ানোর ব্যাপারে দুর্গার আমোদ হয় ভারি।–তুমি হ্যাঁক দেও, কেউ কোথাও নাই, চারিদিকে চুপ! ভাত মাটিতে নামাইয়া দুর্গা চোখ বুজিয়া থাকে, আশা ও কৌতুহলের ব্যাকুলতায় বুকের মধ্যে টিপচিপ করে; মনে মনে ভাবে-আজ ভুলো আসবে না বোধ হয়, দেখি দিকি কোথেকে আসে। আজ কি আর শুনতে পেয়েছে।–

হঠাৎ ঘন ঝোপে একটা শব্দ ওঠে—

চক্ষের নিমেষে বনজঙ্গলের লতাপাতা ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া হ্যাঁপাইতে হ্যাঁপাইতে ভুলো কোথা হইতে নক্ষত্রবেগে আসিয়া হাজির।

অমনি দুর্গার সমস্ত গা দিয়া একটা কিসের স্রোত বহিয়া যায়। বিস্ময় ও কৌতুকে তাহার মুখচোখ উজ্জ্বল দেখায়! মনে মনে ভাবে-ঠিক শুনতে পায় তো, আসে কোখোকে!! আচ্ছা কাল একটু চুপি চুপি ডেকে দেখবো দিকি, তাও শুনতে পাবে?

এই আমোদ উপভোগ করিতে সে মায়ের বকুনি সহ্য করিয়াও রোজ খাইবার সময় নিজে বরং কিছু কম খাইয়া কুকুরের জন্য কিছু ভাত পাতে সঞ্চয় করিয়া রাখে।

অপু কিন্তু দিদির কুকুর ডাকিবার মধ্যে কি আমোদ আছে তাহা খুঁজিয়া পায় না। দিদির ওসব মেয়েলি ব্যাপারের মধ্যে সে নাই। অধীর আগ্রহে ভোজনরত শীর্ণ কুকুরটার দিকে সে চাহিয়াও দেখে না, শুধু শকুনির ডিমের কথা ভাবে।

অবশেষে সন্ধান মিলিল। হীরু নাপিতের কাঁঠালতলায় রাখালেরা গরু বাঁধিয়া গৃহস্থের বাড়িতে তেল-তামাক আনিতে যায়। অপু গিয়া তাহদের পাড়ার রাখালকে বলিল-তোরা কত মাঠে মাঠে বেড়াস, শকুনির বাসা দেখতে পাস? আমায় যদি একটা শকুনির ডিম এনে দিস আমি দুটো পয়সা দেবো।

দিন-চারেক পরেই রাখাল তাহাদের বাড়ির সামনে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া কোমরের থলি হইতে দুইটা কালো রং-এর ছোট ছোট ডিম বাহির করিয়া বলিল-এইদ্যাখো ঠাকুর এনিচি।

অপু তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া বলিল-দেখি। পরে আহ্লাদের সহিত উলটাইতে-পালটাইতে বলিল-শকুনির ডিম! ঠিক তো?

রাখাল সে সম্বন্ধে ভুরি ভুরি প্রমাণ উত্থাপিত করিল। ইহা শকুনির ডিম কিনা। এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো কারণ নাই, সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া কোথাকার কোন উঁচু গাছের মগড়াল হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছো-কিন্তু দুই আনার কমে দিবে না।

পারিশ্রমিক শুনিয়া অপু অন্ধকার দেখিল। বলিল, দুটো পয়সা দেবো, আর আমার কড়িগুলো নিবি? সব দিয়ে দেবো, এক টিনের ঠোঙা কড়ি—সব। এই এত বড় বড় সোনাগোটে-দেখবি, দেখাবো?

রাখালকে সাংসারিক বিষয়ে অপুর অপেক্ষা অনেক কুঁশিয়ার বলিয়া মনে হইল। সে নগদ পয়সা ছাড়া কোনো রকমেই রাজি হয় না। অনেক দরদস্তুরের পর আসিয়া চার

পয়সায় দাঁড়াইল। অপু দিদির কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া দুটা পয়সা জোগাড় করিয়া তাহাকে চুকাইয়া দিয়া ডিম দুটি লইল। তাহা ছাড়া রাখাল কিছু কড়িও লইল। এই কড়িগুলা অপুর প্রাণ, অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার বিনিময়েও সে এই কড়ি কখনও হাতছাড়া করিত না অন্য সময়; কিন্তু আকাশে উড়িবার আমোদের কাছে কি আর বেগুন-বীচি খেলা!

ডিমটা হাতে করিয়া তাহার মনটা যেন ফু-দেওয়া রবারের বেলুনের মতো হালকা হইয়া ফুলিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা সন্দেহের ছায়া তাহার মনে আসিয়া পৌঁছিল, এটুকু এতক্ষণ ছিল না, ডিম হাতে পাওয়ার পর হইতে যেন কোথা হইতে ওটুকু দেখা দিল খুব অস্পষ্ট। সন্ধ্যার আগে আপনমনে নেড়াদের জামগাছের কাটা গুড়ির উপর বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল, সত্যি সত্যি উড়া যাইবে তো! সে উড়িয়া কোথায় যাইবে? মামার বাড়ির দেশে? বাবা যেখানে আছে সেখানে? নদীর ওপারে? শালিখা পাখি ময়না পাখির মতো ওই আকাশের গায়ে তারাটা যেখানে উঠিয়াছে?

সেই দিনই, কি তাহার পরদিন। সন্ধ্যার একটু আগে দুর্গা সলিতার জন্য ছেড়া নেকড়া খুঁজিতেছিল। তাকের হ্যাঁড়ি-কলসির পাশে গোঁজা সলিতা পাকাইবার ছোড়া-খোড়া কাপড়ের টুকরার তাল হাতড়াইতে হাতড়াইতে কি যেন ঠিক করিয়া তাহার পিছন হইতে গড়াইয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল। ঘরের ভিতর অন্ধকার, ভালো দেখা যায় না, দুর্গা মেজে হইতে উঠাইয়া লইয়া বাইরে আসিয়া বলিল-ওমা কিসের দুটো বড় বড় ডিম এখানে। এঃ, পড়ে একেবারে গুড়ো হয়ে গিয়েচে– দেখেচো কি পাখি ডিম পেড়েচে ঘরের মধ্যে মা!

তাহার পর কি ঘটিল, সে কথা না তোলাই ভালো। অপু সেদিন রাত্রে খাইল না… কান্না..হৈ হৈ কাণ্ড। তাহার মা ঘাটে গল্প করে—ছেলেটার যে কি কাণ্ড, ওমা এমন কথা তো কখনও শুনি নি-শূনেচে সেজ ঠাকুরঝি, শকুনির ডিম নিয়ে নাকি মানুষে উড়তে পারে-ওই ওদের বাড়ির রাখাল ছোড়াটা, বদমায়েশের ধাড়ি। তাকে বুঝি বলেচে, সে কেথেকে দুটো ক্যাগের না কিসের ডিম এনে বলেচে,–এই নেও শকুনির ডিম। তাই নাকি, আবার চার পয়সা দিয়ে কিনোচে তার কাছে। ছেলেটা যে কি বোকা সে আর তোমার কাছে কি বলবো। সেজ ঠাকুরবি-কি করি যে এ ছেলে নিয়ে আমি!

কিন্তু বেচারি সর্বজয়া কি করিয়া জানিবে, সকলেই তো কিছু ‘সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ পড়ে নাই, বা সকলেই কিছু পারদের গুণও জানে না।

আকাশে তাহা হইলে তো সকলেই উড়িত!

# বিংশ পরিচ্ছেদ

অনেকদিন হইতে গ্রামের বৃদ্ধ নরোত্তম দাস বাবাজির সঙ্গে অপুর বড় ভাব। গাঙ্গুলি পাড়ার গৌরবর্ণ দিব্যাকান্তি, সদানন্দ বৃদ্ধ সামান্য খড়ের ঘরে বাস করেন। বিশেষ গোলমাল ভালোবাসেন না, প্রায়ই নির্জনে থাকেন, সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝে গাঙ্গুলিদের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া বসেন। অপুর বাল্যকাল হইতেই হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া মাঝে মাঝে নরোত্তম দাসের কাছে লইয়া যাইত—সেই হইতেই দুজনের মধ্যে খুব ভাব। মাঝে মাঝে অপু গিয়া বৃদ্ধের নিকট হাজির হয়, ডাক দেয়,-দাদু আছো? বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া তালপাতার চাটাইখানা দাওয়ায় পাতিয়া দিয়া বলেন- এসো দাদাভাই এসো, বসো বসো–

অন্যস্থানে অপু মুখচোরা, মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না-কিন্তু এই সরল শান্তদর্শন বৃদ্ধের সঙ্গে সে সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে মিশিয়া থাকে, বৃদ্ধের সঙ্গে তাহার আলাপ, খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপের মতো ঘনিষ্ঠ, বাধাহীন ও উল্লাস-ভরা! নরোত্তম দাসের কেহ নাই, বৃদ্ধ একাই থাকেন।– এক স্বজাতীয় বৈষ্ণবের মেয়ে কাজকর্ম করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। অনেক সময় সারা বিকাল ধরিয়া অপু বসিয়া বসিয়া গল্প শোনে ও গল্প করে। একথা সে জানে যে, নরোত্তম দাস বাবাজি তাহার বাবার অপেক্ষাও বয়সে অনেক বড়, অন্নদা রায়েব অপেক্ষাও বড়-কিন্তু এই বয়োবৃদ্ধতার জন্যই অপুর কেমন যেন মনে হয় বৃদ্ধ তাহার সতীর্থ, এখানে আসিলে তাহার সকল সংকোচ, সকল লজ্জা আপনা হইতেই ঘুচিয়া যায়। গল্প করিতে করিতে, অপু মন খুলিয়া হাসে, এমন সব কথা বলে যাহা অন্যস্থানে সে ভয়ে বলিতে পারে না, পাছে প্রবীণ লোকেরা কেহ ধমক দিয়া 'জ্যাঠা ছেলে' বলে। নরোত্তম দাস বলেন–দাদু, তুমি আমার গৌর,-তোমাকে দেখলে আমার মনে হয় দাদু, আমার গৌর তোমার বয়সে ঠিক তোমার মতই সুন্দর, সুশ্রী, নিস্পাপ ছিলেন-ওইরকম ভাব-মাখানো চোখ ছিল তাঁরও–

অন্যস্থানে এ কথায় অপুর হয়তো লজ্জা হইত, এখানে সে হাসিয়া বলে–দাদু তা হলে এবার তুমি আমায় সেই বইখানার ছবি দেখাও

বৃদ্ধ ঘর হইতে 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা' খানা বাহির করি যা আনেন। তাহার অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ, নির্জনে পড়িতে পড়িতে তিনি মুগ্ধ বিভোর হইয়া থাকেন। ছবি মোট দু'খনি, দেখানো শেষ হইয়া গেলে বৃদ্ধ বলেন, আমি মরবাব সমযে বইখানা তোমাকে দিয়ে যাবো দাদু, তোমার হাতে বইয়ের অপমান হবে না–

তাহার এক শিষ্য মাঝে মাঝে পদ রচনা করিয়া তাহাকে শুনাইতে আসিত। বৃদ্ধ বিরক্ত হইয়া বলিতেন, পদ বেঁধেচো বেশ করেচো, ওসব আমায় শুনিয়ে না বাপু, পদকর্তা

ছিলেন বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস-র্তাদের পর ওসব আমার কানে বাজে-ওসব গিয়ে অন্য জায়গায় শোনাও।

সহজ, সামান্য, অনাড়ম্বর জীবনের গতিপথ বাহিয়া এখানে কেমন যেন একটা অন্তঃসলিলা মুক্তির ধারা বহিতে থাকে, অপুর মন সেটুকু কেমন করিয়া ধরিয়া ফেলে। তাহার কাছে তাহা তাজা মাটি, পাখি, গাছপালার সাহচর্যের মতো অন্তরঙ্গ ও আনন্দপূর্ণ ঠেকে বলিয়াই দাদুর কাছে আসিবার আকর্ষণ তাহার এত প্রবল।

ফিরিবার সময় অপু নরোত্তম দাসের উঠানের গাছতলাটা হইতে একরাশি মুচুকুন্দ-চাঁপা ফুল কুড়াইয়া আনে। বিছানায় সেগুলি সে রাখিয়া দেয়। তাহার পরে সন্ধ্যায় আলো জ্বলিলেই বাবার আদেশে পড়িতে বসিতে হয়। ঘণ্টা-খানেকের বেশি কোনোদিনই পড়িতে হয় না, কিন্তু অপুর মনে হয়। কত রাতেই যে হইয়া গেল! পরে ছুটি পাইয়া সে শূইতে যায়, বিছানায় শুইয়া পড়ে,–আর অমনি আজকার দিনের সকল খেলাধুলা, সারাদিনের সকল আনন্দের স্মৃতিতে ভরপুর হইয়া বিছানায় রাখা মুচকুন্দ-চ্যাপার গন্ধ তাহার ক্লান্ত দেহমনকে খেলাধুলার অতীত ক্ষণগুলির জন্য বিরহাতুর বালকপ্রাণকে অভিভূত করিয়া বহিতে থাকে। বিছানায় উপুড় হইয়া ফুলের রাশির মধ্যে মুখ ডুবাইয়া সে অনেকক্ষণ ঘ্রাণ লয়।

সেদিন তাহার দিদি চুপি চুপি বলে—চড়ুইভাতি করবি অপু?

তাহাদের দোর দিয়া পাড়ার সকলে কুলুই-চণ্ডীর ব্রতের বন-ভোজনে গ্রামের পিছনের মাঠে যায়, তাহার মাও যায়। কিন্তু তাহকে লইয়া যায় না। সেখানে সব নিজের নিজের জিনিসপত্র। অত চাল-ডাল তাহদের নাই। আর বন-ভোজনে গিয়া সকলে বাহির করে কত কি জিনিস, ভালো চাল, ডাল, ঘি, দুধ-তাহার মা বাহির করে শুধু মোটা চাল, মটরের-ডাল-বাটা, আর দুই একটি বেগুন। পাশে বসিয়া ভুবন মুখুজ্যেদের সেজ ঠাকরুনের ছেলেমেয়েরা নতুন আখের গুড়ের পাটালি দিয়া দুধ ও কলা মাখিয়া ভাত খায়, নিজের ছেলেমেয়েদের জন্য তাহার মায়ের মন কেমন করে।

তাহার অপুও ওই-রকম দুধ কলা দিয়া পাটালি মাখিয়া ভাত খাইতে ভালোবাসে!…

শান্ত মাঠের ধারের বনে রাঙা সন্ধ্যা নামে, বাঁশবনের পথে ফিরিতে শুধু ছেলের মুখই মনে পড়ে।

নীলমণি রায়ের জঙ্গলাকীর্ণ ভিটার ওধারের খানিকটা বন দুর্গা নিজের হাতে দা দিয়া কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া ভাইকে বলিল-দাঁড়িয়ে দ্যাখ, তেঁতুলতলায় মা আসচে। কিনা-আমি চাল বের করে। নিয়ে আসি শিগগির করে—

একটা ভালো নারিকেলের মালায় দুই পলা তেল চুপি চুপি তেলের ভাড়টা হইতে বাহির করিয়া আনিল। অপহৃত মালামাল বাহিরে আনিয়া ভাইয়ের জিম্মা করিয়া বলিল- শিগগির নিয়ে যা, দৌড়ে অপু—সেইখানে রেখে আয়, দেখিস যেন গরুটরুতে খেয়ে ফেলে না–

এমন সময় মাতোর মা তাহার ছোট ছেলেকে পিছনে লইয়া খিড়কির দোর দিয়া উঠানে ঢুকিল। দুর্গা বলিল—এদিকে কোথেকে তমরেজের বৌ?

মাতোর মায়ের বয়সও খুব বেশি নয়, দেখিতেও মন্দ ছিল না, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর হইতেই কষ্টে পড়িয়া মলিন ও শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। বলিল—কুঠির মাঠে গিয়েছিলাম কাঠ কুড়ুতি-কুঁইচের মালা নেবা?

দুর্গা তো বন-বাগান খুঁজিয়া নিজেই কত বৈঁচিফল প্রায়ই তুলিয়া আনে, ঘাড় নাড়াইয়া বলিল-সে কিনিবে না।

মাতোর মা বলিল-নেও না দিদি ঠাকুরোন, বেশ মিষ্টি বুইচে। মধুখালির বিলির ধারে থে তুলেলাম-কেঁচড় হইতে একগাছা মালা বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল-দেখো কত বড় বড়! কাি নিয়ে বাজারে যেতি, বিকি কত্তি, পয়সা পেতি বড়ড বেলা হয়ে যাবে, মাতোরে ততক্ষণ এক পয়সার মুড়ি কিনে দেতাম। নেও, পয়সায় দু গাছ দেবানি

দুর্গা রাজি হইল না, বলিল-অপু, ঘটিতে একগাল খানিক চালভাজা আছে, নিয়ে এসে মাতোর হাতে দে তো!

উহারা খিড়কি দোর দিয়াই পুনরায় বাহির হইয়া গেলে দুজনে জিনিসপত্র লইয়া চলিল।

চারিদিক বনে ঘেরা। বাহির হইতে দেখা যায় না। খেলাঘরের মাটির ছোবার মতো ছোট্ট একটি হ্যাঁড়িতে দুর্গা ভাত চড়াইয়া দিয়া বলিল-এই দ্যাখ্য’ অপু, কত বড় বড় মেটে আলুর ফল নিয়ে এসিটি এক জায়গা থেকে। পুঁটিদের তালতলায় একটা ঝোপের মাথায় অনেক হয়ে আছে, ভাতে দোবো…

অপু মহা উৎসাহে শুকনা লতা-কাটি কুড়াইয়া আনে। এই তাঁহাদের প্রথম বন-ভোজন। অপুর এখনও বিশ্বাস হইতেছিল না যে, এখানে সত্যিকারের ভাত-তরকারি রান্না হইবে, না খেলাঘরের। বন-ভোজন, যা কতবার হইয়াছে, সে রকম হইবে,-ধুলার ভাত, খাপরার আলুভাজা, কাঁঠাল পাতার লুচি?

কিন্তু বড় সুন্দর বেলাটি-বড় সুন্দর স্থান বন-ভোজনের! চারিধারে বনঝোপ, ওদিকে তেলাকুচা লতার দুলুনি, বেলগাছের তলে জঙ্গলে শ্যাওড়া গাছে ফুলের ঝাড়, আধাপোড়া কটা দূর্বঘাসের উপর খঞ্জন পাখিরা নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, নির্জন ঝোপ-ঝাপের আড়ালে নিভৃত নিরালা স্থানটি। প্রথম বসন্তের দিনে ঝোপে ঝোপে নতুন কচি পাতা, ঘেটুফুলের ঝাড় পোড়ো ভিটাটা আলো করিয়া ফুটিয়া আছে, বাতাবি লেবু গাছটায় কয়দিনের কুয়াশায় ফুল অনেক ঝরিয়া গেলেও থোপা থোপা সাদা সাদা ফুল উপরেব ডালে চোখে পড়ে।

দুর্গা আজকাল যেন এই গাছপালা, পথঘাট এই অতি পরিচিত গ্রামের প্রতি অন্ধিসন্ধিকে অত্যন্ত বেশি করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতেছে। আসন্ন বিরহের কোন বিষাদে এই কত প্রিয় গাবতলার পথটি, ওই তাহদের বাড়ির পিছনের বাঁশবন, ছায়াভিরা নদীর ঘাটটি আচ্ছন্ন থাকে। তাহার অপুতাহার সোনার খোকা ভাইটি, যাহাকে এক বেলা না দেখিয়া সে থাকিতে পারে না, মন ফু-ফু করেতাহাকে ফেলিয়া সে কতদূর যাইবে!

আর যদি সে না ফেরে– যদি নিতম পিসির মতো হয়?

এই ভিটাতেই নিতম পিসি ছিল, বিবাহ হইয়া কতদিন আগে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, আর বাপের ভিটাতে ফিরিয়া আসে নাই। অনেককাল আগেব। কথা-ছেলেবেলা হইতে গল্প শুনিয়া আসিতেছে। সকলে বলে বিবাহ হইয়াছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়-সে কতদূরে? কোথায়? কেহ আব তাহার খোঁজখবব করে না, আছে কি নাই, কেহ জানে না। ব্যাপকে নিতম পিসি আর দেখে নাই, মাকে আর দেখে নাই, ভাই-বোনকেও না। সব একে একে মবিন্যা গিযাছে। মাগো, মানুষ কেমন করিয়া এমন নিষ্ঠুর হয়! কেন তাহার খোজ কেহ যে আব্ব করে নাই! কতদিন সে নির্জনে এই নিতম পিসিব কথা ভাবিয়া চোখের জল ফেলিয়াছে! আজি যদি হঠাৎ সে ফিরিয়া আসে–এইঘোর জঙ্গল-ভরা জনশূন্য বাপেব ভিটা দেখিয়া কি ভাবিবে?

তাহারও যদি ওইরকম হয়? ওই তাহার বাবাকে, মাকে, অপুকে ছাড়িয-আব কখনও দেখা হইবে না-কখনও না-কখনও না-এই তাহদের বাড়ি, গাবতলা, ঘাটের পথ?

ভাবিলে গা শিহরিয়া ওঠে, দরকাব নাই! কি জানি কেন আজকাল তাহার মনে হয় একটা কিছু তাহার জীবনে শীঘ্ন ঘটিবে। একটা এমন কিছু জীবনে শীঘ্রই আসিতেছে যাহা আর কখনও আসে না। দিন-রাতে খেলা-ধুলার, কাজ-কর্মের ফাঁকে ফাঁকে এ কথা তাহার প্রায়ই মনে হয়. ঠিক সে বুঝিতে পারে না তাহা কি, বা কেমন করিয়া সেটার আসিবার কথা মনে উঠে, তবুও মনে হয়, কেবলই মনে হয়, তাহা আসিতেছে…আসিতেছে.শীঘ্রই আসিতেছে…

চড়ুইভাতির মাঝামাঝি অপূদের বাড়ির উঠানে কাহার ডাক শোনা গেল। দুর্গা বলিলবিনির গলা যেন-নিয়ে আয় তো ডেকে অপু। একটু পরে অপুর পিছনে পিছনে দুর্গার সমবয়সি একটি কালো মেয়ে আসিল-একটু হাসিয়া যেন কতকটা সম্রামের সুরে বলিল-কি হচ্চে দুর্গা দিদি?

দুর্গা বলিল-আয় না বিনি, চড়ুইভাতি কচ্চি—বোস—

মেয়েটি ও পাড়ার কালীনাথ চক্কত্তির মেয়ে-পরনে আধময়লা শাড়ি, হাতে সবু সর্বকাচের চুড়ি, একটু লম্বা গড়ন, মুখ নিতান্ত সাদাসিধা। তাহার বাপ যুগীর বামুন বলিয়া সামাজিক ব্যাপারে। পাড়ায় তাহাদের নিমন্ত্রণ হয় না, গ্রামের একপাশে নিতান্ত সংকুচিত ভাবে বাস করে। অবস্থাও ভালো নয়। বিনি দুর্গার ফরমাইজ খাটিতে লাগিল খুব। বেড়াইতে আসিয়া হঠাৎ সে যেন একটা লাভজনক ব্যাপারের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, এখন ইহারা তাহাকে সে উৎসবের অংশীদার স্বীকার করিবে কি না করিবে-এরপ একটা দ্বিধামিশ্রিত উল্লাসের ভাব তাহার কথাবার্তায় ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ পাইতেছিল। দুর্গা বলিল-বিনি, আর দুটো শূকনো কাঠ দাখ, তো-আগুনটা জ্বলচে না ভালো–

বিনি তখনই কাঠ আনিতে ছুটিল এবং একটু পরে এক বোঝা শুকনো বেলের ডাল আনিয়া হাজির করিয়া বলিল-এতে হবে দুগগা দিদি-না। আর আনবো?...

দুর্গা যখন বলিল-বিনি এসেচে-ও-ও তো এখানে খাবে।–আর দুটো চাল নিয়ে আয় অপু–

বিনির মুখখানা খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। খানিকটা পরে বিনি জল আনিয়া দিল। আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—কি কি তরকারি দুগগা দিদি?

ভাত নামাইয়া দুর্গা তেলটুকু দিয়া বেগুন তাহাতে ফেলিয়া দিয়া ভাজে। খানিকটা পরে সে অবাক হইয়া ছোবার দিকে চাহিয়া থাকে, অপুকে ডাকিয়া বলে-ঠিক একেবারে সত্যিকারের বেগুন ভাজার মতো। রং হচ্চে দেখচিস অপু! ঠিক যেন মা'র রান্না বেগুন-ভাজা না?

অপুরও ব্যাপারটা আশ্চর্য বোধ হয়। তাহারও এতক্ষণ যেন বিশ্বাস হইতেছিল না যে, তাহাদের বন-ভোজনে সত্যিকার ভাত, সত্যিকার বেগুন-ভাজা সম্ভবপর হইবে! তাহার পর তিনজনে মহা আনন্দে কলার পাতে খাইতে বসে, শুধু ভাত আর বেগুন-

ভাজা আর কিছু না। অপু গ্রাস মুখে তুলিবার সময় দুর্গা সেদিকে চাহিয়া ছিল, আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে,-কেমন হয়েচে রে বেগুনভাজা?

অপু বলে-বেশ হয়েচে দিদি, কিন্তু নুন হয় নি যেন—

লবণকে রন্ধনের উপকরণের তালিকা হইতে ইহারা অদ্য একেবারেই বাদ দিয়াছে, লবণের বালাই রাখে নাই। কিন্তু মহাখুশিতে তিনজনে কোষো মেটে আলুর ফল ভাতে ও পানসে আধাপোড়া বেগুন-ভাজা দিয়া চড়ুইভাতির ভাত খাইতে বসিল। দুর্গার এই প্রথম রান্না, সে বিস্ময়মিশানো আনন্দের সঙ্গে নিজের হাতের শিল্প-সৃষ্টি উপভোগ করিতেছিল! এই বন-ঝোপের মধ্যে, এই শূকনো আতাপাতার রাশের মধ্যে, খেজুর তলায় ঝরিয়া-পড়া খেজুর পাতার পাশে বসিয়া সত্যিকারের ভাত তরকারি খাওয়া।

খাইতে খাইতে দুর্গা অপুর দিকে চাহিয়া হি হি করিয়া খুশির হাসি হাসিল। খুশিতে ভাতের দলা তাহার গলার মধ্যে আটকাইয়া যাইতেছিল যেন। বিনি খাইতে খাইতে ভয়ে ভয়ে বলিল—একটু তেল আছে দুগাগাদি? মেটে আলুর ফল ভাতে মেখে নিতাম।

দুর্গা বলিল-অপু, ছুটে নিয়ে আয় একটু তেল—

যে জীবন কত শত পুলকের ভাণ্ডার, কত আনন্দ-মুহূর্তের আলো-জ্যোৎস্নার অবদানে মণ্ডিত, ইহাদের সে মাধুরীময় জীবনযাত্রার সবে তো আরম্ভ। অনন্ত যে জীবনপথ দূর হইতে বহুদূরে দৃষ্টির কোন ওপারে বিসর্পিত, সে পথের ইহারা নিতান্ত ক্ষুদ্র পথিকদল, পথের বাঁকে ফুলেফলে দুঃখেসুখে, ইহাদের অভ্যর্থনা একেবারে নূতন।

আনন্দ! আনন্দ! প্রসারের আনন্দ, জীবনের মাঝে মাঝে যে আড়াল আছে, বিশাল তুষারমৌলি গিরিসংকটের ওদিকের যে পথটা দেখিতেছে না, তাহার আনন্দ! আজকের আনন্দ! সামান্য, সামান্য ছোটখাটো তুচ্ছ জিনিসের আনন্দ!

অপু বলিল-মাকে কি বলবি দিদি? আবার ওবেলা ভাত খাবি?

—দূর মাকে কখনও বলি! সন্ধের পর দেখিস খিদে পাবে এখন—

যুগীর বামুন বলিয়া পাড়ায় জল খাইতে চাহিলে লোকে ঘটিতে করিয়া জল খাইতে দেয়, তাহাও আবার মজিয়া দিতে হয়। বিনি দু-একবার ইতস্তত করিয়া অপুর গ্লাসটা দেখাইয়া বলিলআমার গালে একটু জল ঢেলে দেও তো অপু? জলি তেষ্টা পেয়েছে!

অপু বলিল-নাও না বিনিদি, তুমি নিয়ে চুমুক দিয়ে খাও না!

তবু যেন বিনির সাহস হয় না। দুর্গা বলিল-নে না বিনি, গেলাসটা নিয়ে খা না?

খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে দুর্গা বলিল-হ্যাঁড়িটা ফেলা হবে না। কিন্তু, আবার আর একদিন বনভোজন করবো-কেমন তো, ওই কুলগাছটার ওপরে টাঙিয়ে রেখে দেবো।

অপু বলিল-হ্যাঁঠা, ওখানে থাকবে কিনা? মাতোর মা কাঠ কুড়োতে আসে, দেখতে পেলে নিয়ে যাবে দিদি—ভারি চোর–

একটা ভাঙা পাচিলের ঘুলঘুলির মধ্যে ছোবাটা দুর্গা রাখিয়া দিল।

অপুর বুক টিপ টিপ করিতেছিল। ওই ঘুলঘুলিটার ওপিঠে আর একটা ছোট ঘুলঘুলি আছে, তাহার মধ্যে অপু লুকাইয়া চুবুটের বাক্স রাখিয়া দিয়াছে, দিদি সেদিকে যদি যাইয়া পড়ে।

নেড়াদের বাড়িতে কিছুদিন আগে নেড়ার ভগ্নীপতি ও তঁহার এক বন্ধু আসিয়াছিল। কলিকাতার কাছে কোথায় বাড়ি। খুব বাবু, খুব চুবুট খায়। এই একবার খাইল, আবার এই খাইতেছে। অপুর মনে মনে অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল সেও একবাব চুবুট খাইয়া দেখিবে, কেমন লাগে। সে নেড়ার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া গ্রামের হরিশ যুগীর দোকান হইতে তিন পয়সায় রাঙা কাগজ মোড়া দশটি চুরুট কিনিয়া আনে। সেদিন এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে একা বসিয়া চুপি চুপি একটা সিগারেট ধরাইয়া খাইয়াছিল-ভালো লাগে নাই, তেতো তেতো, কেমন একটা বঁটোঝ, দুটান খাইয়া সে আর খাইতে পারে নাই, কিন্তু তাহার ভাগের বা ক চারটি চুরুট সে ফেলিয়াও দিতে পারে নাই, নেড়ার ভগ্নীপতির নিকট সংগৃহীত একটা খালি চুবুটাম বাক্সে সে-কয়টি সে ওইপোড়োভিটের জঙ্গলে ভাঙা পাঁচিলের ঘুলঘুলিতে লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছে। প্রথম চুবুট খাইবার দিন চুবুট টানা শেষ হইয়া গেলে ভয়ে তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিতেছিল, পাছে মুখের গন্ধে মা টের পায়। পাকা কুল অনেক করিয়া খাইয়া নিজের মুখের হাই হাত পাতিয়া ধরিয়া অনেকবার পরীক্ষা করিয়া। তবে সে সেদিন পুনর্বার মনুষ্যসমাজে প্রবেশ করিয়াছিল। যায় বুঝি আজ বামলসুদ্ধ ধরা পড়িয়া!

কিন্তু দিদির পাচিলের ওপিঠে যাইবার দরকার হয় না। এপিঠেই কাজ। সারা হইয়া যায়।

# একবিংশ পরিচ্ছেদ

কথাটা সর্বজয়া ঘাটে গিয়া পাড়ার মেয়েদের মুখে শুনিল।

আজ কয়েকদিন হইতে নীরেনের সঙ্গে অন্নদা রায়ের, বিশেষ করিয়া তাঁহার ছেলে গোকুলের মনান্তর চলিতেছিল। কাল দুপুর বেলা নাকি খুব ঝগড়া ও চেঁচামেচি বাধে। ফলে কাল রাত্রেই নীরেন জিনিসপত্র লইয়া এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। অন্নদা রায়ের প্রতিবেশী যজ্ঞেশ্বর দীঘড়ীর স্বী হরিমতি বলিতেছিলেন–সত্যি মিথ্যে জানিনে, ক'দিন থেকে তো নানারকম কথা শুনতে পাচ্ছি-আমি বাপু বিশ্বেস করিনে, বেঁটে তেমন নয়। আবার নাকি শুনলাম নীরেন লুকিয়ে টাকা দিয়েছে, বৌ নাকি টাকা কোথায় পাঠিয়েছিল, নীরেনের হাতের লেখা রসিদ ফিরে এসে গোকুলের হাতে পড়েচে এই সব।—যাক বাপু, সে সব পরের কুচ্ছ শুনে কি হবে? নীরেন শুনলাম বলচে-আপনারা সকলে মিলে একজনের ওপর অত্যাচার কর্তে পারেন। তাতে দোষ হয় না?–আপনারা যা ভাবেন ভাবুন, বৌ-ঠাকরুন। একবার হুকুম করুন, আমি ওঁকে এই দণ্ডে আমার হারানো মায়ের মতো মাথায় করে নিয়ে যাবো।–তারপর আপনারা যা করবার করবেন। তারপর খুব হৈ চৈ খানিকক্ষণ হল-সন্দের আগেই সে গয়লাপাড়া থেকে একখানা গাড়ি ডেকে আনলে, জিনিসপত্তর নিয়ে চলে গেল।

সর্বজয়া কথাটা শুনিয়া বড় দমিয়া গেল। ইতিমধ্যে স্বামীকে দিয়া অন্নদা রায়কে নীচেরনের পিতার নিকট এ বিবাহ সম্বন্ধে পত্র লিখিতে অনুরোধ করিয়াছে। নীরেনকে আরও দুইবার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল–ছেলেটিকে তাহার অত্যন্ত পছন্দ হইয়াছে। হরিহর তাহাকে অনেকবার বুঝাইয়াছে, নীরেনের পিতা বড়লোক-তাহদের ঘরে তিনি কি আর পুত্রের বিবাহ দিবেন? সর্বজয়া কিন্তু আশা ছাড়ে নাই, তাহার মনের মধ্যে কোথায় যেন সাহস পাইয়াছে-এ বিবাহের যোগাযোগ যেন দুরাশা নয়, ইহা ঘটিবে। হরিহর মনে মনে বিশ্বাস না করিলেও স্ত্রীর অনুরোধে অন্নদা রায়কে কয়েকবার তাগিদ দিয়াছিল বটে। কিন্তু এখন যে বড় বিপদ ঘটিল!

ইতিমধ্যে একদিন পথে দুর্গার সঙ্গে গোকুলের বউয়ের দেখা হইল। সে চুপি চুপি দুর্গাকে অনেক কথা বলিল, নীরেন কোন চলিয়া গেল তাহারই ইতিহাস। বলিতে বলিতে তাহার চোখ ছাপাইয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

-এই রকম বঁটালাথি খেয়েই দিন যাবে-কেউ নেই দুগগা—তাই কি ভাইটা মানুষ? কোথাও যে দুদিন জুড়ুবো সে জায়গা নেই–

সহানুভূতিতে দুর্গার বুক ভরিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে খুড়িমার কলঙ্কের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও তাহার দুঃখে সান্ত্বনাসূচক নানা কথা অস্পষ্টভাবে তাহার মনের মধ্যে

জোট পাকাইয়া উঠিল। সব কথা গুছাইয়া বলিতে না পারিয়া শুধু বলিল, ওই সখী ঠাকুরমা যা লোক! বলুক গে না, সে করবে: কি? কেঁদো না খুড়িমা লক্ষীটি, আমি রোজ যাবো তোমার কাছে—

সর্বজয়া শুনিয়া আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—বৌমা কি বল্লে-টল্লে দুর্গা?...তা নীরেনের কথা কিছু হল নাকি?

দুর্গা লজ্জিত সুরে বলিল-তুমি কাল জিজ্ঞেস কোরো না ঘটে? আমি জানি নে—

অপু একবার জিজ্ঞাসা করিল,-খুড়িমার কাছে কি শূনলি, মাস্টার মশায় আর আসবেন না?

দুর্গা ধমক দিয়া কহিল—তা আমি কি জানি-যাঃ-

পড়ন্ত রোদে ছায়াভরা পথটি কেমন যেন মন-কেমন-করা-করা। সে তাহার ভাই-এর জন্য। এ-রকম তাহার হয়, কতবার হইয়াছে, বেশিক্ষণ ধরিয়া যদি সে বাড়ি না থাকে, কি ভাইকে না দেখে, ভাইয়ের রাশি রাশি কাল্পনিক দুঃখের কথা মনে হইয়া মনের মধ্যে কেমন করে।

তাহার আমন দুধে-আলতা রং-এর সোনার পুতুলের মতো ভাইটা ময়লা আধাছেড়া মতো একখানা কাপড় পরিয়া বাড়ির দরজার সামনে আপনমনে একা একা কড়ি চালিয়া বেগুন-বীচি খেলিতেছে। তাহার কাছে পয়সা চায় এটা-ওটা কিনিতে, সে দিতে পারে না-ভারি কষ্ট হয় মনে—

দিন কয়েক পরে। ভুবন মুখুজ্যের বাড়ি রানুর দিদির বিবাহ শেষ হইয়া গিয়াছে বটে। কিন্তু এখনও কুটুম্ব-কুটুম্বিনীরা সকলে যান নাই। ছেলেমেয়েও অনেক। একটি ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে দুর্গাের বেশ আলাপ হইয়াছে, তাহার নাম টুনি। তাহার বাপিও আসিয়াছিলেন। আজ দুপুরের পর স্ত্রী ও কন্যাকে কিছুদিনের জন্য এখানে রাখিয়া কর্মস্থানে গিয়াছেন। ঘণ্টা খানেক পরে, সেজ ঠাকরুন। এ ঘরে কি কাজ করিতেছিলেন, টুনির মায়ের গলা তাহার কানে গেল। সেজ ঠাকরুন দালানে আসিয়া বলিলেন–কি রে হাসি কি? টুনির মা উত্তেজিতভাবে ও ব্যস্তভাবে বিছানাপত্র, বালিশের তলা হাতড়াইতেছে, উঁকি মারিতেছে, তোশক উলটাইয়া ফেলিয়াছে; বলিল-এইএকটু আগে আমার সেই সোনার সিঁদুরের কৌটোটা এই বিছানার পাশে এইখানটায় রেখেছি, খোকা দোলায় চেচিয়ে উঠল, উনি বাড়ি থেকে এলেন–আর তুলতে মনে নেই- কোথায় গেল আর তো পাচ্ছি নে?–

সেজ ঠাকরুন বলিলেন-ওমা সে কি? হাতে করে নিয়ে যাস নি তো?

–না দিদিমা, এইখানে রেখে গেলুম। বেশ মনে আছে, ঠিক এইখানে

সকলে মিলিয়া খানিকক্ষণ চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করা হইল, কৌটার সন্ধান নাই। সেজ ঠাকরুন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, দালানে প্রথমটা এ বাড়ির ছেলেমেয়ে ছিল, তারপর খাওয়ার ডাক পড়িলে ছেলেমেয়েরা সব খাবার খাইতে যায়, তখন বাহিরের লোকের মধ্যে ছিল দুর্গা। সেজ ঠাকরুনের ছোট মেয়ে টেঁপি চুপি চুপি বলিল-আমরা যেই খাবার খেতে এলাম দুগগাদি তখন দেখি যে খিড়কির দোর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, এই মাত্তর আবার এসেছে–

সেজ ঠাকুবুন চুপি চুপি কি পরামর্শ করিলেন, পরে বৃক্ষসুরে দুর্গাকে বলিলেন-কৌটো দিয়ে দে দুগগা, কোথায় রেখেচিস বল-বার কর এখখুনি বলচি–

দুর্গার মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছিল, সেজ ঠাকরুনের ভাবভঙ্গিতে তাহার জিব যেন মুখের মধ্যে জড়াইয়া গেল। অস্পষ্টভাবে কি বলিল ভালো বোঝা গেল না।

টুনির মা এতক্ষণ কোনো কথা বলে নাই-একজন ভদ্রঘরের মেয়েকে সকলে মিলিয়া চোর বলিয়া ধরাতে সে একটু অবাক হইয়া গিয়াছিল, বিশেষত দুর্গাকে সে কয়েকদিন এখানে দেখিতেছে, দেখিতে বেশ চেহারা বলিয়া দুর্গাকে পছন্দ করে-সে চুরি করিবে ইহা কি সম্ভব? সে বলিল-ও নেয় নি বোধ হয়। সেজদি-ও কেন–

সেজ ঠাকরুন বলিলেন—তুমি চুপ করে থাকো না! তুমি ওর কি জানো, নিয়োচে কি না। নিয়েচে আমি জানি ভালো করে–

একজন বলিলেন—তা নিয়ে থাকিস বের করে দে, নয়তো কোথায় আছে বল-আপদ চুকে গেল। দিয়ে দে লক্ষ্মীটি, কেন মিথ্যে–

দুর্গা যেন কেমন হইয়া গিয়াছিল—তাহার পা ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছিল-সে দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল-আমি তো জানিনে কাকিম-আমি তো—

সেজ ঠাকরুন বলিলেন-বল্লেই আমি শুনবো? ঠিক ও নিয়েচে-ওর ভাব দেখে আমি বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, ভালো কথায় বলচি কোথায় রেখেচিস দিয়ে দে, জিনিস দিয়ে দাও তো কিছু বোলবো না-আমার জিনিস পেলেই হল

পূর্বোক্ত কুটুম্বিনী বলিলেন-ভাদর লোকের মেয়ে চুরি করে কোথাও শুনিনি তো কখনও। এই পাড়াতেই বাড়ি নাকি?

সেজ ঠাকরুন বলিলেন-তুমি ভালো কথাব কেউ নও! দেখবে তুমি মজাটা একবাব, তুমি আমার বাড়ির জিনিস নিয়ে হজম কর্তে গিয়েচো—এ কি যা তা পেয়েচ বুঝি?–তোমায় আমি আজ–

পরে তিনি দুর্গার হাতখানা ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া তাহাকে দালানের ঠিক মাঝখানে আনিয়া বলিলেন, দুর্গা, বল এখনও কোথায় রেখেচিস?…বলবি নে? না, তুমি জানো না, তুমি খুকি—তুমি কিছু জানো না-শিগগির বল, নৈলে দাঁতের পাটি একেবারে সব ভেঙে গুড়ো করে ফেলবো এখুনি! বল, শিগগির-বল এখনও বলচি–

টুনির মা হাত ধরিতে আগাইয়া আসিতেছিল, একজন কুটুম্বিনী বলিলেন, রোসো না, দেখচো না ও-ই ঠিক নিয়েচে। চোরের মারই ওষুধ-দিয়ে দাও এখুনি মিটে গেল,-কেন মিথ্যে–

দুর্গার মাথার মধ্যে কেমন করিতেছিল। সে অসহায়ভাবে চারিদিকে চাহিয়া অতি কষ্টে শুকনো জিবে জড়াইয়া উচ্চারণ করিল-আমি তো জানিনে কাকিম, ওরা সব চলে গেল আমিও তোকথা বলিবার সময়ে সে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া। সেজ ঠাকরুনের দিকে চোখ রাখিয়া দেওয়ালের দিকে ঘোষিয়া যাইতে লাগিল।

পরে সকলে মিলিয়া আরও খানিকক্ষণ তাহাকে বুঝাইল। তাহার সেই এক কথা—সে জানে না।

কে একজন বলিল-পাকা চোর—

টেঁপি বলিল-বাগানের আমগুলো তলায় পড়বার জো নেই কাকিমা–

শেষোক্ত কথাতেই বোধ হয় সেজ ঠাকরুনের কোন ব্যথায় ঘা লাগিল। তিনি হঠাৎ বাজাখাই রকমের আওয়াজ ছাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—তবে রে পাজি, নচ্ছার চোরের ঝাড়, তুমি জিনিস দেবে না? দেখি তুমি দেও কি না দেও! কথা শেষ না করিয়াই তিনি দুর্গার উপর ঝাপাইয়া পড়িয়া তাহার মাথাটা লইয়া সজোরে দেওয়ালে ঠুকিতে লাগিলেন। বল কোথায় রেখেচিস-বল, এখুনি–বল শিগগির—বল–

টুনির মা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া সেজ ঠাকরুনের হাত ধরিয়া বলিল, করেন কি-করেন কি সেজদি-থাকগে আমার কৌটো-ওরকম করে মারেন কেন?–ছেড়ে দিন-থাক, হয়েছে, ছাড়ন, ছিঃ!

টুনি মারা দেখিয়া কঁদিয়া উঠিল। পূর্বোক্ত কুটুম্বিনী বলিলেন-এঃ, রক্ত পড়ছে যে...

দুর্গার নাক দিয়া ঝরঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছে কেহ লক্ষ করে নাই। বুকের কাপড়ের খানিকটা রক্তরাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

টুনির মা বলিলেন,-শিগগির একটু জল নিয়ে আয় টেঁপি-রোয়াকের বালতিতে আছে দ্যাখ–

চেঁচামিচি ও হৈ চৈ শুনিয়া পাশের বাড়ির কামারের বিস্তু-বৌরা ব্যাপার কি দেখিতে আসিল। রানুর মা এতক্ষণ ছিলেন না-দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে কামার-বাড়ি বসিয়া গল্প করিতেছিলেন–তিনিও আসিলেন।

মারের চোটে দুর্গার মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল, সে দিশহারা ভাবে ভিড়ের মধ্যে একবার চাহিয়া কি দেখিল।

জল আসিলে রানুর মা তাহার চোখে মুখে জল দিয়া তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন। তাহার মাথার মধ্যে কেন বিমঝিম করিতেছিল, সে দিশহারা ভাবে বসিয়া পড়িল। রানুর মা বলিলেন-আমন করে কি মারে সেজদি?...রোগা মেয়েটা-ছিঃ-

—তোমরা ওকে চেনো নি এখনও। চোরের মার ছাড়া ওষুধ নেই এইবলে দিলুম-মারের এখনও হয়েছে কি-না পাওয়া গেলে ছাড়বো নাকি? হরি রায় আমায় যেন শূলে ফাঁসে দেয় এরপর–

রানুর মা বলিলেন-হয়েচে, এখন একটু সামলাতে দেও সেজদি-যে কাণ্ড করেচো—

টুনির মা বলিল-ওমা, এত হবে জানলে কে কৌটোর কথা বলতো?...চাইনে আমার কৌটো-ওকে ছেড়ে দাও সেজদি—

সেজ ঠাকরুন। এত সহজে ছাড়িতেন। কিনা বলা যায় না, কিন্তু জনমত তাঁহার বিরুদ্ধে রায দিতে লাগিল।. কাজেই তিনি আসামীকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

রানুর মা তাহাকে ধরিয়া ওদিকের দরজা খুলিয়া খিড়কিব উঠানে বাহির করিষা দিলেন। বলিলেন—খুব ক্ষণে আজ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলি যা হোক! যা, আস্তে আস্তে যা-টেঁপি খিড়কিটা ভালো করে খুলে দে

দুর্গা দিশহারা ভাবে খিড়কি দিয়া বাহির হইয়া গেল, মেয়েছেলে ও যাহারা উপস্থিত ছিলসকলে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

একজন বলিল—তবুও তো স্বীকার কল্লে না-কি রকম দেখচো একবার?...চোখ দিয়ে কিন্তু এক ফোটা জল পড়লো না

রানুর মা বলিলেন-জল পড়বে কি, ভয়েই শুকিয়ে গিয়েচে। চোখে কি আর জল আছে? ওইরকম করে মারে সেজাদি।

# দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

গ্রামে বারোয়ারি চড়কপূজার সময় আসিল। গ্রামের বৈদ্যনাথ মজুমদার চাঁদার খাতা গাতে বাড়ি বাড়ি চাঁদা আদায় করিতে আসিলেন। হরিহর বলিল, না খুড়ো, এবার আমার এক টাকা চাঁদা ধরাটা অন্যে হয়েছে-এক টাকা দেবার কি আমার অবস্থা? বৈদ্যনাথ বলিলেন-না হে না, এবার নীলমণি হাজরার দল। এ রকম দলটি এ অঞ্চলে কেউ চক্ষেও দেখেনি। এবার পালপাড়ার বাজারে মহেশ স্যা করার বালক-কেত্তিনের দল গাইবে, তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া চাই-ই–

বৈদ্যনাথ এমন ভাব দেখাইলেন যে নিশ্চিন্দিপুরবাসিগণের জীবন-মরণ এই প্রতিযোগিতার সাফল্যের উপর নির্ভর করিতেছে।

অপু একটা কঞ্চি টানিতে টানিতে বাড়ি ঢুকিয়া বলিল-পাকা কঞ্চি বাবা, তোমার খুব ভালো কলম হবে, ডোবার ধারের বাঁশতলায় পড়ে ছিল, কুড়িয়ে আনলাম-পরে সে হাসিমুখে সেটা কতকটা উঁচু করিয়া তুলিয়া দেখাইয়া বলিল, হবে না বাবা তোমার কলম? কেমন পাকা, না?

চড়কের আর বেশি দেরি নাই। বাড়ি বাড়ি গাজনের সন্ন্যাসী নাচিতে বাহির হইয়াছে। দুর্গা ও অপু আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীদলের পিছনে পিছনে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইল। অন্য অন্য গৃহস্থ বাড়ি হইতে পুরানো কাপড় দেয়, চাল পয়সা দেয়-কেউ বা ঘড়া দেয়-তাহারা কিছুই দিতে পারে না। দুটো চাল ছাড়া-এজন্য তাঁহাদের বাড়িতে এ দল কোনো বারই আসে না! দশ বারো দিন সন্ন্যাসী-নাচনের পর চড়কের পূর্বরাত্রে নীলপূজা আসিল।

নীলপূজার দিন বৈকালে একটা ছোট খেজুর গাছে সন্ন্যাসীরা কাঁটা ভাঙে-এবার দুর্গা আসিয়া খবর দিল প্রতি বৎসরের সে গাছটাতে এবার কাঁটা-ভাঙা হইবে না, নদীর ধারে আর একটা গাছ সন্ন্যাসীরা এবার পূর্ব হইতেই ঠিক করিয়াছে। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দল বাঁধিয়া দুর্গা ও অপু সেখানে গিয়া জোটে। তারপর কাঁটা-ভাঙার নোচ হইয়া গেলে সকলে চড়কতলাটাতে একবার বেড়াইতে যায়। খেজুরের ডাল দিয়া নীলপূজার মণ্ডপ ঘিরিয়াছে—চড়কতলার মাঠের শ্যাওড়াবন ও অন্যান্য জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে। সেখানে ভুবন মুখুজ্যেদের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে দেখা হইল-রানী, পুটি, টুনু–এদের বাড়িতে কড়া শাসন আছে, দুর্গার মতো টো টো করিয়া যেখানে সেখানে বেড়াইবার সুকুম নাইঁ-অতি কষ্টে বলিয়া কহিয়া ইহারা চড়কতলা পর্যন্ত আসিয়াছে।

টুনু বলিল-আজ রাত্রে সন্নিসিরা শ্মশান জাগাতে যাবে—

রানী বলিল-আহা, তা বুঝি আর জানিনে? একজন মড়া হবে। তাকে বেঁধে নিয়েযাবে শ্মশানের সেই ছাতিমতলায়। তাকে আবার বাঁচাবে, তারপর মড়ার মুণ্ড নিয়ে আসবে।-ছাড়া বলতে বলতে আসবে।-ওর সব মন্তর আছে–

দুর্গা বলিল-আমি জানি ওদের ছড়া, শূনবি বলবো?

স্বগগো থেকে এলো রথ
নামলো খেতৃতলে
চব্বিশ কুটী বাণবর্ষা শিবের সঙ্গে চলে–
সত্যযুগের মড়া আর শাওল যুগের মাটি
শিব শিব বল রে ভাই ঢাকে দ্যাও কাঠি—

পরে হাসিয়া বলে-কেমন চমৎকার এবার গোষ্টবিহারের পুতুল হয়েছে নীলুদা?...দশ কুমোরের বাড়ি দেখে এলাম-দেখিসনি রানু?

পুটি বলিল-সত্যিকার মড়ার মুণ্ড রানুদি?

—নয় তো কি? অনেক রাত্রে যদি আসিস তো দেখতে পাবি। চল ভাই আমরা বাড়ি যাইআজ রাতটা ভালো নয়-আয়রে অপু, দুগগাদি আয়।

অপু বলিল-কেন ভালো নয় রানুদি? কী আজ হবে রাতে?

রানু বলিল-সে সব কথা বলতে নেই-তুই আয় বাড়ি।

অপু গেল না, কিন্তু দুর্গা ওদের দলের সঙ্গে চলিয়া গেল। তারপর হঠাৎ মেঘ করিল, সন্ধ্যার অন্ধকার মেঘে ঘনীভূত করিয়া তুলিল। অপু বাড়ি ফিরিতেছে, পথেজনপ্রাণী নাই, সন্ধ্যা হইতে শ্মশানের ও মড়ার মুণ্ডের গল্প শুনিয়া তাহার কেমন ভয় ভয় করিতেছে। মোড়ের বাঁশবনের কাছে আসিয়া মনে হইল কিসের যেন কটুগন্ধ বাহির হইতেছে। সে দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। আর একটুখানি গিয়া নেড়ার ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা। নেড়ার ঠাকুরমা নীলপূজার নৈবেদ্য হাতে চড়কতলায় পূজা দিতে যাইতেছে। অপু অন্ধকারে প্রথমটা চিনিতে পারে নাই, পরে চিনিয়া বলিল-কিসের গন্ধ বেরিয়েছে। ঠাকুরমা?

বুড়ি বলিল-আজ ওঁরা সব বেবিয়েচেন কিনা?...তারই গন্ধ আর কি—

অপু বলিল—কারা ঠাকুরমা?

–কারা আবার-শিবের দলবল, সন্দেবোলা ওঁদের নাম করতে নেই।–রাম রাম–রাম রাম–

অপুর গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। চারিধারে অন্ধকার সন্ধ্যা, আকাশে কালো মেঘ, বাঁশবন, শ্মশানের গন্ধ, শিবের অনুচর ভূতপ্রেত-ছোট ছেলের মন বিস্ময়ে, ভয়ে, রহস্যে, অজানার অনুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। সে আতঙ্কের সুরে বলিল-আমি কি করে বাড়ি যাবো ঠাকমা!...

বুড়ি বকিয়া উঠিল।'—তা এত রাত করাই বা কেন বাপু আজকের দিনে?...এসো আমার সঙ্গে। নীল পুজোর থালাখানা দিয়ে আসি, তারপর এগিয়ে দেবো'খন। ধন্যি যা হোক—

বারোয়ারি তলায় ঘাস চাচিয়া প্রকাণ্ড বাঁশের মেরাপ বাঁধিয়া সামিয়ানা টাঙানো হইয়াছে। যাত্রার দল আসে আসে—এখনও পৌঁছে নাই, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, লোকে বলে কাল সকালের গাড়িতে আসিবে, সকাল চলিয়া গেলে বৈকালেব আশায় থাকে। অপুর স্নানাহার বন্ধ হইবার উপক্রম হইযাছে।...বাত্রে অপুর ঘুম হয় না, বাঁধ ভাঙা বন্যার স্রোতের মতো কৌতুহল ও খুশির যে কী প্রবল অদম্য উচ্ছাস! বিছানায় ছট্‌ফট্র এপাশি-ওপাশ করে। যাত্রা হবে! যাত্রা হবে! যাত্রা হবে!

মাযেব বারণ আছে অত বড় মেয়ে পাড়া ছাড়িয়া কোথাও না যায়, দুর্গা চুপি চুপি গিয়া দেখিয়া আসিয়া রাজলক্ষ্মীর কাছে আসর-সজ্জা ও বাঁশের গায়ে-ঝুলানো লাল নীল কাগজের অভিনবত্ব সম্বন্ধে গল্প করে, অপুর মনে হয়, যে পঞ্চাননতলায় সে দু'বেলা কড়িখেলা করে, সেই তুচ্ছ অত্যন্ত পবিচিত সামান্য স্থানটাতে আজ বা কাল নীলমণি হাজাবার দলের যাত্রার মতো একটা অভূতপূর্ব অবাস্তব ঘটনা ঘটবে, এও কি সম্ভব? কথাটা যেন তাহার বিশ্বাসই হয় না।

হঠাৎ শুনিতে পাওয়া যায় আজ বিকালেই দল আসিবে। এক ঝলক রক্ত যেন বুক হইতে নাচিয়া চলাকাইয়া একেবারে মাথায় উঠিয়া পড়ে।...

কুমার-পাড়ার মোড়ে দুপুরের পাব হইতেই সকল ছেলের সঙ্গে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর দূরে একখানা গরুব গাড়ি তাহার চোখে পড়িল, সাজের বাক্স বোঝাই গাড়ি—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ খান! পটু একে একে আঙুল দিয়া গুনিয়া খুশির সুরে বলিল–অপুদা, আমরা এদের পেছনে পেছনে এদের বাসায় গিয়ে দেখে আসি, যাবি? সাজের গাড়িগুলার পিছনে দলের লোকেরা যাইতেছে, সকলের মাথায় টেরিকাটা, অনেকের জুতা হাতে। পটু একজন দাড়িওয়ালা লোককে দেখাইয়া কহিল—এ বোধ হয় রাজা সাজে, না অপুদা?

আকাশ-বাতাসের রং একেবারে বদলাইয়া গেল-অপু মহা উৎসাহে বাড়ি ফিরিয়া দেখে তাহার বাবা দাওয়ায় বসিয়া কি লিখিতেছে ও গুনগুনা করিয়া গান করিতেছে। সে ভাবে, যাত্রা আসিবার কথা তাহার বাবাও জানিতে পারিযাছে, তাই এত স্মৃর্তি। উৎসাহে হাত নাড়িয়া বলেসাজ একেবারে পাঁচ গাড়ি বাবা! এ রকম দল!–

হরিহর শিষ্যবাড়ি বিলি করার জন্য বালির কাগজে কবচ লিখিতেছিল, মুখ তুলিয়া বিস্ময়ের সুরে বলে-কিসের সাজ রে খোকা? —

অপু আশ্চর্য হইয়া যায়, এত বড় ঘটনা বাবার জানা নাই! বাবাকে সে নিতান্ত কৃপার পাত্র বিবেচনা করে।

সকালে উঠিয়া অপুকে পড়িতে বসিতে হয়। খানিক পরে সে কাদোকাদো ভাবে বলে-আমি বারোয়ারিতলায় যাবো বাবা, সকলে যাচ্চে আর আমি এখন বুঝি বসে বসে পড়বো? এখখুনি যদি যাত্রা আরম্ভ হয়?

তাহার বাবা বলে-পড়ো, পড়ো, এখন বসে পড়ো, যাত্রা আরম্ভ হলে ঢোল বাজবার শব্দ তো শুনতে পাওয়া যাবে? তখন না হয় যেয়ো এখন। শ্রীেড় বয়সের ছেলে, নিজে সব সময়ে আজকাল বিদেশে থাকে, অল্পদিনের জন্য বাড়ি আসিয়া ছেলেকে চোখছাড়া করিতে মন চায় না। অভিমানে বাগে অপুর চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে, সে কান্নাভিরা গলায় আবার শুভঙ্করী শুরু করে-মাস মাহিনা যাব যত দিন তার পড়ে কত?

কিন্তু সকালে যাত্রা বসে না, খবর আসে ওবেলা বসিবে। ওবেলা অপু মায়ের কাছে। যাইয়া কঁদো কাদো ভাবে বাবার অত্যাচারের কাহিনী আনুপূর্বিক বর্ণনা করে। সর্বজয়া আসিয়া বলে–দাও না গো ছেলেটাকে ছেড়ে? বছরকারের দিনটা-তোমার ন মাস বাড়িতে থাকা নেই বছরে, আর ও একদিনের পড়াতে একেবারে তাঙ্কালঙ্কার ঠাকুর হয়ে উঠবে কিনা?

অপু ছুটি পায়। সারা দুপুর তাহার বারোয়ারিতলায় কাটে। বৈকালে যাত্রা বসিবার পূর্বে বাড়িতে খাবার খাইতে আসিল। বাবা রোযাকে বসিয়া কবচ লিখিতেছে। অন্যদিন এ সময। তাহাকে তাহার বাবার কাছে বসিয়া বই পড়িতে হয়। পাছে ছেলে চটিয়া যায়। এই ভয়ে তাহার বাবা তাহাকে খুশি রাখিবার জন্য নানারকম কৌতুকের আয়োজন করে। বলে, খোকা চাটু করে সিলেটে লিখে আনো দিকি, ঐঃ ভূত বাপ রে! অপু সব অদ্ভুত ধরনের কথা শুনিয়া হাসিয়া খুন হয়, তাড়াতাড়ি লিখিয়া আনিয়া দেখায়। বলে-বাবা এইটে হয়ে গেলে আমি কিন্তু চলে যাবো, তাহার বাবা বলে-যেয়ো এখন,

যেয়ো এখন, খোকা-আচ্ছা চাটু কবে লিখে আনো দিকি-আর একটা অদ্‌ভুত কথা বলে। অপু আবার হাসিয়া উঠে।

আজ কিন্তু অপুর মনে হইল, বাহিব হইতে কি একটা প্রচণ্ড শক্তি আসিয়া তাহাকে তাহার বাবার নিকট হইতে সরাইযা লইয়া গিযাছে। বাবা নির্জন ছায়াভবা বৈকালে বাঁশ বন ঘেরা বাড়িতে একা বসিয়া বসিয়া লিখিতেছে, কিন্তু এমন শক্তি নাই যে, তাহাকে বসাইয়া রাখে। এখন যদি বলে—খোকা, এসে পড়তে বসো-আমুনি চারিদিক হইতে একটা যেন ভয়ানক প্রতিবাদের হট্টগোল উঠিবে। সকলে যেন বলিবে-না, না, এ হয় না! এ হয় না! যাত্রা যে বসে বসে!...কোনো উল্লাসের প্রবল শক্তি তাহার বাবাকে যেন নিতান্ত অসহায় নিরীহ দুর্বল করিয়া দিয়াছে। সাধ্য নাই যে, তাহার পড়িবার কথা পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করে। বাবার জন্য অপুর মন কেমন করে।

দুর্গা বলিল-অপু, তুই মাকে বল না। আমিও দেখতে যাবো। অপু বলে—ম, দিদি কেন আসুক না। আমার সঙ্গে? চিক দিয়ে ঘিরে দিয়েচে, সেইখেনে বসবে?

মা বলে-এখন থাক, আমি ওই ওদের বাড়ির মেয়েরা যাবে, তাদের সঙ্গে যাবো,-আমার সঙ্গে যাবে এখন।

বারোয়ারিতলায় যাইবার সময় দুর্গা পিছন হইতে তাহাকে ডাকিল-শোন অপু। পরে সে কাছে আসিয়া হাসি-হাসি মুখে বলিল-হোত পাত দিকি! অপু হাত পাতিতেই দুর্গা তাহার হাতে দুটা পয়সা রাখিয়াই তাহার হাতটা নিজের দুহাতের মধ্যে লইয়া মুঠা পাকাইয়া দিয়া বলিল-দু দায়সায় মুড়কি কিনে খাস, নয়তো যদি নিচু বিক্রি হয় তো কিনে খাস।

ইহার দিনসাতেক পূর্বে একদিন অপু আসিয়া চুপি চুপি দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল–তোর পুতুলের বাক্সে পয়সা আছে? একটা দিবি? দুর্গা বলিয়াছিল–কি হবে পয়সা তোর? অপু দিদির মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল-নিচু খাবো-কথা শেষ করিয়া সে পুনরায় লজ্জার হাসি হাসিল। কৈফিয়তের সুরে বলে-বোষ্টমদের বাগানে ওরা মাচা বেঁধেচে দিদি, অনেক নিচু পেড়েচে, দু-কুড়ি-ইই-এক পয়সার ছটা, এই এত বড় বড়, একেবারে সিঁদুরের মতো রাঙা, সত্যু কিনলে সাধন। কিনলে-পরে একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল–আছে দিদি?

দুর্গার পুতুলের বাক্সে সেদিন কিছুই ছিল না, সে কিছু দিতে পারে নাই। অপুকে বিরসমুখে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সেদিন তাহার খুব কষ্ট হইয়াছিল, তাই কাল বৈকালে সে বাবার কাছে পয়সা দুটা চড়ক দেখিবার নাম করিয়া চাহিয়া লয়। সোনার ভাটার মতো ভাইটা, মুখের আবদার না। রাখিতে পারিলে দুর্গার ভারি মন কেমন করে।

অপু চলিয়া গেলে তাহার মা ঘোট হইতে আসিয়া বলে—দুগগা একটা কাজ করতো! রানুদের বাগান থেকে দুটো সাদা গন্ধভেদালির পাতা খুঁজে নিয়ে আয় তো-অপুর শরীরটা অসুখ করেচে, একটু ঝোল করে দেবে!–

মায়ের কথায় সে একছুটে রানুদের বাগানে যায়-বাগানে মানুষ-সমান উঁচু ঘন আগাছার জঙ্গলের মধ্যে গন্ধভেদালির পাতা খুঁজিতে খুঁজিতে মনের সুখে মাথা দুলাইয়া পিসিমার মুখে ছেলেবেলায় শেখা একটি ছড়া আবৃত্তি করে–

হলুদ বনে বনে–
নাক-ছবিটি হারিয়ে গেছে সুখ নেইকো মনে–

# ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

যাত্রা আরম্ভ হয়। জগৎ নাই, কেহ নাই—শুধু অপু আছে, আর নীলমণি হাজরার যাত্রা দল আছে সামনে। সন্ধ্যার আগে বেহালায় ইমন আলাপ করে, ভালো বেহালদার। পাড়াগাঁয়ের ছেলে কখনও সে ভালো জিনিস শোনে নাই।–উদাস-করুণ সুরে হঠাৎ মন কেমন করিয়া উঠে, মনে হয়। বাবা এখনও বসিযা বাড়িতে সেই কী লিখিতেছে—দিদি আসিতে চাহিয়াও আসিতে পারে নাই। প্রথম যখন জরির সাজ-পোশাক পবিয়া টাঙানো ঝাড় ও কড়ির ডুমের আলো-সজ্জিত আসরে বাজার মন্ত্রীর দল আসিতে আরম্ভ করে, অপু মনে ভাবে এমন সব জিনিস তাহার বাবা দেখিল না! সবাই তো আসরে আসিয়াছে গ্রামের, তাহদের পাড়ার কোনও লোক তো বাকি নাই! বাবা কেন এখনও...? পালা দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। সেবার সে বালক-কীর্তনের দলের যাত্রা শুনিয়াছিলসে কি, আর এ কি! কি সব সাজ! কি সব চেহারা!...

হঠাৎ পিছন হইতে কে বলে-খোকা বেশ দেখতে পোচ্ছ তো?...তাহার বাবা কখন আসিয়া আসরে বসিয়াছে অপু জানিতে পারে নাই। বাবার দিকে ফিরিয়া বলে-বাবা, দিদি এসেচে?.চিকের মধ্যে বুঝি?

মন্ত্রীব গুপ্ত ষড়যন্ত্রে যখন রাজা রাজ্যচ্যুত হইয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া বনে চলিতেছেন, তখন কঁদুনে সুরে বেহালার সংগত হয়। তারপব রাজা করুণ রস বন্ধুক্ষণ জমাইয়া রাখিবার জন্য স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়া এক এক পা করিয়া থামেন, আর এক এক পা অগ্রসর হইতে থাকেন, সত্যিকার জগতে কোন বনবাস-গমনোদ্যত রাজা নিতান্ত অপ্রকৃতিস্থ না হইলে একদল লোকের সম্মুখে সেরূপ করে না। বিশ্বস্ত রাজ-সেনাপতি রাগে এমন কাপেন যে মৃগী-রোগগ্রস্ত রোগীর পক্ষেও। তাহা হিংসার বিষয় হইবার কথা। অপু আপলক চোখে চাহিয়া বসিয়া থাকে, মুগ্ধ বিস্মিত হইয়া যায়; এমন তো সে কখনও দেখে নাই।

তারপর কোথায় চলিয়া গিয়াছেন রাজা, কোথায় গিয়াছেন রানী!..ঘন নিবিড় বনে শুধু রাজপুত্র অজয় ও রাজকুমারী ইন্দুলেখা ভাইবোন ঘুরিয়া বেড়ায়! কেউ নাই যে তাহদের মুখের দিকে চায়, কেউ নাই যে নির্জন বনে তাহদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলে। ছোট ভাইয়ের জন্য ফল আনিতে একটু দূরে চলিয়া যাইয়া ইন্দুলেখা আর ফেরে না। অজয় বনের মধ্যে বোনকে খুঁজিয়া বেড়ায়তাহার পর নদীর ধরে হঠাৎ খুঁজিয়া পায় ইন্দুলেখার মৃতদেহ-ক্ষুধার তাড়নায় বিষফল খাইয়া সে মরিয়া গিয়াছে। অজয়ের করুণ গান-কোথা ছেড়ে গেলি। এ বনকান্তারে প্রাণপ্রিয় প্রাণসখী রেশুনিয়া অপু এতক্ষণ মুগ্ধ চোখে চাহিয়া ছিল-আর থাকিতে পারে না, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদে।

কলিঙ্গরাজের সহিত বিচিত্রকেতুর যুদ্ধে তলোয়ার খেলা কী!..যায়, বুঝি ঝাড়গুলা গুড়া হয়, নয় তো কোন হতভাগ্য দর্শকের চোখ দুটি বা যায়। রব ওঠে-ঝাড় সামলে-ঝাড় সামলে!..কিন্তু অদ্‌ভুত যুদ্ধকৌশল-সব বাঁচাইয়া চলে-ধন্য বিচিত্রকেতু!

মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া জুড়ির দীর্ঘ গান ও বেহালায় কসরত-এর সময় অপুকে তাহার বাবা ডাকিয়া বলে-ঘুম পাচ্ছে… বাড়ি যাবে খোকা?…সুম। সর্বনাশ!..না, সে বাড়ি যাইবে না। বাহিরে ডাকিয়া তাহার বাবা বলে-এই দুটো পয়সা রাখো বাবা, কিছু কিনে খেযো, আমি বাড়ি গেলাম। অপুর ইচ্ছা হয় সে এক পয়সার পান। কিনিয়া খাইবে, পানের দোকানের কাছে অত্যন্ত কিসের ভিড় দেখিয়া অগ্রসর হইয়া দ্যাখে, অবাক কাণ্ড! সেনাপতি বিচিত্রকেতু হাতিয়ারবন্দ অবস্থায় বার্ডসাই কিনিয়া ধরাইতেছেন—তঁহাকে ঘিরিয়া, রথযাত্রার ভিড়। আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য!… রাজকুমার অজয় কোথা হইতে আসিয়া বিচিত্রকেতুর কনুই-এ। হাত দিয়া বলিল-এক পযসার পান খাওয়াও না কিশোরীদা? রাজপুত্রের প্রতি সেনাপতির বিশ্বস্ততার নিদর্শন দেখা গেল না-হাত ঝাড়া দিয়া বলিল-যাঃ অত পয়সা নেই-ওবেলা সাবানখানা যে দুজনে মাখলে, আমাকে কি বলেছিলে? রাজপুত্র পুনবায় বলিল-খাওয়াও না কিশোরীদা? আমি বুঝি কখনও কিছু দিইনি তোমাকে? বিচিত্রকেতু হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল।

অপুর সমবয়সি হইবে। টুকটুকে, বেশ দেখিতে, গানেব। গলা বড় সুন্দব। অপু মুগ্ধ হইযা তাহার দিকে চাহিয়া থাকে-বড় ইচ্ছা হয় আলাপ কবিতে। হঠাৎ সে কিসের টানে সাহসী হইয়া আগাইয়া যায়-একটু লজ্জার সঙ্গে বলে-পান খাবে?..অজয় একটু অবাক হয়, বলে-তুমি খাওয়াবে? নিয়ে এসো না। দুজনে ভাব হইয়া যায়। ভোব বলিলে ভুল হয়। অপু মুগ্ধ, অভিভূত হইয়া যায়! ইহাকেই সে এতদিন মনে মনে চাহিয়া আসিয়াছে-এই রাজপুত্র অজযকে। তাহার মাযের শত রূপকথার কাহিনীর মধ্য দিয়া, শৈশবের শত স্বপ্নময়ী মুগ্ধ কল্পনার ঘোরে তাহার প্রাণ ইহাকেই চাহিয়াছে-এই চোখ, এই মুখ, এই গলার স্বর! ঠিক সে যাহা চায় তাহাই। অজয় জিজ্ঞাসা করে– তোমাদের বাড়ি কোথায় ভাই? …আমাকে একজনের বাড়ি খেতে দিয়েছে, বড্ড বেলায় খেতে দেয়। তোমাদের বাড়িতে খায় কে?…

খুশিতে অপুর সারা গা কেমন করে, সে বলে–“ভাই, আমাদের বাড়িতে একজনখেতে যায়, সে আজ দেখলাম ঢোলক বাজাচে-তুমি কাল থেকে যেয়ো, আমি এসে ডেকে নিয়ে যাবো।– ঢোলকওয়ালা না হয় তুমি যে বাড়িতে আগে খেতে, সেখানে খাবে–

খানিকক্ষণ দুজনে এদিক-ওদিক বেড়াইবার পর অজয় বলে-আমি যাই ভাই, শেষ সিনে আমার গান আছে-আমার পার্ট কেমন লাগচে তোমার?

শেষ বাত্রে যাত্রা ভাঙিলে অপু বাড়ি আসে। পথে আসিতে আসিতে যে যেখানে কথা বলে, তাহার মনে হয় যাত্রাব এক্‌টো হইতেছে। বাড়িতে তাহার দিদি বলে-ও অপু, কেমন যাত্রা শূনলি?.অপুর মনে হয়, গভীর জনশূন্য বনের মধ্যে রাজকুমারী ইন্দুলেখা কি বলিয়া উঠিল। কিসের যে ঘোর তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। মহা খুশির সহিত সে বলে-কাল থেকে, অজয় যে মেজেছিল মা, সে আমাদের বাড়ি খেতে আসবে।–

তাহার মা বলে-দুজনে খাবে?-দুজনকে কোত্থেকে—

অপু বলে-তা না, একজন তো চলে যাবে, শুধু অজয় খাবে।

দুর্গা বল্লে-কেমন যাত্রা রে অপু?…এমন কক্ষনো দেখিনি-কেমন গান কল্লে যখন সেই রাজকন্যা মরে গেল?..অপুর তো রাত্রে ঘুমের ঘোরে চারিধারে যেন বেহালা সংগীত হয়। ভোর হইলে একটু বেলায় তাহার ঘুম ভাঙে-শেষ রাত্রে ঘুমাইয়াছে, তৃপ্তির সঙ্গে ঘুম হয় নাই, সূর্যের তীক্ষ্ণ আলোয়, চোখে যেন সুচ বিঁধে। চোখে জল দিলে জালা করে। কিন্তু তাহার কানে একটা বেহালা-ঢোল-মন্দিরার ঐকতান বাজনা তখনও যেন বাজিতেছে-তখনও যেন সে যাত্রার আসরেই বসিয়া আছে।

ঘাটের পথে যাইতে পাড়ার মেয়েরা কথা বলিতে বলিতে যাইতেছে, অপুর মনে হইল কেহ। ধীরাবতী, কেহ কলিঙ্গদেশের মহারানী, কেহ রাজপুত্র অজয়ের মা বসুমতী। দিদির প্রতি কথায়, হাত পা নাড়ার ভঙ্গিতে, রাজকন্যা ইন্দুলেখা যেন মাখানো! কাল যে ইন্দুলেখা সাজিয়াছিল তাহাকে মানাইয়াছিল। মন্দ নয় বটে, কিন্তু তাহার মনে মনে রাজকন্যা ইন্দুলেখার যে প্রতিমা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা তাহার দিদিকে লইয়া, ওই রকম গায়ের রং, অমনি বড়বড় চোখ, আমনি সুন্দর মুখ, অমনি সুন্দর চুল!

ইন্দুলেখা তাহার সকল করুণা, স্নেহ মাধুরী লইয়া কোন সেকালের দেশের অতীত জীবনের পরে আবার তাহার দিদি হইয়া যেন ফিরিয়া আসিয়াছে—কাল তাই ইন্দুলেখার কথার ভঙ্গিতে, প্রতি পদক্ষেপে দিদিই যেন ফুটিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। যখন গভীর বনে সে শতস্নেহে ছোট ভাইকে জড়াইয়া রাখিয়াছিল, তাকে খাওয়াইবার জন্য ফল আহরণ করিতে গিয়া এক নির্জন বনের মধ্যে হারাইয়া গেল-সেই একদিনের মাকাল ফলের ঘটনাটাই অপুর ক্রমাগত মনে হইতেছিল।

দুপুর বেলা খাইবার জন্য অপু গিয়া অজয়কে ডাকিয়া আনিল। তাহার মা দুজনকে এক জায়গায় খাইতে দিয়া অজয়ের পরিচয় লইতে বসিল। সে ব্রাহ্মাণের ছেলে, তাহার কেহ নাই, এক মাসী তাহাকে মানুষ করিয়াছিল, সেও মরিয়া গিয়াছে। আজ বছরখানেক যাত্রার দলে কাজ করিতেছে। সর্বজয়ার ছেলেটির উপর খুব স্নেহ হইল-

বার বার জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে খাওয়াইল। খাওয়াইবার উপকরণ বেশি কিছু নাই, তবু ছেলেটি খুব খুশির সঙ্গে খাইল। তাহার পর দুর্গা মাকে চুপি চুপি বলিল—ম, ওকে সেই কালকের গানটা গাইতে বল না—সেই 'কোথা ছেড়ে গেলি এ বন-কান্তারে প্রাণপ্রিয় প্রাণসখী রে'–

অজয় গলা ছাড়িয়া গানটি গাহিল-অপু মুগ্ধ হইয়া গেলা-সর্বজয়ার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল। আহা, এমন ছেলের মা নাই! তাহার পর সে আরও গান গাহিল। সর্ব্বজয়া বলিলবিকেলে মুড়ি ভাজবো, তখন এসে অবিশ্যি করে মুড়ি খেয়ে যেয়ো-লজ্জা কোরো না যেন-যখন খুশি আসবে, আপনার বাড়ির মতো, বুঝলে?

অপু তাহাকে সঙ্গে করিয়া নদীর ধারের দিকে বেড়াইতে গেল। সেখানে অজয়বলিল, ভাই, তোমার তো গলা মিষ্টি-একটা গান গাও না?...অপুর খুব ইচ্ছা হইল ইহার কাছে গান গাহিয়া সে বাহাদুরি লইবে। কিন্তু বড় ভয় করে-এ একজন যাত্রাদলের ছেলে-এর কাছ তার গান গাওয়া? নদীর ধারে বড় শিমুলগাছটার তলায় চলা-চলতির পথ হইতে কিছুদূরে বাঁশঝোপের আড়ালে দুজনে বসে। অপু অনেক কষ্টে লজ্জা কাটাইয়া একটা গান করে-শ্রীচরণে ভার একবার গা তোল হে অনন্ত-দাশু রায়ের পাঁচালীর গান বাবার মুখে শুনিয়া সে লিখিয়া লইয়াছে। অজয় অবাক হইয়া যায়, বলে-তোমার এমন গলা ভাই? তা তুমি,গান গাও না কেন?...আর একটা গাও। অপু উৎসাহিত হইয়া আর একটা ধরে-খেয়ার আশে বসে রে মন ডুবল বেলা খেয়ার ধারে। তাহার দিদি কোথা হইতে শিখিয়া আসিয়া গাহিত, সুরাটা বড় ভালো লাগায় অপু তাহার কোছ হইতে শিখিয়াছিল-বাড়িতে কেহ না থাকিলে মাঝে মাঝে গানটা তাহারা দুজনে গাহিয়া থাকে।

গান শেষ হইলে অজয় প্রশংসায় উচ্ছসিত হইয়া উঠিল। বলিল-এমন গলা থাকলে যে কোনো দলে ঢুকলে পোনেরো টাকা করে মইনে সেধে দেবে বলচি তোমায়-এর ওপর একটু যদি শেখো!

বাড়িতে কেহ না থাকিলে দিদির সামনে গাহিয়া অপু কতদিন দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেহঁহা দিদি, আমার গলা আছে? গান হবে?...দিদি তাহকে বরাবর আশ্বাস দিয়া আসিয়াছে। কিন্তু দিদির আশ্বাস যতই আশাপ্রদ হৌক, আজ একজন সংগীতদক্ষ খাস যাত্রার দলের নামকরা মেডেলওয়ালা গায়কের মুখে এ প্রশংসার কথা শুনিয়া আনন্দে অপু কি বলিয়া উত্তর করিবে ঠাওর করিতে পারিল না।

বলিল-তোমার ওই গানটা আমায় শেখাও না?...

তাহার পর দুইজনে গলা মিশাইয়া সে গানটা গাহিল।

অনেকক্ষণ হইয়া গেল। নদী বাহিয়া ছপ ছপা করিয়া নৌকা চলিতেছে, নদীর পাড়ের নিচে জলের ধারে একজন কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, অজয় বলিল—কি খুঁজচে ভাই?

অপু বলিল-ও ব্যাঙচি খুঁজচে, ছিপে মাছ ধরবে।–তাহার পর বলিল-আচ্ছা ভাই তুমি আমাদের এখানে থাকো না কেন?…যেয়ো না কোথাও, থাকবে?…

এমন চোখ, এমন মিষ্টি গলার সুর! তাহার উপর অপুর কাছে সে সেই রাজপুত্র অজয়! কোন বনে ফিরিতে ফিরিতে অসহায় ছন্নছাড়া রূপবান রাজার ছেলের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়া ভাব হইয়া গিয়াছে-চিরজন্মের বন্ধু! আর তাহাকে কি করিয়া ছাড়া যায়?

অজয়ও অনেক মনের কথা বলিয়া ফেলিল। এমন সাখী তাহার আর জুটে নাই। সে প্রায় চল্লিশ টাকা জমাইয়াছে। আর একটু বড় হইলে সে এ-দল ছাড়িয়া দিবে। অধিকারী বড় মারে। সে আশুতোষ পালের দলে যাইবে—সেখানে বড় সুখ, বোজ রাত্রে লুচি। না খাইলে তিন আনা পয়সা খোরাকি দেয়। এ দল ছাড়িলে সে আবার অপুদের বাড়ি আসিবে ও সে সময় কিছুদিন থাকিবে। বৈকালের কিছু আগে অজয় বলিল-চল ভাই, আজ আবার এখুনি আসব হবে, সকাল সকাল ফিরি। যদি "পরশুরামের দর্প-সংহার' হয়, তবে আমি নিয়তি সাজবো, দেখো কেমন একটা গান আছে–

আরও তিন দিন যাত্রা হইল। গ্রামসুদ্ধ লোকের মুখে যাত্রা ছাড়া আর কথা নাই। পথে ঘাটে মাঠে গাঁয়ের মাঝি নৌকা বাহিতে বাহিতে, রাখাল গরু চরাইতে চরাইতে যাত্রার পালার নতুন শেখা গান গায়। গ্রামের মেয়েরা দলের ছেলেদের বাড়ি ডাকাইয়া যাহার যে গান ভালো লাগিয়াছে তাহার মুখে সে গান ফরমাইশ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। অপু আরও তিন-চারটা নতুন গান শিখিয়া ফেলিল। একদিন সে যাত্রার দলের বাসায় অজয়ের সঙ্গে গিয়াছে, সেখানে তাহাকে দলের সকলে মিলিয়া ধরিল, তাহাকে একটা গান গাহিতে হইবে। সেখানে সকলে অজয়ের মুখে শুনিয়াছে সে খুব ভালো গান গাহিতে পারে। অপু বহু সাধ্যসাধনার পর নিজের বিদ্যা ভালো কবিয়া জাহির কবিবার খাতিরে একটা গাহিয়া ফেলিল। সকলে তাহাকে ধরিয়া অধিকারীর নিকটে লইয়া গেল। সেখানেও তাহাকে একটা গাহিতে হইল। অধিকারী কালো রং-এর ভূড়িওয়ালা লোক, আসরে জুড়ি সাজিয়া গান করে। গান শুনিয়া বলিল-এসো না খোকা, দলে আসবে? অপুর বুকখানা আনন্দে ও গর্বে দশহাত্ত হইল। আরও সকলে মিলিয়া তাহাকে ধরে- এসো, চলো তোমাকে আমাদের দলে নিয়ে যাই। অপুর তো ইচ্ছা সে এখনই যায়। যাত্রার দলে কাজ করা মনুষ্য জীবনের চরম উদ্দেশ্য, সেকথা এতদিন সে কেন জানিত না, ইহাই তো আশ্চর্যের বিষয়। সে গোপনে অজয়কে বলিল-আচ্ছা! ভাই, এখন যদি আমি দলে যাই, আমাকে কি সাজতে দেবে?

অজয় বলিল-এখন এই সখী-ঠখী, কি বালকের পার্ট এই রকম, তারপর ভালো করে শিখলে—

অপু সখী সাজিতে চায় না-জরির মুকুট মাথায় সে সেনাপতি সাজিয়া তলোয়ার ঝুলাইবে, যুদ্ধ করবে। বড় হইলে সে যাত্রার দলে যাইবেই। উহাই তাহার জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য। অজয় তাহাকে চুপি চুপি কষ্টি পাথরের রং একটা ছোকরাকে দেখাইয়া কছিল, এই যে দেখছে, এর নাম বিষ্টু তেলি। আমার সঙ্গে মোটে বনে না, আমার নিজের পয়সায় দেশলাই কিনে বালিশের তলায় রেখে শুই, দেশলাই উঠিয়ে নেয়। চুবুট খেতে, আর দেয় না। আমি বলি আমার রাত্রে ভয় করে, দেশলাইটা দাও। অন্ধকারে মন ছমছম করে, তাই সেদিন চেয়েছিলাম বলে এমনি থাবড়া একটা মেরেচে! নাচে ভালো বলে অধিকারী বড় খাতির করে, কিছু বলবারও জো নেই—

দিন পাঁচেক পরে যাত্রা দলের গাওনা শেষ হইয়া গেলে তাহারা রওনা হইল। অজয় বাড়ির ছেলের মতো যখন তখন আসিত যাইত, এই কয়দিনে সে যেন অপুরই আর এক ভাই হইয়া পড়িয়াছিল। অপুরই বয়সি ছোট ছেলে, সংসারে কেহ নাই শুনিয়া সর্বজয়া তাহাকে এ কয়দিন অপুর মতো যত্ন করিয়াছে। দুর্গাঁও তাহাকে আপন ভাইয়ের চোখে দেখিয়াছে—তাহার কাছে গান শিখিয়া লইয়াছে, কত গল্প শুনাইয়াছে, তাহার পিসিমার কথা বলিয়াছে, তিনজনে মিলিয়া উঠানে বড় ঘর আঁকিয়া গঙ্গা-যমুনা খেলিয়াছে, খাইবার সময়ে জোর করিয়া বেশি খাইতে বাধ্য করিয়াছে। যাত্রাদলে থাকে, কে কোথায় দ্যাখে, কোথায় শোয়, কি খায়, আহা বলিবার কেহ নাই; গৃহ-সংসারের যে স্নেহস্পর্শ বোধ হয় জন্মাবধিই তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই, অপ্রত্যাশিত ভাবে আজ তাহার স্বাদ লাভ করিয়া লোভীর মতো সে কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছিল না।

যাইবার সময় সে হঠাৎ পুঁটুলি খুলিয়া কষ্টে সঞ্চিত পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া সর্বজয়ার হাতে দিতে গেল। একটু লজ্জার সুরে বলিল-এই পাঁচটা টাকা দিয়ে দিদির বিয়ের সময় একখানা ভালো কাপড়–

সর্বজয়া বলিল—না বাবা, না।–তুমি মুখে বললে এই খুব হল, টাকা দিতে হবে না, তোমার এখন টাকার কত দরকার-বিয়ে-থাওয়া করে সংসারী হতে হবে–

তবু সে কিছুতেই ছাড়ে না। অনেক বুঝাইয়া। তবে তাহাকে নিরস্ত করিতে হইল।

তাহার পর সকলে উহাদের বাড়ির দরজার সামনে খানিকটা পথ পর্যন্ত তাহাকে আগাইয়া দিতে আসিল। যাইবার সময় সে বার বার বলিয়া গেল, দিদির বিয়ের সময় অবশ্য করিয়া যেন তাহাকে পত্র দেওয়া হয়।

গাবতলার ছায়ায় ছায়ায় তাহার সুকুমার বালকমূর্তি ভাটিশ্যাওড়া ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেলে হঠাৎ সর্বজয়ার মনে হইল, বড় ছেলেমানুষ আহা, এই বয়সে বেরিয়েছে নিজের রোজগার নিজে কর্তে। অপুর আমার যদি ওইরকমহাত-মাগো!...

# চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রথম প্রথম যখন হরিহর কাশী হইতে আসিল তখন সকলে বলিত তাহার ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল, এ অঞ্চলে ওরকম বিদ্যা শিখিয়া কেহ আসে নাই। তাহার বিদ্যার সুখ্যাতি সকলের মুখে ছিল, সকলে বলিত সে এইবার একটা কিছু করিবে। সর্বজয়াও ভাবিত, শীঘ্রই উহারা তাহার স্বামীকে ডাকাইয়া একটা ভালো চাকুরি দিবে (কাহারা চাকুরি দেয় সে সম্বন্ধে তাহার ধারণা ছিল কুয়াশাচ্ছন্ন সমুদ্রবক্ষের মতো অস্পষ্ট)। কিন্তু মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর করিয়া বহুকাল চলিয়া গেল, অর্ধরাত্রির মাথায় কোনো জরির পোশাকপরা ঘোড়সওয়ার সভাপণ্ডিত পদের নিয়োগ-পত্র লইয়া দুটিয়া আসিল না, বা আরব্য উপন্যাসের দৈত্য কোন মণি-খচিত মায়াপ্রাসাদ আকাশ বাহিয়া উড়াইয়া আনিয়া তাহাদের ভাঙা ঘরে বসাইয়া দিয়া গেল না, বরং সে ঘরের পোকা-কাটা কবাট দিন দিন আরও জীর্ণ হইতে চলিল, কড়িকাঠ। আরও বুলিয়া পড়িতে চাহিল, আগে যাও বা ছিল তাও আর সব থাকিতেছে না, তবু সে একেবারে আশা ছাড়ে নাই। হরিহরও বিদেশ হইতে আসিয়া প্রতিবারই একটা না একটা আশার কথা এমনভাবে বলে, যেন সব ঠিক, অল্পমাত্র বিলম্ব আছে, অবস্থা ফিরিল বলিয়া। কিন্তু হয়।

জীবন বড় মধুময় শুধু এইজন্য যে, এই মাধুর্যের অনেকটাই স্বপ্ন ও কল্পনা দিয়া গড়া। হোক না। স্বপ্ন মিথ্যা, কল্পনা বাস্তবতার লেশশূন্য; নাই বা থাকিল সব সময় তাহদের পিছনে সার্থকতা; তাহারাই যে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহারা আসুক, জীবনে অক্ষয় হোক তাহাদের আসন; তুচ্ছ সার্থকতা, তুচ্ছ লাভ।

হরিহর বাড়ি হইতে গিয়াছে প্রায় দুই-তিন মাস। টাকাকড়ি খরচপত্র অনেকদিন পাঠায় নাই। দুর্গা অসুখে ভুগিতেছে একটু বেশি, খায় দায় অসুখ হয়, দুদিন একটু ভালো থাকে, হঠাৎ একদিন আবার হয়।

সর্বজয়া মেয়ের বিবাহের জন্য স্বামীকে প্রায়ই তাগাদ দেয়। স্বামীকে দিয়া দুই-তিনখানা পত্র নীরেন্দ্রর পিতা রাজ্যেশ্বরবাবুর নিকট লিখিয়াছে। সেদিকের আশাও সে এখনও ছাড়ে নাই। হরিহর বলে, তুমি কি খেপিলে নাকি? ওসকল বড়লোকের কাণ্ড, রাজ্যেশ্বর কাকা কি আব আমাদের পুছবেন? তবুও সর্বজয়া ছাড়ে না; বলে, লেখো না। আর একখানা, লিখেই দ্যাখো না-নীরেন তো পছন্দই করে গিয়েছেন। দুই এক মাস চলিয়া যায়, বিশেষ কোন উত্তর আসে না, আবোব সে স্বামীকে পত্র লিখিবার তাগাদা দিতে শুরু করে।

এখার হরিহর যখন বিদেশে যায়, তখন বলিয়া গিয়াছে এইবার সে এখান হইতে উঠিয়া অন্যত্র বাস করিবার একটা কিছু ঠিক করিয়া আসিবেই।

পাড়ার একপাশে নিকনো পুছানো ছোট্ট খড়ের ঘর দু'তিনখানা। গোয়ালে হৃষ্টপুষ্ট দুগ্ধবতী গাভী বঁধা, মাচা ভরা বিচালি, গোলা ভরা ধান। মাঠের ধারের মটর ক্ষেতের তাজা, সবুজ গন্ধ খোলা হাওয়ায় উঠান দিয়া বহিয়া যায়। পাখি ডাকে-নীলকণ্ঠ, বাবুই, শ্যামা। অপু সকালে উঠিয়া বড় মাটির ভাঁড়ে ধোয়া এক পাত্র তাজা সফোন কালো গাই-এর দুধের সঙ্গে গরম মুড়ির ফলার খাইয়া পড়িতে বসে। দুর্গা ম্যালেরিয়ায় ভোগে না। সকলেই জানে, সকলেই খাতির করে, আসিয়া পায়ের ধূলা লয়।গরিব বলিয়া কেহ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে না।

...শুধুই স্বপ্ন দেখে, দিন নাই, রাত নাই, সর্বজয়া শুধুই স্বপ্ন দেখে। তাহার মনে হয়, এতকাল পরে সত্য-সত্যই একটা কিছু লাগিয়া যাইবে। মনের মধ্যে কে যেন বলে।

কেন এতদিন হয় নাই? কেন এতকাল পরে? সেই ছেলেবেলাকার দিনে জামতলায় সজনেতলায় ঘুরিবার সময় হইতে সেঁজুতির আলপনা আঁকা মন্ত্রের সঙ্গে এ সাধ যে তাহার মনে জড়াইয়া আছে, লক্ষ্মীর আলতাপরা পায়ের দাগ আঁকা আঙিনায় শ্বশুরবাড়ির ঘর-সংসার পাতাইবে। এরকম ভাঙা পুরানো কোঠা বাঁশবন কে চাহিয়াছিল?

দুর্গা একটা ছোট্ট মানকচু কোথা হইতে জোগাড় করিয়া আনিয়া রান্নাঘরে ধরনা দিয়া বসিয়া থাকে। তাহার মা বলে, তোর হোল কি দুগগা? আজ কি বলে ভাত খাবি? কাল সন্ধেবেলাও তো জ্বর এসেচে?

দুর্গা বলে, তা হোক মা, সে জ্বর বুঝি-একটু তো মোট শীত করলো?...তুমি এই মানকচুটা ভাতে দিয়ে দুটো ভাত-।

তাহার মা বলে-যাঃ, অসুখ হয়ে তোর খাই খাই বড় বেড়েছে। আজ কাল ভালো যদি থাকিস তো পরশু বরং দেবো–

অনেক কাকুতিমিনতির পর না পারিয়া শেষে দুর্গা মানকচু তুলিয়া রাখিয়া দেয়। খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, আপন মনে বলে, আজ খুব ভালো আছি, আজ আর জ্বর আসবে না। আমারওবেলা দুখানা বুটি আর আলুভাজ খাবো। একটু পরে হাই ওঠে, সে জানে ইহা জ্বর আসার পুর্বলক্ষণ। তবুও সে মনকে বোঝায়, হাইউঠুক, এমনি তো কত হাই ওঠে, জ্বর আর হবে না। ক্রমে শীত করে, রৌদ্রে গিয়া বসিতে ইচ্ছা হয়। সে রৌদ্রে না গিয়া মনকে প্রবোধ দেয় যে, শীত বোধ হওয়া একটা স্বাভাবিক শারীরিক ব্যাপার, জ্বর আসার সহিত ইহার সম্পর্ক কি?

কিন্তু কোনো প্রবোধ খাটে না। রৌদ্র না পড়িতে পড়িতে জ্বর আসে, সে লুকাইয়া গিয়া রৌদ্রে বসে, পাছে মা টের পায়। তাহার মন তুহু করে, ভাবে-জুর জ্বর ভেবে এরকম হচ্ছে, সত্যি সত্যি জ্বর হয়নি

রাঙা রোদ শ্যাওলাধরা ভাঙা পাচিলের গায়ে গিয়া পড়ে। বৈকালের ছায়া ঘন হয়। দুর্গার মনে হয় অন্যমনস্ক হইয়া থাকিলে জ্বর চলিয়া যাইবে। অপুকে বলে, বোস দিকি একটু আমার কাছে, আয় গল্প করি।

একদিন আর-বছর ঘন বর্ষার রাতে সে ও অপু মতলব আঁটিয়া শেষরাত্রে পিছনে সেজ ঠাকবুনদের বাগানে তাল কুড়াইতে গিয়াছিল, হঠাৎ দুর্গার পয়ে পটু করিয়া এক কাঁটা ফুটিয়া গেল। যন্ত্রণায় পিছু হটিয়া বাঁ পা-খানা যেখানে রাখিল, সেখানে বাঁ পায়েও পট্ করিয়া আর একটা।... সকাল বেলা দেখা গেল, পাছে রাত্রে উহারা কেহ তাল কুড়াইয়া লয়, এজন্য সতু তালতলার পথে সোজা করিয়া সারি সারি বেল-কাঁটা পুতিয়া রাখিয়াছে।

আর একদিন যা আশ্চর্য ব্যাপার!—

কোথা হইতে সেদিন এক বুড়া বাঙাল মুসলমান একটা বড় রং-চং করা কাঁচবসানো টিনের বাক্স লইয়া খেলা দেখাইতে আসে। ও-পাড়ায় জীবন চৌধুরীর উঠানে সে খেলা দেখাইতেছিল। দুর্গা পাশেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পয়সা ছিল না। আর সকলে এক এক পয়সা দিয়া বাক্সের গায়ে একটা চোঙের মধ্য দিয়া কি সব, দেখিতেছিল।

বুড়া মুসলমানটি বাক্স বাজাইয়া সুর করিয়া বলিতেছিল, তাজ বিবিকা রোজা দেখো, হাতি বাঘকা লড়াই দেখো! এক-একজনের দেখা শেষ হইলে যেমন সে চোঙ হইতে চোখ সরাইয়া লইতেছিল অমনি দুর্গা তাহাকে মহা আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছিল, কি দেখলি রে ওর মধ্যে? সব সত্যিকারের?

উঃ! সে কি অপূর্ব ব্যাপার দেখিয়াছে তাহা তাহারা বলিতে পারে না।...কি সে সব।

সকলের দেখা একে একে হইয়া গেল। দুর্গা চলিয়া যাইতেছিল, বুড়া মুসলমানটি বলিল, দেখবে না খুকি?...

দুর্গা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, নাঃ-ই-আমার কাছে পয়সা নাই।

লোকটি বলিল, এসো এসো খুকি, দেখে যাও-পয়সা লাগবে না—

দুর্গার একটু লজ্জা হইয়াছিল, মুখে বলিল,–নাঃ-কিন্তু আগ্রহে কৌতুহলে তাহার বুকের মধ্যে টিপ, টিপ করিয়া উঠিল।

লোকটি বলিল, এসো এসো, দোষ কি?...এসো, দ্যাখো—

দুর্গা উজ্জ্বল মুখে পায়ে পায়ে বাক্সের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল বটে, তবুও সাহস করিয়া মুখটা চোঙের মধ্যে দিতে পারে নাই। লোকটি বলিল, এই নলটার মধ্যে দিয়া তাকাও দিকি খুকি?

দুর্গা মাথার উড়ন্ত চুলের গোছা কানের পাশে সরাইয়া দিয়া চাহিয়া দেখিল। পরের দশ মিনিটের কথার সে কোনো বর্ণনা করিতে পারে না। সত্যকারের মানুষ ছবিতে কি করিয়া দেখা যায়? কত সাহেব, মেম, ঘরবাড়ি, যুদ্ধ, সে সব কথা সে বলিতে পারে না! কি জিনিসই। সে দেখিয়াছিল!

অপুকে দেখাইতে বড় ইচ্ছা করে, দুর্গা কতবার খুঁজিয়াছে, ও খেলা আর কোনওদিন আসে নাই।

গল্প ভালো করিয়া শেষ হইতে না হইতে দুর্গা জ্বরের ধমকে আর বসিতে পারে না, উঠিয়া ঘরের মধ্যে কাঁথা মুড়ি দিয়া শোয়,

আজকাল বাবা বাড়ি নাই, অপুকে আর খুঁজিয়া মেলা দায়। বই দপ্তরে ঘুণ ধরিবার জোগাড়গ হইয়াছে। সকাল বেলা সেই যে এক পুঁটুলি কড়ি লইয়া বাহির হয়, আর ফেরে একেবারে দুপুর ঘুরিয়া গেলে খাইবার সময়। তাহার মা বকে-ছেলের না নিকুচি করেচে-তোমার লেখাপড়া একেবারে ছিকেয় উঠলো? এবার বাড়ি এলে সব কথা বলে দেবো, দেখো এখন তুমি–

অপু ভয়ে ভয়ে দপ্তর লইয়া বসে। বইগুলো খুব চারিদিকে ছড়ায়। মাকে বলে, একটু খয়ের দাও মা, আমি দোয়াতের কালিতে দেবো।–

পরে সে বসিয়া বসিয়া হাতের লেখা লিখিয়া রৌদ্রে দেয়। শুকাইয়া গেলে খয়ের-ভিজানো কালি চক চক করে–অপু মহাখুশির সহিত সেদিকে, চাহিয়া থাকে-ভাবে-আর একটু খয়ের দেবো কাল থেকে-ওঃ কী চক চক করচে দেখো একবার! পানের বাটা হইতে মাকে লুকাইয়া বড় একখণ্ড খয়ের লইয়া কালির দোয়াতে দেয়। পরে লেখা লিখিয়া শুখাইতে দিয়া কতটা আজ জ্বলজ্বল করে দেখিবার জন্য কৌতুহলের সহিত সেদিকে চাহিয়া থাকে। মনে হয়-আচ্ছা যদি আর একটু দি?

একদিন মার কাছে ধরা পড়িয়া যায়। মা বলে, ছেলের লেখার সঙ্গে খোঁজ নেই। কেবল ড্যালা ড্যালা খয়ের রোজ দরকার।–রেখে দে খায়ের–

ধরা পড়িয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া বলে, খয়ের নৈলে কালি হয় বুঝি?...আমি বুঝি এমনি এমনি–

–না খয়ের নৈলে কালি হবে কেন? এইসব রাজ্যির ছেলে আর লেখাপড়া কচ্চে না–তাদের সেরা সোর খয়ের রোজ জোগানো রয়েছে যে দোকানো! যাঃ–

অপু বসিয়া বসিয়া একখানা খাতায় নাটক লেখে। বহু লিখিয়া খাতাখানা সে প্রায় ভরাইয়া ফেলিয়াছে, মন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় রাজা রাজ্য ছাড়িয়া বনে যান, রাজপুত্র নীলাম্বর ও রাজকুমারী অম্বা বনের মধ্যে দসুর হাতে পড়েন, ঘোর যুদ্ধ হয়, পরে রাজকুমারীর মৃতদেহ নদীতীরে দেখা যায়। নাটকে সতু বলিয়া একটি জটিল চরিত্র সৃষ্ট হইবার অল্পপরেই বিশেষ কোনো মারাত্মক দোষের বর্ণনা না থাকা সত্ত্বেও সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। নাটকের শেষদিকে রাজপুত্রী অম্বার নারদের বরে পুনজীবন প্রাপ্তি বা বিশ্বস্ত সেনাপতি জীবনকেতুর সহিত তাঁহার বিবাহ প্রভৃতি ঘটনায় যাহারা বলেন যে, গত বৈশাখ মাসে দেখা যাত্রার পালা হইতে এক নামগুলি ছাড়া মূলত কোন অংশই পৃথক নহে, বা সেই হইতেই ইহা হুবহু লওয়া, তাহারা ভুলিয়া যান যে, অতীতের কোনো এক নীরব জ্যোৎস্নময়ী রাত্রিতে নির্জন বাসকক্ষের স্তিমিত দীপশয্যায় এক প্রাচীন কবির নীলমেঘের মতো দৃশ্যমান ময়ুর-নিনাদিত দূর বনভূমির স্বপ্ন যদি কালিদাসকে মুক্ত মেঘের ভ্রমণ বর্ণনে অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে, তাহা হইলেই বা কি?...সে বিস্মৃতি শুভ-যামিনীর বন্দনা মানুষে নিজের অজ্ঞাতসারে হাজার বৎসর ধরিয়া করিয়া আসিতেছে।

আগুন দিয়াই আগুন জ্বালানো যায়, ছাই-এর টিপিতে মশাল গুজিয়া কে কোথায় মশাল জ্বলে?...

দপ্তরে একখানা বই আছে-বইখানার নাম চরিতমালা, লেখা আছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। পুরানো বই, তাহার বাবার নানা জায়গা হইতে ছেলের জন্য বইসংগ্রহ করিবার বাতিক আছে, কোথা হইতে একখানা আনিয়াছিল, অপু মাঝে মাঝে খানিকটা পড়িয়া থাকে। বইখানিতে যাঁহাদের গল্প আছে সে ওই রকম হইতে চায়। হাটে আলু বেচিতে পাঠাইলে কৃষকপুত্র রস্কো বেড়ার ধারে বসিয়া বীজগণিতের চর্চা করিত, কাগজের অভাবে চামড়ার পাতে ভোঁতা আল দিয়া অঙ্কাকষিত, মেষপালক ডুবাল ইতস্তত সঞ্চরণশীল মেঘদলকে যাদৃচ্ছি। বিচরণের সুযোগ দিয়া একমনে গাছতলায় বসিয়া ভুচিত্র পাঠে মগ্ন থাকিত-সে। ওই রকম হইতে চায়।. বীজগণিত’ কি জিনিস? সে বীজগণিত পড়িতে চায় রস্কোর মতো। সে এই হাতের

লেখা লিখিতে চায় না, ধারাপাত কি শুভঙ্করী এসব তাহার ভালো লাগে না। ওইরকম নির্জন গাছতলায়, বনের ছায়ায়, কি বেড়ার ধারে বসিয়া বসিয়া সে ‘‘ভুচিত্র’ (জিনিসটা কি?) পাতিয়া পড়িবে, বড় বড় বই পড়িবে, পণ্ডিত হইবে ওই রকম। কিন্তু কোথায় পাইবে সে সব জিনিস? কোথায় বা ‘ভূচিত্র’, কোথায় বা ‘বীজগণিত’, কোথায়ই বা ল্যাটিন ব্যাকরণ?—এখানে শুধুই কড়ি কষার আর্য, আর তৃতীয় নামতা।

মা বকিলে কি হইবে, যাহা সে পড়িতে চায়, তাহা এখানে কই?

# পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

কয়দিন খুব বর্ষা চলিতেছে। অন্নদা রায়ের চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধ্যাবেলায় মজলিশ বসে। সেদিন সেখানে নীলকুঠির ভূয়ো গল্প হইতে শুরু হইয়া পুরীর কোন মন্দিরের মাথায় পাঁচমন ভারী চুম্বক পাথর বসানো আছে, যাহার আকর্ষণের বলে নিকটবর্তী সমুদ্রগামী জাহাজ প্রায়ই পথভ্রষ্ট হইয়া আসিয়া তীরবর্তী মগ্ন শৈলে লাগিয়া ভাঙিয়া যায় প্রভৃতি-আরব্য উপন্যাসের গল্পের মতো নানা আজগুবি কাহিনীর বর্ণনা চলিতেছিল। শ্রোতাদের কাহারও উঠিবার ইচ্ছা ছিল না, এরকমআজগুবি গল্প ছাড়িয়া কাহারও বাড়ি যাইতে মন সরিতেছিল না। ভূগোল হইতে শীঘ্রই গল্পের ধারা আসিয়া জ্যোতিষে পৌঁছিল। দীনু চৌধুরী বলিতেছিলেন-ভৃগু-সংহিতার মতো আমন বই তো আর নেই! তুমি যাও, শুধু জন্মরাশিটা গিয়ে দিয়ে দাও, তোমার বাবার নাম, কোন কুলে জন্ম, ভূত ভবিষ্যৎ সব বলে দেবে-তুমি মিলিয়ে নাও—গ্রহ ও রাশিচক্রের যত রকম ইয়ে হয়-তা সব দেওয়া আছে কি না? মায় তোমার পূর্বজন্ম পর্যন্ত–

সকলে সাগ্রহে শুনিতেছিলেন, কিন্তু রামময় হঠাৎ বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিলেন-না, ওঠা যাক, এর পর যাওয়া যাবে না-দেখচো না-দেখচো না কাণ্ডখানা? একটা বড় ঝটুক-টাট্‌কা না হলে বঁচি, গতিক বড় খারাপ, চলো সব—

বৃষ্টির বিরাম নাই। একটু থামে, আবাব আমনি জোরে আসে, বৃষ্টির ছাটে চারিধার ধোঁয়া ধোঁয়া।

হরিহর মোট পাঁচটা টাকা পাঠাইয়াছিল, তাহার পর আর পত্রও নাই, টাকাও নাই। সেও অনেক দিন হইয়া গেল-রোজ সকালে উঠিয়া সর্বজয়া ভাবে আজ ঠিক খরচ আসিবে। ছেলেকে বলে, তুই খেলে খেলে বেড়াস বলে দেখতে পাসনে, ডাক-বাক্সটার কাছে বসে থাকবি-পিওন যেমন আসবে। আর অমনি জিজ্ঞেস করবি–

অপু বলে-বা, আমি বুঝি বসে থাকি নে? কালও তো এলো পুটিদের চিঠি, আমাদের খবরের কাগজ দিয়ে গেল-জিজ্ঞেস করে এসো দিকি পুটকে? কাল তবে আমাদের খবরের কাগজ কি করে এলো? আমি থাকিনে বই কি?

বর্ষা রীতিমতো নামিয়াছে। অপু মায়ের কথায় ঠোয় রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপে পিওনের প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে। সাধু কর্মকারের ঘরে চালা হইতে গোলা পায়রার দল ভিজিতে ভিজিতে ঝটাপট করিয়া উড়িতে উড়িতে রায়েদের পশ্চিমের ঘরের কার্নিসে আসিতেছে, চাহিয়া চাহিয়া দ্যাখে। আকাশের ডাককে সে বড় ভয় করে। বিদ্যুৎ চমকাইলে মনে মনে ভাবে-দেবতা কিরকম নলপাচ্চে দেখেচোঁ, এইবার ঠিক ডাকবে-পরে সে চোখ বুজিয়া কানে আঙুল দিয়া থাকে।

বাড়ি ফিরিয়া দ্যাখে মা ও দিদি সারা বিকাল ভিজিতে ভিজিতে রাশীকৃত কচুর শাক তুলিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় জড়ো করিয়াছে।

অপু বলে-কোথেকে আনলে মা? উঃ কত!

দুর্গা হাসিয়া বলে-কত- উ-উঃ! তোমার তো বসে বসে বড় সুবিধে1.ওই ওদের ডোবার জামতলা থেকে-এই এতটা এক হ্যাঁটু জল। যাও দিকি?...

সকালে ঘাটে গিয়া নাপিত-বৌয়ের সঙ্গে দেখা হয়। সর্বজয়া কাপড়ের ভিতর হইতে কাসার একখানা রেকবি বাহির করিয়া বলে, এই দ্যাখো জিনিসখানা, খুব ভালো-ভরণ না, কিছু না, ফুল কাঁসা। তুমি বলেছিলে, তাই বলি যাই নিয়ে-এ সে জিনিস নয়, এ আমার বিয়ের দান—এখন এ জিনিস আর মেলে না

অনেক দরদস্তুরের পর নাপিত-বৌ নগদ একটি আধুলি আঁচল হইতে খুলিয়া দিয়া রেকর্মবিখানা কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া লয়। কাউকে যেন না প্রকাশ করে–সর্বজয়া এ অনুরোধ বার বার করে।

দুই একদিনে ঘনীভূত বর্ষা নামিল। তুহু পুবে হাওয়া, খানাডোবা সব থই থই করিতেছেপথে ঘাটে একহ্যাঁটু জল, দিনরাত সো সো, বাশবনে ঝড় বাধে-বাঁশের মাথা মাটিতে লুটাইয়া লুটাইয়া পড়ে-আকাশের কোথাও ফাক নাই-মাঝে মাঝে আগেকার চেয়ে অন্ধকার করিয়া আসে-কালো কালো মেঘের রাশ হু-হু, উড়িয়া পুব হইতে পশ্চিমে চলিয়াছে-দূর আকাশের কোথায় যেন দেবাসুরের মহাসংগ্রাম বাধিয়াছে, কোন কৌশলী সেনানায়কের চালনায় জলস্থলআকাশ একাকারে ছাইয়া ফেলিয়া বিরাট দৈত্যসৈন্য, বাহিনীর পর বাহিনী, অক্ষৌহিণীৰ পর অক্ষৌহিণী, অদৃশ্য রথী-মহারথীদের নায়কত্বে ঝড়ের বেগে অগ্রসর হইতেছে-প্রজ্বলন্ত অত্যুগ্র দেববাজ আগুন উড়াইয়া চক্ষের নিমেষে বিশাল কৃষ্ণচমূর এদিক-ওদিক পর্যন্ত ছিঁড়িয়া ফাঁড়িযা এই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেছে-এই আবার কোথা হইতে রক্তবীজের বংশ করাল কৃষ্ণছায়ায় পৃথিবী অন্তরীক্ষা অন্ধকার করিয়া ঘিরিয়া আসিতেছে।

মহাঝড়!

দিন রাত সোঁ-সোঁ শব্দ-নদীর জল বাড়ে-কত ঘরদোর কত জায়গায় যে পড়িয়া গেল!...নদী নালা জলে ভাসিয়া গিয়াছে-গরু-বাছুর গাছের তলে, বাশবনে, বাড়ির ছাঁচতলায় অঝোরে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে, পাখি-পাখালির শব্দ নাই কোনোদিকে! চাব পাঁচ দিন সমান ভাবে কাটিল–কেবল ঝড়ের শব্দ আর অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণ!-অপু

দাওয়ায় উঠিয়া তাড়াতাড়ি ভিজা মাথা মুছিতে মুছিতে বলিল-আমাদের বাঁশতলায় জল এসেচে দিদি, দেখবি?

দুর্গা কাঁথা মুড়ি দিয়া শুইয়াছিল–না উঠিয়াই বলিল-কতখানি জল এসেচে রে?...

অপু বলে, তোর জ্বর সারলে কাল দেখে আসিস। ... তেঁতুলতলার পথে হাঁটু জল! পরে জিজ্ঞাসা করে-মা কোথায় রে?

ঘরে একটা দানা নেই।–দুটোখানি বাসি চালভাজা মাত্র আছে। অপু কান্নাকাটি করে,—তা হবে না। মা, আমার খিদে পায় না বুঝি—আমি দুটি ভাত খাবো।–হুঁ-উ-

তার মা বলিল, লক্ষ্মী মানিক আমাব-ও রকম কি করে। অনেক করে চালভাজা মেখে দেবো। এখন-রাধবো কেমন করে; দেখচিস নে কি রকম সেওটা করেচে?-উনুনের মধ্যে এক উনুন জল যে? পরে সে কাপড়ের ভিতর হইতে একটা কি বাহির করিয়া হাসিমুখে দেখাইয়া বলে-এই দ্যাখ একটা কইমাছ বাঁশতলায় কানে হেঁটে দেখি বেড়াচ্চে—বন্যের জল পেয়ে সব উঠে আসছে গাঙ থেকে-বরোজ পোতার ডোবা ভেসে নদীর সঙ্গে এক হয়ে গিয়েচে কিনা?...তাই সব উঠে আসচে—

দুর্গা কাঁথা ফেলিয়া ওঠে-অবাক হইয়া যায়। বলে, দেখি মা মাছটা? হ্যাঁ মা, কইমাছ বুঝি কানে হেঁটে বেড়ায়? আর আছে?...

অপু এখনই বৃষ্টিমাথায় ছুটিয়া যায় আর কি-অনেক কষ্ট তাহার মা তাহাকে থামায়।

দুর্গা বলে–একটু জ্বর সারলে কাল সকালে চল অপু, তুই আর আমি বাঁশবাগান থেকে মাছ নিয়ে আসবো এখন। পরে সে অবাক হইয়া ভাবে-বাঁশাবাগানে মাছ! কী করে এল? বাঃ তো!– মা কি আর ডালো করে খুঁজেচে। খুঁজলে আরও সেখানে আছে-দেখতে পেলাম না কি রকম কইমাছ কানো হ্যাঁটে-কাল সকালে দেখবো-সকালে জ্বর সেরে যাবে–

চারিদিকে বন-বাগান ঘিরিয়া সন্ধ্যা নামে। সন্ধ্যার মেঘে ত্রয়োদশীর অন্ধকারে চারিধার একাকার। দুর্গা যে বিছানা পাতিয়া শুইয়া আছে, তাহারই এক পাশে তাহার মা ও অপু বসে। সর্বজয়া ভাবে-আজ যদি এখখুনি একখানা পত্তর আসে নীরেন বাবাজীর? কি জানি, তা হতে কি আর পারে না? নীরেন তো পছন্দই করে গিয়েচেন-কি জানি কি হল আদেষ্টে! নাঃ, সে সব কি আর আমার আদেষ্টে হবে? তুমিও যেমন! তা হলে আর ভাবনা ছিল কি?

ওদিকে ভাইবোনে তুমুল তর্ক বাধিয়া যায়। অপু সরিয়া মায়ের কাছে ঘেঁষিয়া বসে- ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেজায় শীত করে। হাসিয়া বলে—মা-কি? সেই–শ্যামলঙ্কা বাটুনা বাটে মাটিতে লুটায় কেশ?...

দুর্গা বলে-ততক্ষণে মা আমার ছেড়ে গিয়েচেন দেশ—

অপু বলে-দূর-হ্যাঁ মা তাই? ততক্ষণে মা আমার ছেড়ে গিয়েচেন দেশ?-কথা বলিয়াই সে দিদির অজ্ঞতায় হাসে।

সর্বজয়ার বুকে ছেলের অবোধ উল্লাসের হাসি শেলের মতো বেঁধে। মনে মনে ভাবে- সাতটা নয় পাঁচটা নয়-এই তো একটা ছেলে–কি আদেষ্ট যে করে এসেছিলাম–তার মুখের আবদার রাখতে পারিনে-ঘি না, লুচি না, সন্দেশ না-কি না শুধু দুটো ভাত-নিনকি?!...আবার ভাবেএই ভাঙা ঘর, টানাটানির সংসার।–অপু মানুষ হলে আর এ দুঃখ থাকবে না।–ভগবান তাকে মানুষ করে তোলেন যেন।...

তাহার পর সে বসিয়া বসিয়া গল্প করে, যখন প্রথম সে নিশ্চিন্দিপুরে ঘর করিতে আসিয়াছিল, তখন এক বৎসর এই রকম অবিশ্রান্ত বর্ষায় নদীর জল এত বাড়িয়াছিল যে ঘাটের পথে মুখুজ্যেবাগানের কাছে বড় বোঝাই নৌকা পর্যন্ত আসিয়াছিল।

অপু বলে-কত বড় নৌকো মা?

—মস্ত-ওই যে খোট্টাদের চুনের নৌকো, সাজিমাটির নৌকো, মাঝে মাঝে আসে দেখিচিস তো—অত বড়–

দুর্গা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে-মা তুমি চারগুছির বিনুনি করতে জানো?

অনেক রাত্রে সর্বজয়ার ঘুম ভাঙিয়া যায়–অপু ডাকিতেছে-মা, ওমা ওঠে- আমার গায়ে জল পড়াচে–

সর্বজয়া উঠিয়া আলো জ্বলে-বাহিরে ভয়ানক বৃষ্টির শব্দ হইতেছে। ফুটা ছাদ দিয়া ঘরের সর্বত্র জল পড়িতেছে। সে বিছানা সরাইয়া পাতিয়া দেয়। দুর্গা অঘোর জ্বরে শুইয়া আছে—তাহার মা গায়ে হাত দিযা দ্যাখে তাহার গায়ের কাঁথা ভিজিয়া সাপ সাপ করিতেছে। ডাকিয়া বলে-দুর্গও দুর্গা শুনছিস?...একটু ওঠু দিকি? বিছানাটা সরিয়ে নি—ও দুর্গ-শিগগির, একেবারে ভিজে গোল যে সব?...

ছেলেমেয়ে ঘুমাইয়া পড়িলেও সর্বজয়ার ঘুম আসে না। অন্ধকার রাত-এই ঘন বর্ষা...তাহার মন ছমছম করে-ভয় হয় একটা যেন কিছু ঘটিবে.কিছু ঘটিবে। বুকের

মধ্যে কেমন যেন করে। ভাবে- সে মানুষেরই বা কি হল? কোন পত্তিরও আসে না'—টাকা মরুকগে যাক। এরকম তো কোনোবার হয় না?…তার শরীরটা ভালো আছে তো? মা সিদ্ধেশ্বরী, স-পাঁচ আনার ভোগ দেবো, ভালো খবর এনে দাও মা–

তার পরদিন সকালের দিকে সামান্য একটু বৃষ্টি থামিল। সবজয়া বাটীর বাহির হইয়া দেখিল বাশবনের মধ্যে ছোট ডোবাটা জলে ভর্তি হইয়া গিয়াছে। ঘাটের পথে নিবারণের মা ভিজিতে ভিজিতে কোথায় যাইতেছিল, সর্বজয়া ডাকিয়া বলিল-ও নিবারণের মা শোনা—পরে সলজভাবে বলিল-সেই তুই একবার বলিছিলি না, বিন্দবুনি চাদরের কথা তোর ছেলের জন্যে-তা নিবি?…

নিবারণের মা বলিল-আছে? দেয়া একটু ধীবুক, মোর ছেলেরে সঙ্গে করে এখনি আসবো এখন-নতুন আছে মা-ঠাকুরোন, না পুরোনো?…

সর্বজয়া বলিল, তুই আয় না-এখুনি দেখবি?…একটু পুরোনো, কিন্তু সে কেউ গায়ে দেয় নি-ধোয়া তোলা আছে-পরে একটু থামিয়া বলিল-তোরা আজকাল চাল ভানচিস নে?.

নিবারণের মা বলিল-এই বাদলায় কি ধান শূকোয় মা ঠাকুরোন…খাবার বলে দুটোখানি রেখে দিইচি অমনি

সর্বজয়া বলিল-এক কাজ করা না-তাই গিয়ে আমায় আধকাটা খানেক আজ দিয়ে যাবি?. একটু সরিয়া আসিয়া মিনতির সুরে বলিল-বৃষ্টির জন্যে বাজার থেকে চাল আনাবার লোক পাচ্চিনে-টাকা নিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চি তা কেউ যদি রাজি হয়—বড় মুশকিলে পড়িচি মা–

নিবারণের মা স্বীকার হইয়া গেল, বলিল-আসবো এখন নিয়ে, কিন্তু সে ভেটের ধানের চালির ভাত কি আপনারা খেতে পারবেন মা-ঠাকুরোন?…বড্ড মোটা—

নিমছাল সিদ্ধ দুর্গা আর খাইতে পারে না। তাহার অসুখ একভাবেই আছে। ঔষধনাই, পথ্য নাই, ডাক্তার নাই, বৈদ্য নাই। বলে–এক পয়সার বিস্কুট আনিয়ে দেবে মা, নোনতা, মুখে বেশ লাগে।

সাবু তাই জোটে না, তার বিস্কুট।

বৈকালবেলা হইতে আবার ভয়ানক বৃষ্টি নামিল। বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ও যেন বেশি করিয়া আসে-ঘোর বর্ষণমুখর নির্জন, জলে থই-থই, কুহু পুবে হাওয়া বওয়া, মেঘে অন্ধকারে একাকার ভাদ্র-সন্ধ্যা! আবার সেই রকম কালো কালো পেঁজা তুলোর মতো মেঘ

উড়িয়া চলিয়াছে।...বৃষ্টির শব্দে কান পাতা যায় না—দরজা জানোলা দিযা ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটার সঙ্গে বৃষ্টির ছাট দু-জু করিয়া ঢোকে-ছেড়া থলে ছেড়া কাপড়-গোঁজা ভাঙা কাবাটের আড়ালের সাধ্য কি যে ঝড়ের ভীম আক্রমণের মুখে দাঁড়ায়।

বেশি রাত্রে সকলে ঘুমাইলে বেশি বৃষ্টি নামিল। সর্বজয়ার ঘুম আসে না—সে বিছানায উঠিয়া বসে। বাহিরে শুধু একটানা ফুস হ্রস জলের শব্দ; কুদ্ধ দৈত্যের মতো গজমান একটানা গোঁ গোঁ বাবে ঝড়ের দমকা বাড়িতে বাধিতেছে! ...জীর্ণ কোঠাখানা এক-একবাবেবী দমকায় যেন থর থর কবিয়া কঁপে,.ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া যায়.গ্রামের একাধারে বাঁশবনের মধ্যে ছোট ছোট ছেলেমেযে লইয়া নিঃসহায়!.মনে মনে বলে-ঠাকুর, আমি মারি তাতে খেতি নেই-এদেব কি করি?-এই রাত্তিরে যাই বা কোথায়?... মনে মনে বসিয়া বসিয়া ভাবে-আচ্ছা যদি কোঠা পড়ে, তবে দালানের দেওয়ালটা বোধ হয় আগে পড়বে।-যেমন শব্দ হবে আমনি পানচালার দোর দিয়ে এদের টেনে বাব করে নেবো–

সে যেন আর বসিয়া থাকিতে পারে না-কয়দিন সে ওলশাক কচুশাক সিদ্ধ করিয়া খাইয়া দিন কটাইতেছে–নিজে উপবাসের পর উপবাস দিয়া ছেলেমেয়েকে যাহা কিছু সামান্য খাদ্য ছিল খাওয়াইতেছে- শরীর ভাবনায় অনাহারে দুর্বল, মাথার মধ্যে কেমন করে।

ঝড়ের গোঁ গো শব্দ, অনেক রাত্রে ঝড় বাড়িল। বাহিরে কি ঝটিকা আসিল! উপায়! একবার বড় একটা দমকায় ভয় পাইয়া সে ঝড়ের গতিক বুঝিবার জন্য সন্তর্পণে দালানের দুয়ার খুলিয়া বাইরের রোয়াকে মুখ বাড়াইল.বৃষ্টির ছাটে কাপড় চুল সব ভিজিয়া গেল-জু দুএকটানা হওয়ার শব্দে বৃষ্টিপতনের ঝড়ের শব্দ ঢাকিয়া গিয়াছে- বাহিরে কিছু দেখা যায় না-অন্ধকারের মেঘে। আকাশে বাতাসে গাছপালায় সব একাকার! ঝড়-বৃষ্টির শব্দে আর কিছু শোনা যায় না।

এই হিংস্র অন্ধকার ও ক্রুর ঝটিকাময়ী রজনীর আত্মা যেন প্রলয়দেবের দূতরূপে ভীম। ভৈরব বেগে সৃষ্টি গ্রাস করিতে ছুটিয়া আসিতেছে-অন্ধকারে, রাত্রে, গাছপালায়, আকাশে, মাটিতে তাহার গতিবেগ বাধিয়া শব্দ উঠিতেছে-সুইশ সু-উ-উ-উইশসু উ উ উ ই শ...এই শব্দের প্রথমাংশের দিকে বিশ্বগ্রাসী দূতটা যেন পিছু হটিয়া বল সঞ্চয় করিতেছে-সু উ উ—এবং শেষের অংশটায় পৃথিবীর উচ্চ নীচ তাবৎ বায়ুস্তর আলোড়ন, মন্থন করিয়া বায়ুস্তরে বিশাল তুফান তুলিয়া তাহার সমস্ত আসুরিকতার বলে সর্বজয়াদের জীর্ণ কোঠাটার পিছনে ধাক্কা দিতেছে-ইই শ..! কোঠা দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে...আর থাকে না! ইহার মধ্যে যেন কোনো অধীরতা, বিশৃঙ্খলতা, ভ্রম-ভ্রান্তি নাইযেন দৃঢ়, অভ্যস্থ, প্রণালীবদ্ধ ভাবের কর্তব্যকার্য.বিশ্বটাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে

চুর্ণ করিয়া উড়াইয়া দেওয়ার ভার যে লইয়াছে, যুগে যুগে এরকম কত হাস্যমুখী সৃষ্টিকে বিধ্বস্ত করিয়া অনন্ত আকাশের অন্ধকারে তারাবাজির মতো ছড়াইয়া দিয়া আসিয়াছে যে মহাশক্তিমান ধ্বংসদূত-এ তার অভ্যস্ত কার্য...এতে তার অধীরতা উন্মত্ততা সাজে না...

আতঙ্কে সর্বজয়া দোর বন্ধ করিয়া দিল.আচ্ছা যদি এখন একটা কিছু ঘরে ঢোকে? মানুষ কি অন্য কোন জানোয়ার? চারিদিকে ঘন বাঁশবন, জঙ্গল, লোকজনের বসতি নাই-মাগো! জলের ছাটে ঘর ভাসিয়া যাইতেছে...হাত দিয়া দেখিল ঘুমন্ত অপুর গা জলে ভিজিয়া ন্যাত হইয়া যাইতেছে..সে কি করে? আর কত রাত আছে? সে বিছানা হাতড়াইয়া দেশলাই খুঁজিয়া কেরোসিনের ডিবাটা জ্বলে। ডাকে-ও অপু ওঠ তো? জল পড়চে—। অপু ঘুমচোখে জড়িত গলায় কি বলে বোঝা যায় না। আবার ডাকে-অপু? শূনচিস ও অপু? ওঠু দিকি! দুর্গাকে বলে-পোশ ফিরে শো তো দুগগা। বড় জল পড়চে-একটু সরে, পাশ ফের দিকি-

অপু উঠিয়া বসিয়া ঘুমচোখে চারিদিকে চায়—পরে আবার শুইয়া পড়ে। কুড়মা করিয়া বিষম কি শব্দ হয়, সর্বজয়া তাড়াতাড়ি আবার দুয়ার খুলিয়া বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিল— বাঁশবাগানের দিকটা ফাঁকা ফাঁকা দেখাইতেছে–রান্নাঘরের দেওয়াল পড়িয়া গিয়াছে?...তাহার বুক কঁপিয়া ওঠে-এইবার বুঝি পুরানো কোঠোটা–? কে আছে, কাহাকে সে এখন ডাকে? মনে মনে বলে-হে ঠাকুর, আজকার রাতটা কোনো রকমে কাটিয়ে দাও, হে ঠাকুর, ওদের মুখের দিকে তাকাও—

তখনও ভালো করিয়া ভোর হয় নাই, ঝড় থামিয়া গিয়াছে কিন্তু বৃষ্টি তখনও অল্প অল্প পড়িতেছে। পাড়ার নীলমণি মুখুজ্যের স্ত্রী গোহালে গরুর অবস্থা দেখিতে আসিতেছেন, এমন সময় খিড়কিদোরে বার বার ধাক্কা শুনিয়া দোর খুলিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন-নতুন বৌ!..সর্বজয়া ব্যস্তভাবে বলিল-নাদি, একবার বটুটাকুরকে ডাকো দিকি?...একবার শিগগির আমাদের বাড়িতে আসতে বলো-দুগগা কেমন করচে!

নীলমণি মুখুজ্যের স্ত্রী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—দুগ্রগা? কেন কি হয়েছে দুগগার?...

সর্বজয়া বলিল-কদিন থেকে তো জ্বর হচ্ছিল-হচ্ছে। আবার যাচ্ছে-ম্যালেরিয়ার জ্বর, কাল সন্দে থেকে জ্বর বড্ড বেশি।–তার ওপর কাল রাত্রে কি রকম কাণ্ড তো জানেই-একবার শিগগির বটুঠাকুরকে–

তাহার বিস্রস্ত কেশ ও রাত-জাগা রাঙা রাঙা চোখের কেমন দিশাহারা চাহনি দেখিয়া নীলমণি মুখুজ্যের স্ত্রী বলিলেন-ভয় কি বৌ-দাঁড়াও আমি এখুনি ডেকে দিচ্চি-চল আমিও যাচ্ছি।–কাল আবার রাত্তিরে গোয়ালের চালাখানা পড়ে গেল-বাবা, কাল

রাত্তিরের মতো কাণ্ড আমি তো কখনও দেখিনি-শেষরাত্রে সব উঠে গাবু টাবু সরিয়ে রেখে আবার শুয়োচে কিনা?...দাঁড়াও আমি ডাকি–

একটু পরে নীলমণি মুখুজ্যে, তাহার বড় ছেলে ফণি, স্ত্রী ও দুই মেয়ে সকলে অপুদের বাড়িতে আসিলেন। রাত্রের অন্ধকারে সেই দৈত্যটা যেন সারা গ্রামখানা দলিত, পিষ্ট, মথিত করিয়া দিয়া আকাশ-পথে অন্তহিত হইয়াছে-ভাঙা গাছের ডাল, পাতা, চালের খড়, কাঁচা বাঁশপাতা, বাঁশের কঞ্চিতে পথ ঢাকিয়া দিয়াছে-ঝড়ের বাঁশ নুইয়া পথ আটকাইয়া রহিয়াছে। ফণি বলিল-দেখেচোন বাবা কাণ্ডখানা? সেই নবাবগঞ্জের পাকা রাস্তা থেকে বিলিতি তট্‌কা গাছটার পাতা উড়িয়ে এনেচে!...নীলমণি মুখুজ্যের ছোট ছেলে একটা মরা চড়ুই পাখি বাঁশপাতার ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিল।

দুর্গার বিছানার পাশে অপু বসিয়া আছে-নীলমণি মুখুজ্যে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন-কি হয়েছে বাবা অপু?

অপুর মুকে উদ্বেগের চিহ্ন। বলিল, দিদি কি সব বকছিল জেঠামশায়।

নীলমণি বিছানার পাশে বসিয়া বলিলেন-দেখি হাতখানা?...জ্বরটা একটু বেশি, আচ্ছা! কোনো ভয় নেই।–ফণি, তুমি একবার চট করে নবাবগঞ্জে চলে যাও দিকি শরৎ ডাক্তারের কাছেএকেবারে ডেকে নিয়ে আসবে। পরে তিনি ডাকিলেন-দুর্গা, ও দুর্গা? দুর্গার অঘোর আচ্ছন্ন ভাব, সাড়া শব্দ নাই। নীলমণি বলিলেন, এঃ, ঘরদোরের অবস্থা তো বড্ড খারাপ? জল পড়ে কাল রাত্রে ভেসে গিয়েছে...তা বৌমার লজ্জার কারণই বা কি-আমাদের ওখানে না হয় উঠলেই হ’ত? হরিটারও কাণ্ডজ্ঞান আর হল না। এ জীবনে–এই অবস্থায় এইরকম ঘরদের সারানোর একটা ব্যবস্থা না করে কি যে কারচে, তাও জানিনে-চিরকালটা ওর সমান গেল–

তাহার স্ত্রী বলিলেন-ঘর সারাবে কি, খাবার নেই ঘরে, নৈলে কি এরকম আতান্তরে ফেলে কেউ বিদেশে যায়? আহা, রোগা মেয়েটা কাল সারাৱাত ভিজোচে–একটু জল গরম করতে দাওওই জানালাটা খুলে দাও তো ফণি?

একটু বেলায় নবাবগঞ্জ হইতে শরৎ ডাক্তার আসিলেন-দেখিয়া শুনিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। বলিয়া গেলেন যে বিশেষ ভয়ের কোনো কারণ নাই, জ্বর বেশি হইয়াছে, মাথায় জলপটি নিয়মিতভাবে দেওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন। হরিহর কোথায় আছে জানা নাই-তবুও তাহার পূর্ব ঠিকানায় তাহাকে একখানি পত্র দেওয়া হইল।

পরদিন ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গেল—আকাশের মেঘ কাটিতে শুরু করিল। নীলমণি মুখুজ্যে দু’বেলা নিয়মিত দেখাশোনা করিতে লাগিলেন। ঝড় বৃষ্টি থামিবার পরদিন

হইতেই দুর্গার জ্বর আবার বড় বাড়িল। শরৎ ডাক্তার সুবিধা বুঝিলেন না। হরিহরকে আর একখানা পত্র দেওয়া হইল।

অপু তাহার দিদির মাথার কাছে বসিয়া জলপটি দিতেছিল। দিদিকে দু-একবার ডাকিল-ও দিদি শুনছিস, কেমন আছিস, ও দিদি? দুর্গার কেমন আচ্ছন্ন ভাব। ঠোঁট নড়িতেছে–কি যেন আপন মনে বলিতেছে, ঘোর ঘোর। অপু কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া দু-একবার চেষ্টা করিয়াও কিছু বুঝিতে পারিল না।

বৈকালের দিকে জ্বর ছাড়িয়া গেল। দুর্গা আবার চোখ মেলিয়া চাহিতে পারিল এতক্ষণ পরে। ভারি দুর্বল হইয়া পড়িয়াচে, চিটি করিয়া কথা বলিতেছে, ভালো করিয়া না শুনিলে বোঝা যায় না কি বলিতেছে।

মা গৃহকার্যে উঠিয়া গেলে অপু দিদির কাছে বসিয়া রহিল। দুর্গা চোখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল-বেলা কত রে?

অপু বলিল।–বেলা এখনও অনেক আছে–রাদ্দুর উঠেচে আজ দেখিচিসি দিদি? এখনও আমাদের নারকেল গাছের মাথায় রোদ্দুর রয়েচে–

খানিকক্ষণ দুজনেই কোনো কথা বলিল না। অনেকদিন পরে রৌদ্র ওঠাতে অপুর ভরি আহ্লদ হইয়াছে। সে জানালার বাহিরে রৌদ্রালোকিত গাছটার মাথায় চাহিয়া রহিল।

খানিকটা পরে দুর্গা বলিল-শোন অপু-একটা কথা শোন-

-কি রে দিদি? পরে সে দিদির মুখের আরও কাছে মুখ লইয়া গেল।

-আমায় একদিন তুই রেলগাড়ি দেখাবি?

–দেখাবো এখন-তুই সেরে উঠলে বাবাকে বলে আমরা সব একদিন গঙ্গা নাইতে যাবো রেলগাড়ি করে—

সারা দিন রাত্রি কাটিয়া গেল। ঝড় বৃষ্টি কোনও কালে হইয়াছিল মনে হয় না। চারিধারে দারুণ শরতের রৌদ্র।

সকাল দশটার সময় নীলমণি মুখুজ্যে অনেকদিন পরে নদীতে স্নান করিতে যাইবেন বলিয়া তেল মাখিতে বসিয়াছেন, তাহার স্ত্রীর উত্তেজিত সুর তার কানে গোল-ওগো, এসো তো একবার এদিকে শিগগির-অপুদের বাড়ির দিক থেকে যেন একটা কান্নার গলা পাওয়া যাচ্চে

ব্যাপার কি দেখিতে সকলে দুটিয়া গেলেন।

সর্বজয়া মেয়ের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিতেছে-ও দুগগা চা দিকি-ওমা, ভালো করে চা দিকি-ও দুগগা—

নীলমণি মুখুজ্যে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন–কি হয়েচে-সরো সব, সরো দিকি-আহা কি সব বাতাসটা বন্ধ করে দাড়াও?

সর্বজয়া ভাসুর-সম্পর্কের প্রবীণ প্রতিবেশীর ঘরের মধ্যে উপস্থিতি ভুলিয়া গিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল-ওগো, কি হল, মেয়ে আমন করচে কেন?

দুর্গা আর চাহিল না।

আকাশের নীল আস্তরণ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে অনন্তের হাতছানি আসে-পৃথিবীর বুক থেকে ছেলেমেয়েরা চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া গিয়া অনন্ত নীলিমার মধ্যে ডুবিয়া নিজেদের হারাইয়া ফেলে–পরিচিত ও গতানুগতিক পথের বহুদূরপারে কোন পথহীন পথে-দুর্গার অশান্ত, চঞ্চল প্রাণের বেলায় জীবনের সেই সর্বাপেক্ষা বড় অজানার ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছে!

তখন আবার শরৎ ডাক্তারকে ডাকা হইল-বলিলেন—ম্যালেরিয়ার শেষ স্টেজটা আর কি-খুব জ্বরের পর যেন বিরাম হয়েচে আর আমনি হার্টফেল করে–ঠিক এরকম একটা case হয়ে গেল সেদিন দশঘরায়–

আধঘণ্টার মধ্যে পাড়ার লোকে উঠান ভাঙিয়া পড়িল।

# ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

হরিহর বাড়ির চিঠি পায় নাই।

এবার বাড়ি হইতে বাহির হইয়া হরিহর রায় প্রথমে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর যায়। কাহারও সঙ্গে তথায় পরিচয় ছিল না। শহর-বাজার জায়গা, একটা না একটা কিছু উপায় হইবে এই কুহকে পড়িয়াই সে সেখানে গিয়াছিল। গোয়াড়ীতে কিছুদিন থাকিবার পর সে সন্ধান পাইল যে, শহরে উকিল কি জমিদারের বাড়িতে দৈনিক বা মাসিক চুক্তি হিসারে চণ্ডীপাঠ করার কার্য প্রায়ই জুটিয়া যায়। আশায় আশায় দিন পনেরো কাটাইয়া বাড়ি হইতে পথখরচ বলিয়া যৎসামান্য যাহা কিছু আনিয়াছিল ফুরাইয়া ফেলিল, অথচ কোথাও কিছু সুবিধা হয় না।

সে পড়িল মহাবিপদে-অপরিচিত স্থান, কেহ একটি পয়সা দিয়া সাহায্য করে এমন নাইখোড়ে বাজারের যে হোটেলটিতে ছিল পয়সা ফুরাইয়া গেলে সেখান হইতে বাহির হইতে হইল। একজনের নিকট শুনিল স্থানীয় হরিসভায় নবাগত অভাবগ্রস্ত ব্রাহ্মণ পথিককে বিনামূল্যে থাকিতে ও খাইতে দেওয়া হয়। অভাব জানাইয়া হরিসভার একটা কুঠুরির একপাশে থাকিবার স্থান পাইল বটে, কিন্তু সেখানে বড় অসুবিধা, অনেকগুলি নিষ্কর্মা গাঁজাখোর লোক রাত্রিতে সেখানে আড়া করে, প্রায় সমস্ত রাত্রি হৈ হৈ করিয়া কাটায়, এমন কি গভীর রাত্রিতে এক-একদিন এমন ধরনের স্ত্রীলোকের যাতায়াত দেখা যাইতে লাগিল যাহ্যাঁদের ঠিক হরিমন্দির দর্শন-প্রাথিনী ভদ্রমহিলা বলিয়া মনে হয় না। অতিকষ্টে দিন কটাইয়া সে শহরের বড় বড় উকিল ও ধনী গৃহস্থের বাড়িতে ঘুরিতে লাগিল। সারাদিন ঘুরিয়া অনেক রাত্রিতে ফিরিয়া এক-একদিন দেখিত তাহার স্থানটিতে তাহারই বিছানাটি টানিয়া লইয়া কে—একজন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। হরিহর কয়েকদিন বাহিরের বারান্দায় শুইয়া কটাইল। প্রায়ই এরূপ হওয়াতে ইহা লইয়া গাঁজাখের সম্প্রদায়ের সহিত তাহার একটু বাচসা হইল। পরদিন প্রাতে তাহারা হরিসভার সেক্রেটারির কাছে গিয়া কি লাগাইল তাহারাই জানে—সেক্রেটারি-বাবু নিজ বাড়িতে হরিহরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন ও বলিলেন, তাহদের হরিসভায় তিনদিনের বেশি থাকিবার নিয়ম নাই, সে যেন অন্যত্র বাসস্থান দেখিয়া লয়।

সন্ধ্যার পরে জিনিসপত্র লইয়া হরিহরকে হরিসভার বাড়ি হইতে বাহির হইতে হইল।

খোড়ে নদীর ধারে অল্প একটু নির্জন স্থানে পুটুলিটা নামাইয়া রাখিয়া নদীর জলে হাত-মুখ ধুইল।

সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নাই-সেদিন একটি কাঠের গোলাতে বসিয়া শ্যামবিষয় গান করিয়াছিল-গোলার অধিকারী একটি টাকা প্রণামী দেয়-সেই টাকাটি হইতে কিছু পয়সা ভাঙাইয়া বাজার হইতে মুড়ি ও দই কিনিয়া আনিল। খাবার গলা দিয়া যেন নামে না-মাত্র দিনদশেকের সম্বল রাখিয়া সে বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছে। অদ্য প্রায় দুই মাসের উপর হইয়া গেল-এ পর্যন্ত একটি পয়সা পাঠাইতে পারে নাই-এতদিন কি করিয়া তাহদের চলিতেছে! অপু বাড়ি হইতে আসিবার সময় বার বার বলিয়া দিয়াছে—তাহার জন্য একখানা পদ্মপুরাণ কিনিয়া লইয়া যাইবার জন্য। ছেলে বই পড়িতে বড় ভালোবাসে-মাঝে মাঝে সে যে বাপের বাক্স-দপ্তর হইতে লুকাইয়া বই বাহির করিয়া লইয়া পড়ে, তাহা হরিহর বুঝিতে পারে-বাক্সের ভিতর আনাড়ি হাতের হেলাগোছা করা থাকে– কোন বই বাবা বাক্সর কোথায় রাখে, ছেলে তোহা জানে না-উলটা-পালটা করিয়া সাজাইয়া চুরি ঢাকিবার অক্ষম চেষ্টা করে—হরিহর বাড়ি ফিরিয়া বাক্স খুলিয়াই বুঝিতে পারে ছেলের কীর্তি।

তাহার বাড়ি হইতে আসিবার পূর্বে তুরিহর যুগীপাড়া হইতে একখানা বটতলার পদ্মপুরাণ পড়িবার জন্য লইয়া আসে-অপু বইখানা দখল করিয়া বসিল—রোজ রোজ পড়ে—কুচুনী পাড়ায় শিবঠাকুরের মাছ ধরিতে যাওয়ার কথাটা পড়িয়া তাহার ভারি আমোদ-হরিহর বলে-বইখানা দ্যাও বাবা, যাদের বই তারা চাচ্ছে যে! অবশেষে একখানা পদ্মপুরাণ তাঁহাকে কিনিয়া দিতে হইবেএই শর্তে বাবাকে রাজি করাইয়া। তবে সে বই ফেরত দেয়। আসিবার সময় বার বার বলিয়াছে।– সেই বইএকখানা এনে কিন্তু বাবা, এবার অবিশ্যি অবিশ্যি। দুর্গার উঁচু নজর নাই, সে বলিয়া দিয়াছে, একখানা সবুজ হাওয়াই কাপড় ও একপাত ভালো দেখিয়া আলতা লইয়া যাইবার জন্য। কিন্তু সে সব তো দূরের কথা, কি করিয়া বাড়িতে সংসার চলিতেছে সেই না এখন সমস্যা! সন্ধ্যার পর পূর্ব-পরিচিত কাঠের গোলটায় গিয়া সে রাত্রের মতো আশ্রয় লইল।ভালো ঘুম হইল নাবিছানায় শুইয়া বাড়িতে কি করিয়া কিছু পাঠায় এই ভাবনায় এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিল।

সকালে উঠিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সে লক্ষ্যহীন ভাবে পথের একস্থানে দাঁড়াইল। রাস্তার ওপারে। একটা লাল ইটের লোহার ফটকওয়ালা বাড়ি। অনেকক্ষণ চাহিয়া তাহার কেমন মনে হইল। এই বাড়িতে গিয়া দুঃখ জানাইলে তাহার একটা উপায় হইবে। কলের পুতুলের মতো সে ফটকের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। সাজানো বৈঠকখানা, মার্বেল পাথরের ধাপে স্তরে স্তরে বসানো ফুলের টব, পাথরের পুতুল, পাম, দরজায় ঢুকিবার স্থানে পা-পোষ পাতা। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বৈঠকখানায় খবরের কাগজ পড়িতেছেন-অপরিচিত লোক দেখিয়া কাগজ পাশে রাখিয়া সোজা হইয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি? কি দরকার?

হরিহর বিনীতভাবে বলিল-আজ্ঞে আমি ব্রাহ্মণ-সংস্কৃত পড়া আছে, চণ্ডী পাঠ-টাট্ করি।– তা ছাড়া ভাগবত কি গীতা পাঠও–

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি ভালো করিয়া কথা না শুনিয়াই তাহার সময়অত্যন্ত মূল্যবান, বাজে কথা শুনিবার সময় নিতান্ত সংক্ষেপ জানাইয়া দিবার ভাবে বলিলেন-না, এখানে ওসব কিছু এখন সুবিধে হবে না, অন্য জায়গায় দেখুন।

হরিহর মরীয় ভাবে বলিল-আজ্ঞে নতুন শহরে এসেচি, একেবারে কিছু হাতে নেই-বড় বিপদে পড়িচি, কদিন ধরে কেবলই–

প্রৌঢ় লোকটি তাড়াতাড়ি বিদায় করিবার ভঙ্গিতে ঠেস দেওয়ার তাকিয়াটা উঠাইয়া একটা কি তুলিয়া লইয়া হরিহরের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলেন–এই নিন, যান, অন্য কিছু হবে টবে না, নিন। সেটা যে শ্রেণীর মুদ্রাই হউক সেইটাই অন্য সুরে দিতে আসিলে হরিহর লাইতে কিছুমাত্র আপত্তি করিত না-এরূপ সে বহুস্থানে লইয়াছেও; কিন্তু সে বিনীতভাবে বলিল-আজ্ঞের আপনি রাখুন, আমি এমনি কারুর কাছে নিইনে—আমি শাস্ত্র পাঠ-টাটু করি।–তা ছাড়া কাবুর কাছে-আচ্ছা থাক–

একটু শুভযোগ বোধ হয় ঘটিয়াছিল। রক্ষিত মহাশয়ের কাঠের গোলাতেই একদিন একটা সন্ধান জুটিল। কৃষ্ণনগরের কাছে একটা গ্রামে একজন বর্ধিষ্ণু মহাজন গৃহ-দেবতার পূজা-পাঠ করিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ খুঁজতেছে, যে বরাবর টিকিয়া থাকিবে। রক্ষিত মহাশয়ের যোগাযোগে অবিলম্বে হরিহর সেখানে গেল-বাড়ির কর্তাও তাহাকে পছন্দ করিলেন। থাকিবার ঘর দিলেন, আদর-আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হইল না।

কয়েকদিন কাজ করিবার পরেই পূজা আসিয়া পড়িল। বাড়ি যাইবার সময় বাড়ির কর্তা দশ টাকা প্রণামী ও যাতায়াতের গাড়িভাড়া দিলেন, গোয়াড়ীতে রক্ষিত মহাশয়ের নিকট বিদায় লইতে আসিলে সেখান হইতেও পাঁচটি টাকা প্রণামী পাওয়া গেল।

আকাশে-বাতাসে গরম রৌদ্রের গন্ধ, নীল নির্মেঘ আকাশের দিকে চাহিলে মনে হঠাৎ উল্লাস আসে, বর্ষাশেষের সরস সবুজ লতাপাতায় পথিকের চরণভঙ্গিতে কেমন একটা আনন্দ মাখানো। রেলপথের দুপাশে কাশ ফুলের ঝাড় গাড়ির বেগে লুটাইয়া পড়িতেছে, চলিতে চলিতে কেবলই বাড়ির কথা মনে হয়।

একদল শান্তিপুরের ব্যবসায়ী লোক পূজার পূর্বে কাপড়ের গোট ক্রয় করিতে কলিকাতায় গিয়াছিল, চুণীঘাটের খেয়ার নৌকায় উঠিয়া কলরব করিতেছে-সর্বত্র একটা উৎসবের উল্লাস। রানাঘাটের বাজারে সে স্ত্রী ও পুত্রকন্যার জন্য কাপড়

কিনিল। দুর্গা লালপাড় কাপড় পরিতে ভালোবাসে, তাহার জন্য বাছিয়া একখানা ভালো কাপড়, ভালো দেখিয়া আলতা কয়েক পাতা। অপুর 'পদ্মপুরাণ' অনেক সন্ধান করিয়াও মিলিল না, অবশেষে একখানা 'সচিত্র চণ্ডী-মাহাত্ম্য বা কালকেতুর উপাখ্যান' ছয় আনা মূল্যে কিনিয়া লইল। গৃহস্থলির টুকটাক দু'একটা জিনিস সর্বজয়া বলিয়া দিয়াছিল–একটা কাঠের চাকি-বেলুনের কথা, তাহাও কিনিল।

দেশের স্টেশনে নামিয়া হ্যাঁটিতে হ্যাঁটিতে বৈকালের দিকে সে গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। পথে বড় একটা কাহারও সহিত দেখা হইল না, দেখা হইলেও সে হন হন করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে কাহারও দিকে বিশেষ লক্ষ না করিয়া বাড়ির দিকে চলিল। দরজায় ঢুকিতে ঢুকিতে আপন মনে বলিল-উঃ, দ্যাখো কাণ্ডখানা, বাঁশ-ঝাড়টা বুকে পড়েচে একেবারে পাচিলের ওপর, ভুবন কাকা কাটাবেনও নামুশকিল হয়েচে আচ্ছা-পরে সে বাড়ির উঠানে ঢুকিয়া অভ্যাসমতো আগ্রহের সুরে ডাকিল-ওমা দুগগা-ও অপু–

তাহার গলার স্বরা শুনিয়া সর্বজয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

হরিহর হাসিয়া বলিল-বাড়ির সব ভালো? এরা সব কোথায় গেল? বাড়ি নেই বুঝি?

সর্বজয়া শান্তভাবে আসিয়া স্বামীর হাত হইতে ভারী পুঁটুলিটা নামাইয়া লইয়া বলিল, এসো—ঘরে এসো।

স্ত্রীর অদৃষ্টপূর্ব শান্তাভাব হরিহর লক্ষ করিলেও তাহার মনে কোনো খটকা হইলনা।– তাহার কল্পনার স্রোত। তখন উদ্দাম বেগে অন্যদিকে ছুটিয়াছে-এখনই ছেলে মেয়ে ছুটিয়া আসিবে–

দুর্গা আসিয়া হাসিমুখে বলিবে-কি বাবা এর মধ্যে? আমনি তাড়াতাড়ি হরিহর পুঁটুলি খুলিয়া মেয়ের কাপড় ও আলতার পাতা এবং ছেলের সচিত্র 'চণ্ডী-মাহাত্ম্য বা কালকেতুর উপাখ্যান' ও টিনের রেলগাড়িটা দেখাইয়া তাঁহাদের তাক লোগাইয়া দিবে। সে ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল, বেশ কঁঠালের চাকি-বেলুন। এনিচি এবার। পরে কিছু নিরাশামিশ্রিত সতৃষ্ণ নয়নে চারিদিকে চাহিয়া বলিল, কই—অপু দুগগা এরা বুঝি সব বেরিয়েচে–

সর্বজয়া আর কোনো মতেই চাপিতে পারিল না। উচ্ছসিত কণ্ঠে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল– ওগো দুগগা কি আর আছে গো-মা যে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েচে গো- এতদিন কোথায় ছিলে!

গাঙ্গুলি-বাড়ির পূজা অনেক কালের। এ কয়দিন গ্রামে অতি বড় দরিদ্রও আভুক্ত থাকে না। সব বনেদী বন্দোবস্ত, নির্দিষ্ট সময়ে কুমোর আসিয়া প্রতিমা গড়ায়, পোটো চালচিত্র করে, মালাকার সাজ জোগায়, বারাসে-মধুখালির দ' হইতে বাউরিরা রাশি রাশি পদ্মফুল তুলিয়া আনে।

আঁসামালির দীনুসানাইদার অন্য অন্য বৎসরের মতো রসুনোচৌকি বাজাইতে আসিল। প্রভাতের আকাশে আগমনীর আনন্দ সুর বাজিয়া ওঠে-আসন্ন হেমন্ত ঋতুর মেহত্মভ্যর্থনা-নব ধান্যগুচ্ছের, নব আগন্তুক শেফালিদলের, হিমালয়ের পার হইতে উড়িয়া আসা পথিক-পাখি শ্যামার, শিশির-স্নিগ্ধ মৃণাল-ফোটা হেমন্তসন্ধ্যার।

নূতন কাপড় পরাইয়া ছেলেকে সঙ্গে লইয়া হরিহর নিমন্ত্রণ খাইতে যায়। একখানি অগোছালো চুলে-ঘেরা ছোট মুখের সনির্বন্ধ গোপন অনুরোধ দুয়ারের পাশের বাতাসে মিশাইয়া থাকে-হরিহব পথে পা দিয়া কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে-ছেলেকে বলে, এগিয়ে চলো, অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে বাবা–

গাঙ্গুলি-বাড়ির প্রাঙ্গীণ উৎসবেশে সজ্জিত হাসিমুখ ছেলেমেয়েতে ভরিয়া গিয়াছে। অপু চাহিয়া দেখিল, সতু ও তাহার ভাই কেমন কমললেবু রং-এর জামা গায়ে দিয়াছো-সবুজ শাড়ি পরিয়া ও দিব্য চুল বাঁধিয়া রানু দিদিকে যা মানাইয়াছে! গাঙ্গুলি বাড়ির মেয়ে সুনয়নী খোঁপায় রজনীগন্ধা ফুল গুজিয়া আর পাঁচ-ছয়টি মেয়ের সঙ্গে পূজার দালানে দাঁড়াইয়া খুব গল্প করিতেছে ও হাসিতেছে। সুনয়নী বাদে বাকি মেয়েদের সে চেনে না, বোধ হয় অন্য জায়গা হইতে উহাদের বাড়ি পূজার সময় আসিয়া থাকিবে-শহরের মেয়ে বোধ হয়, যেমন সাজগোজ, তেমন দেখিতে! অপু একদৃষ্টি তাহদের দিকে চাহিয়া রহিল। ওদিকে কে চেঁচাইয়া বলিতেছে-বড় সামিয়ানাটা আনবার ব্যবস্থা এখনও হল না?—বাঃ-তোমাদের যা কাজ-কর্ম দেখো এখন এর পর মজাটা। তারপর ব্রাহ্মণ। খেতে বসবে কি বোলা পাঁচটায়?

# সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

দেখিতে দেখিতে দিন কাটিয়া গেল। শীতকালও শেষ হইতে চলিয়াছে।

দুর্গার মৃত্যুর পর হইতে সর্বজয়া অনবরত স্বামীকে এ গ্রাম হইতে উঠিয়া যাইবার জন্য তাগিদ দিয়া আসিতেছিল, হরিহরও নানাস্থানে চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নাই। কিন্তু কোনো স্থানেই কোনো সুবিধা হয় নাই। সে আশা সর্বজয়া আজকাল একরূপ ছাড়িয়াই দিয়াছে। মধ্যে গত শীতকালে হরিহরের জ্ঞাতিভ্রাতা নীলমণি রায়ের বিধবা স্ত্রী এখানে আসিয়াছেন ও নিজেদের ভিটা জঙ্গলাবৃত হইয়া যাওয়াতে ভুবন মুখুজ্যের বাটীতে উঠিয়াছেন। হরিহর নিজের বাটীতে বৌদিদিকে আনাইয়া রাখিবার যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইয়া ছিল কিন্তু নীলমণি রায়ের স্ত্রী রাজি হন নাই। এখানে বর্তমানে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে মেয়ে অতসী ও ছোট ছেলে সুনীল। বড় ছেলে সুরেশ কলিকাতায় স্কুলে পড়ে, গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্বে এখানে আসিতে পরিবে না। অতসীর বয়সবছর চৌদ, সুনীলের বয়স আট বৎসর। সুনীল দেখিতে তত ভালো নয়; কিন্তু অতসী বেশ সুশ্রী, তবে খুব সুন্দরী বলা চলে না। তাহা হইলেও বরাবর। ইহারা লাহোরে কাটাইয়াছে, নীলমণি রায় সেখানে কমিসারিয়েটে চাকরি করিতেন, সেখানে ইহাদের জন্ম, সেখানেই লালিত পালিত; কাজেই পশ্চিম-প্রদেশ-সুলভ নিটোল স্বাস্থ্য ইহাদের প্রতি অঙ্গে।

ইহারা এখানে প্রথম আসিলে সর্বজয়া বড়মানুষ জায়ের সঙ্গে মেশামেশি করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। সুনীলের মা নগদে ও কোম্পানির কাগজে দশ হাজার টাকার মালিক এ কথা জানিয়া জায়ের প্রতি সম্রামে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়, গায়ে পড়িয়া আলাপ জমাইবার চেষ্টা কম করে নাই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সর্বজয়া নির্বোধ হইলেও বুঝিতে পারিল যে, সুনীলের মা তাহাকে ততটা। আমল দিতে প্রস্তুত নহেন। তাহার স্বামী চিরকাল বড় চাকরি করিয়া আসিয়াছেন, তিনি ও তাহার ছেলেমেয়ে অন্যভাবে জীবনযাপনে অভ্যস্ত। শুরু হইতেই তিনি দরিদ্র জ্ঞাতি পরিবার হরিহরের সঙ্গে এমন একটা ব্যবধান রাখিয়া চলিতে লাগিলেন যে সর্বজয়া আপনিই হটিয়া আসিতে বাধ্য হইল। কথায়, ব্যবহারে, কাজে, খুঁটিনাটি সব ব্যাপারেই তিনি জানাইয়া দিতে লাগিলেন যে, সর্বজয়া কোনরকমেই তাহদের সঙ্গে সমানে সমানে মিশিবার যোগ্য নহে। তঁহাদের কথাবার্তায়, পোশাকপরিচ্ছদে, চালচলনে এই ভাবটা অনবরত প্রকাশ পায় যে, তাহারা অবস্থাপন্ন ঘর। ছেলেমেয়ে সর্বদা ফিটফটী সাজিয়া আছে, কাপড় এতটুকু ময়লা হইতে পায় না, চুল সর্বদা আঁচড়ানো, অতসীর গলায় হার, হাতে সোনার চুড়ি, কানে সোনার দুল, একপ্রস্থ চা ও খাবার না খাইয়া সকালে কেহ কোথাও বাহির হয় না, সঙ্গে পশ্চিমা চাকর আছে, সে-ই সব গৃহকর্ম করে-মোটের উপর সব বিষয়েই সর্ব্বজয়াদের দরিদ্র সংসারের চাল-চলন হইতে উহাদের ব্যাপারের বহু পার্থক্য।

সুনীলের মা নিজের ছেলেকে গ্রামের কোনো ছেলের সঙ্গেই বড় একটা মিশিতে দেন না, অপুর সঙ্গেও নয়–পাছে পাড়াগাঁয়ের এই সব অশিক্ষিত অসভ্য ছেলেপিলেদের দলে মিশিয়া তাহার ছেলেমেয়ে খারাপ হইয়া যায়। তিনি এ গ্রামে বাস করিবার জন্য আসেন নাই, জরিপের সময় নিজেদের বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে আসাই তাহার উদ্দেশ্য। ভুবন মুখুজ্যেরা ইহাদের কিছু জমা রাখেন, সেই খাতিরে পশ্চিম কোঠায় দুখানা ঘর ইহাদের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন, রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়াও ইহাদের পৃথক হয়। ভুবন মুখুজ্যেদের সঙ্গে ব্যবহারে সুনীলের মায়ের কোনো পার্থক্য দৃষ্ট হয় না; কারণ ভুবন মুখুজ্যের পয়সা আছে, কিন্তু সর্বজয়াকে তিনি একেবারে মানুষের মধ্যেই গণ্য করেন না।

দোলের সময় নীলমণি রায়ের বড় ছেলে সুরেশ কলিকাতা হইতে আসিয়া প্রায় দিন দশেক বাড়ি রহিল। সুরেশ অপুরই বয়সি, ইংরাজি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। দেখিতে খুব ফরসা নয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। নিয়মিত ব্যায়াম করে বলিয়া শরীর বেশ বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান। অপুর অপেক্ষা এক বৎসর মাত্র বয়স বেশি হইলেও আকৃতি ও গঠনে পনেরো-ষোল বৎসরের ছেলের মতো দেখায়। সুরেশও এপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে বড় একটা মেশে না। ওপাড়ায় গাঙ্গুলি-বাড়ির রামনাথ গাঙ্গুলির ছেলে তাহার সহপাঠী। গাঙ্গুলি-বাড়ি রামনবমী দোলের খুব উৎসব হয়, সেই উপলক্ষে সেও মামার বাড়ি বেড়াইতে আসিয়াছে। সুরেশ অধিকাংশ সময় সেখানেই কটায়, গায়ের অন্য কোনো ছেলে মিশিবার যোগ্য বলিয়া সেও বোধ হয় বিবেচনা করে না।

যে পোড়ো ভিটাটা জঙ্গলাবৃত হইয়া বাড়ির পাশে পড়িয়া থাকিত সে জ্ঞান হইয়া অবধি দেখিতেছে, সেই ভিটার লোক ইহারা। সে হিসাবে ইহাদিগের প্রতি অপুর একটা বিচিত্র আকর্ষণ। তাহার সমবয়সি সুরেশ কলিকাতায় পড়ে-ছুটিতে বাড়ি আসিলে তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্য অনেকদিন হইতে সে প্রতীক্ষায় ছিল। কিন্তু সুরেশ আসিয়া তাহার সহিত তেমন মিশিল না, তা ছাড়া সুরেশের চালচলন কথাবার্তার ধরন এমনি যে সে যেন প্রতিপদেই দেখাইতে চায়, গ্রামের ছেলেদের চেয়ে সে অনেক বেশি উঁচু। সমবয়সি হইলেও মুখচোরা অপু তাহাতে আরও ভয় পাইয়া কাছে ঘেষে না।

অপু এখনও পর্যন্ত কোনো স্কুলে যায় নাই, সুরেশ তাহাকে লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছে, আমি বাড়িতে বাবার কাছে পড়ি। দোলের দিন গাঙ্গুলিদের পুকুরে বাঁধাঘাটে জলপাইতলায় বসিয়া সুরেশ গ্রামের ছেলেদিগকে দিগ্বিজয়ী নৈয়ায়িক পণ্ডিতের ভঙ্গিতে এ-প্রশ্ন ওপ্রশ্ন করিতেছিল। অপুকে বলিল-বলো তো ইন্ডিয়ার বাউন্ডারি কি? জিওগ্রাফি জানো?

অপু বলিতে পারে নাই। সুরেশ আবার জিজ্ঞাসা করিল, অঙ্ক কি কষেচ? ডেসিমল ফ্র্যাকশন কষতে পারো?

অপু অতশত জানে না। না জানুক, তাহার সেই টিনের বাক্সটাতে বুঝি কম বই আছে? একখানা নিত্যকর্মপদ্ধতি, একখানা পুরানো প্রাকৃতিক ভূগোল, একখানা শুভঙ্করী, পাতা-ছেড়া বীরাঙ্গনা কাব্য একখানা, মায়ের সেই মহাভারত-এই সব। সে ওইসব বই পড়িয়াছে।–অনেকবার পড়া হইয়া গেলেও আবার পড়ে। তাহার বাবা প্রায়ই এখান ওখান হইতে চাহিয়া চিন্তিয়া বই আনিয়া দেয়, ছেলে খুব লেখাপড়া শিখিবে, পণ্ডিত হইবে, তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে, এ বিষয়ে বিকারের রোগীর মতো তাহার একটা অদম্য অপ্রশমনীয় পিপাসা। কিন্তু তাহার পয়সা নাই, দূরেব স্কুলের বোর্ডিং-এ রাখিয়া দিবার মতো সংগতির একান্ত অভাব, নিজেও খুব বেশি লেখাপড়া জানে না। তবুও যতক্ষণ সে বাড়ি থাকে নিজের কাছে বসাইয়া ছেলেকে এটা ওটা পড়ায়, নানা গল্প করে, ছেলেকে অঙ্ক শিখাইবার জন্য নিজে একখানা শুভঙ্করীর সাহায্যে বাল্যের অধীত বিস্মৃত বিদ্যা পুনরায় ঝালাইয়া তুলিয়া তবে ছেলেকে অঙ্ক কষায়। যাহাতেই মনে করে ছেলের জ্ঞান হইবে, সেইটাই হয় ছেলেকে পড়িতে দেয়, নতুবা পড়িয়া শোনায়। সে বহুদিন হইতে বঙ্গবাসীর গ্রাহক, অনেক দিনের পুরানো বঙ্গবাসী তাঁহাদের ঘরে জমা আছে, ছেলে বড় হইলে পড়িবে এজন্য হবিহব সেগুলিকে সযত্নে বান্ডিল বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছিল, এখন সেগুলি কাজে লাগিতেছে। মূল্য দিতে না পারায় নূতন কাগজ আর তাঁহাদের আসে না, কাগজওয়ালারা কাগজ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ছেলে যে এই 'বঙ্গবাসী' কাগজখানার জন্য কিরূপ পাগল, শনিবার দিনটা সকালবেলা খেলাধুলা ফেলিয়া কেমন করিয়া সে যে ভুবন মুখুজ্যোব চণ্ডীমণ্ডপে ডাকবাক্সটার কাছে পিওনের প্রত্যাশায় হ্যাঁ করিয়া বসিয়া থাকে-হরিহর তাহা খুব জানে বলিয়াই ছেলের এত আদরের জিনিসটা জোগাইতে না পারিয়া তাহার বুকের ভিতর বেদনায় টনটন করে।

অপু তবুও পুরাতন 'বঙ্গবাসী' পড়িয়া অনেক গল্প শিখিয়াছে। পটুর কাছে বলে— লিউকা ও রাফেল মাটিনিক দ্বীপের অগ্ন্যুৎপাত, সোনাকরা জাদুকরের গল্প, আরও কত কথা। কিন্তু স্কুলের লেখাপড়া তাহার কিছুই হয় না। মোটে ভাগ পর্যন্ত অঙ্ক জানে, ইতিহাস নয়, ব্যাকরণ নয়, জ্যামিতি পরিমিতির নামও শোনে নাই, ইংরাজির দৌড় ফাস্ট বুকের ঘোড়ার পাতা।

ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহার মায়ের একটু অন্যরূপ ধারণা। সর্বজয়া পাড়াগায়ের মেয়ে। ছেলে স্কুলে পড়িয়া মানুষ হইবে। এ উচ্চ আশা তাহার নাই। তাহার পরিচিত মহলে কেউ কখনও স্কুলের মুখ দেখে নাই। তাহদের যে সব শিষ্য-বাড়ি আছে, ছেলে আর কিছুদিন পরে সে সব ঘরে যাতায়াত করিবে, সেগুলি বজায় রাখিবে, ইহাই তাহার

বড় আশা। আরও একটা আশা সর্বজয়া রাখে। গ্রামের পুরোহিত দীনু ভট্টাচার্য বৃদ্ধ হইয়াছে। ছেলেরাও কেহ উপযুক্ত নয়। রানীর মা, গোকুলের বউ, গাঙ্গুলি-বাড়ির বড়বন্ধু সকলেই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে তাহারা ইহার পর অপুকে দিয়া কাজুর্ম করাইবেন, দীনু ভট্টাচার্যের অবর্তমানে তাঁহার গাঁজাখোর পুত্র ভোম্বলের পরিবর্তে নিষ্পাপ, সরল, সুশ্রী এই ছেলেটি গ্রামের মনসা-পূজায় লক্ষ্মী-পূজায় তাহাদের আয়োজনের সঙ্গী হইয়া থাকিবে, গ্রামের মেয়েরা এই চায়। অপুকে সকলেই ভালোবাসে। ঘটে পথে প্রতিবেশিনীদের মুখে এ ইচ্ছা প্রকাশ করিতে সর্বজয়া অনেকবার শুনিয়াছে এবং এইটাই বর্তমানে তাহার সব চেয়ে উচ্চ আশা। সে গরিব ঘরের মেয়ে, গরিব ঘরের বধূ, ইহা ছাড়া কোনো উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ধারণা নাই। এই যদি ঘটে তাহা হইলেই শেষ রাত্রের স্বপ্নকে সে হাতের মুঠায় পায়।

একদিন এ কথা ভুবন মুখুজ্যের বাড়িতে উঠিয়াছিল। দুপুরের পর সেখানে তাসের আড্ডায় পাড়ার অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সর্বজয়া সকলের মন জোগাইবার ভাবে বলিল-এই বড় খুড়ি আছেন, ঠাকুমা আছেন, মেজদি আছেন, এঁদের যদি দয়া হয় তবে অপু আমার সামনের ফাগুনে পৈতেটা দিয়ে নিয়ে গায়ের পুজোটাতে হাত দিতে পারে। ওর আমার তা হলে ভাবনা কি? আট দশ ঘর শিষ্যবাড়ি আছে, আর যদি মা সিদ্ধেশ্বরীর ইচ্ছেয় গাঙ্গুলি-বাড়ির পুজোটা বাঁধা হয়ে যায় তাহলেই

সুনীলের মা মুখ টিপিয়া হাসিলেন। তঁহার ছেলে সুরেশ বড় হইলে আইন পড়িয়া-র্তাহার জেঠতুতো ভাই পাটনার বড় উকিল, তাঁহার কাছে আসিয়া ওকালতি করিবে। সুরেশের সে মামা নিঃসন্তান। অথচ খুব পসারওয়ালা উকিল। এখন হইতেই তাঁহাদের ইচ্ছা যে সুরেশকে কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শেখান,-কিন্তু সুনীলের মা পরের বাড়ি ছেলে রাখিতে যাইবেন কেন ইত্যাদি সংবাদ নির্বোধি সর্বজয়ার মতো হাউ হাউ না বকিয়াও, ইতিপূর্বে মাঝে-মিশালে কথাবার্তার ফাঁকে তিনি সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

ভুবন মুখুজ্যের বাড়ির বাহিরে আসিয়া সর্বজয়া ছেলেকে বলিল-শোনা একটা কথা-পরে চুপি চুপি বলিল-তোর জেঠীমার কাছে গিয়া বলিস না যে, জেঠীমা আমার জুতো নেই-আমায় একজোড়া জুতো দাও না কিনে?

অপু বলিল, কেন মা?

—বলিস না, বড়লোক ওরা, চাইলে হয়তো ভালো একজোড়া জুতো দেবে এখন-দেখিসনি যেমন ওই সুরেশের পায়ে আছে? তোর পায়ে ওইরকম লাল জুতো বেশ মানায়—

অপু লাজুক মুখে বলিল-আমার বড় লজ্জা করে, আমি বলতে পারবো না-কি হয়তো ভাববে-আমি…

সর্বজয়া বলিল-তা। এতে আবার লজ্জা কি!..আপনার জন—বলিস না।–তাতে কি?

–হুঁ…উ-আমি বলতে পারবো না মা। আমি কথা বলতে পারিনে জেঠীমার সামনে…

সর্বজয়া রাগ করিয়া বলিল-তা পারবে কেন? তোমার যত বিদ্ধি সব ঘরের কোণে-খালি পায়ে বেড়িয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, আজ দু'বছর পায়ে নেই জুতো সে ভালো, বড়লোক, চাইলে হয়তো দিয়ে দিত কিনে-তা তোমার মুখ দিয়ে বাক্যি বেরুবে না-মুখচোরার রাজা—

পূর্ণিমার দিন রানীদের বাড়ি সত্যনারায়ণের পূজার প্রসাদ আনিতে অপু সেখানে গেল। রানী তাহাকে ডাক দিয়া হাসিমুখে বলিল-আমাদের বাড়ি তো আগে আগে কত আসতিস, আজকাল আসিস নে কেন রে?

-কেন আসবো না রানুদি,-আসি তো?

রানু অভিমানের সুরে বলিল-হ্যাঁ আসিস। ছাই আসিস। আমি তোর কথা কত ভাবি। তুই ভাবিস আমার, আমাদের কথা?

–না বই কি বা রে-মাকে জিজ্ঞেস করে দেখো দিকি?

এ ছাড়া অন্য কোনো সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ তাহার জোগাইল না। রানী তাহাকে সেখানে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া নিজে গিয়া তাহার জন্য ফল প্রসাদ ও সন্দেশ লইয়া আসিয়া হাতে দিল। হাসিয়া বলিল,-থালা সুদ্ধ নিয়ে যা, আমি কাল গিয়ে খুড়িমার কাছ থেকে নিয়ে আসবো–

রানীর মুখের হাসিতে তাহার উপর একটা পরম নির্ভরতার ভাব আসিল অপুর। রানুদি কি সুন্দর দেখিতে হইয়াছে আজকাল, রানুদির মতো সুন্দরী এ পর্যন্ত অন্য কোনো মেয়ে সে দেখে নাই। অতসীদি সর্বদা বেশ ফিটফাট থাকে বটে, কিন্তু দেখিতে রানুদির কাছে লাগে না। তাহা ছাড়া অপু জানে এ গ্রামের মেয়েদের মধ্যে, রানুদির মতো মন কোনো মেয়েরই নয়। দিদির পরই যদি সে কাহাকেও ভালোবাসে তো সে রানুদি। রানুদিও যে তাহার দিকে টানে তাহা কি আর অপু জানে না?

সে থালা তুলিয়া চলিয়া যাইবার সময় একটু ইতস্তত করিয়া বলিল-রানুদি, তোমাদের এই পশ্চিমের ঘরের আলমারিতে যে বইগুলো আছে সত্যুদা পড়তে দেয় না! একখানা দেবে পড়তে? পড়েই দিয়ে যাবো।

রানী বলিল-কোন বই আমি তো জানিনে, দাঁড়া আমি দেখছি–-

সতু প্রথমে কিছুতেই রাজি হয় না, অবশেষে বলিল-আচ্ছা পড়তে দিই, যদি এক কাজ করিস। আমাদের মাঠের পুকুরে রোজ মাছ চুরি যাচ্ছে- জেঠামশায় আমাকে বলেছে, সেখানে গিয়ে দুপুরবেলা চৌকি দিতে,-আমার সেখানে একা এক ভালো লাগে না, তুই যদি যাস আমাব বদলে তবে বই পড়তে দেবো–

রানী প্রতিবাদ করিয়া বলিল—বেশ তো? ও ছেলেমানুষ, সেই বনের মধ্যে বসে মাছ চৌকি দেবে বই কি? তুমি বুড়ো ছেলে পারো না, আর ও যাবে? যাও তোমায় বই দিতে হবে না, আমি বাবার কাছে চেয়ে দেবো।–

অপু কিন্তু রাজি হইল। রানীর বাবা ভুবন মুখুজ্যে বিদেশে থাকেন, তাহার আসিবার অনেক দেরি অথচ এই বইগুলার উপর তাহার বড় লোভ। এগুলি পড়িবার লোভে সে কতদিন লুব্ধচিত্তে সতুদের পশ্চিমের ঘরটায় যাতায়াত করিয়াছে। দু-একখানা একটু-আধটু পড়িয়াছেও। কিন্তু সন্তু নিজে তো পড়েই না, তাহাকেও পড়িতে দেয় না। নায়কের ঠিক সংকটময় মুহূর্তটিকেই হাত হইতে বই কড়িয়া লইয়া বলে-রেখে দে অপু, এ সব ছোট কাকার বই, ছিড়ে যাবে, দে।

অপু হাতে স্বর্গ পাইয়া গেল।

প্রতিদিন দুপুরবেলা আলমারি হইতে বাছিয়া এক-একখানি করিয়া বই সত্যুর নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া যায় ও বাশবনের ছায়ায় কতকগুলো শ্যাওড়াগাছের কাঁচা ডাল পাতিয়া তাহার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া একমনে পড়ে। বই অনেক আছে-প্রণয়-প্রতিমা, সরোজ-সরোজিনী, কুসুমকুমারী, সচিত্র যৌবনে যোগিনী নাটক, দসুয-দুহিতা, প্রেম-পরিণাম বা অমৃতে গরল, গোপেশ্বরের গুপ্তকথা…সে কত নাম করিবে! এক-একখানি করিয়া সে ধরে, শেষ না করিয়া আর ছড়িতে পারে না। চোখ টাটাইয়া ওঠে, রাগ টিপ টপ করে; পুকুরধারের নির্জন বাঁশবনের ছায়া ইতিমধ্যে কখন দীর্ঘ হইয়া মজা পুকুরটার পাটা-শ্যাওলার দামে নামিয়া আসে, তাহার খেয়ালই থাকে না কোন দিক দিয়া বেলা গেল!

কি গল্প! সরোজিনীকে সঙ্গে লইয়া সরোজ নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদে যাইতেছেন, পথে নবাবের লোকে নৌক লুঠিয়া তাহাদের বন্দী করিল। নবাবের হুকুমে সরোজের হইয়া

গেল প্রাণদণ্ড, সরোজিনীকে একটা অন্ধকার ঘরে চাবিতালা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। গভীর রাত্রে কক্ষের দরজা খুলিয়া গেল, নবাব মত্ত অবস্থায় কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন-সুন্দরী, আমার হুকুম সরোজ মরিয়াছে, আর কেন.ইত্যাদি। সরোজিনী সদর্পে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন-রে পিশাচ, রাজপুত রমণীকে তুই এখনও চিনিস নাই, এ দেশে প্রাণ থাকিতে...ইত্যাদি। এমন সময় কাহার ভীম পদাঘাতে কারাগারের জানালা ভাঙিয়া গেল। নবাব চমকিয়া উঠিয়া দেখিলেন-একজন জটাজুটধারী তেজঃপুঞ্জকলেবর সন্ন্যাসী, সঙ্গে যমদূতের মতো বলিষ্ঠ চারি-পাঁচজন লোক। সন্ন্যাসী রোষকষায়িতনয়নে নবাবের দিকে চাহিয়া বলিলেন-নরাধম, রক্ষক হইয়া ভক্ষক? পরে সরোজিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন-মা, আমি তোমার স্বামীর গুরু-যোগানন্দ স্বামী, তোমার স্বামীর প্রাণহানি হয় নাই, আমার কমণ্ডুলুর জলে পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে, এখন তুমি চল মা আমার আশ্রমে, বৎস সরোজ তোমার অপেক্ষা করিয়া আছে।.গ্রন্থকারের লিপিকৌশল সুন্দর,-সরোজের এই বিস্ময়জনক পুনরুজীবন আরও বিশদভাবে ফুটাইবার জন্য তিনি পরবর্তী অধ্যায়ের প্রতি পাঠকের কৌতুহল উদ্দীপ্ত করিয়া বলিতেছেন-এইবার চল পাঠক, আমরা দেখি বধ্যভূমিতে সরোজের প্রাণদণ্ড হইবার পর কি উপায়ে তাহার পুনর্জীবন লাভ সম্ভব হইল...ইত্যাদি।

এক-একটি অধ্যায় শেষ করিয়া অপুর চোখে ঝাপসা হইয়া আসে-গলায় কি যেন আটকাইয়া যায়। আকাশের দিকে চাহিয়া সে দুই-এক মিনিট কি ভাবে,–আনন্দে বিস্ময়ে, উত্তেজনায় তাহার দুই কান দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে থাকে, পরে বুদ্ধনিঃশ্বাসে পরবতী অধ্যায়ে মন দেয়। সন্ধ্যা হইয়া যায়, চারিধারে ছায়া দীর্ঘ হইয়া আসে, মাথার উপর বাঁশঝাড়ে কত কী পাখির ডাক শুরু হয়, উঠিউঠি করিয়াও বইয়ের পাতার এক-ইঞ্চি ওপরে চোখ রাখিয়া পড়িতে থাকে-যতক্ষণ অক্ষর দেখা যায়।

এইরকম বই তো সে কখনও পড়ে নাই! কোথায় লাগে সীতার বনবাস আর ড়বালের গল্প? বাড়ি আসিলে তাঁহার মা বকে—এমন হাবলা ছেলেও তুই? পরের মাছ চৌকি দিস গিয়ে সেই একলা বনের মধ্যে বসে একখানা বই পড়বার লোভে? আচ্ছা বোকা পেয়েছে তোকে।

কিন্তু বোকা অপুর লাভ যেদিক দিয়া আসে, তাহার মায়ের সেদিক সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই!

কিন্তু বোকা অপুর লাভ যেদিক দিয়া আসে, তাহার মায়ের সেদিক সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই। আজকাল সে দুইখানা বই পাইয়াছে ‘মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত’ ও

'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'। ...উইঢিবি, বৈঁচিবনের প্রেক্ষাপটে নিস্তব্ধ দুপুরের মায়ায় দৃশ্যের পর দৃশ্য পরিবর্তিত হইয়া চলে-জেলেখা নদীর উপর বসিয়া আহত নরেনের শুশ্রুষা করিতেছে, আওরঙ্গজেবের দরবারে নিজেকে পাঁচহাজারী মনসবদারের মধ্যে স্থান পাইতে দেখিয়া শিবাজী রাগে ফুলিয়া ভাবিতেছেন-শিবাজী পাঁচ-হাজারী? একবার পুনায় যাও তো, শিবাজীর ফৌজে কত পাঁচ-হাজারী মনসবদার আছে গনিয়া আসিবে!...

রাজবারার মরুপর্বতে, দিল্লি-আগ্রার রঙমহালে, শিশমহালে, ওড়না-পেশোয়াজ-পরা সুন্দরীদলের সঙ্গে তাহার সারা দিনমান কাটে। এ কোন জগৎ-যেখানে শুধু জ্যোৎস্না, তলোয়ারখেলা, সুন্দর মুখের বন্ধুত্ব, আহেরিয়া-উৎসবে দীর্ঘ বর্শা হাতে ঘোড়ায় চড়িয়া উষর উপত্যকা ও ভুট্টাক্ষেত্র পার হইয়া ছোটা?...

বীরের যাহা সাধ্য, রাজপুতের যাহা সাধ্য, মানুষের যাহা সাধ্য-প্রতাপসিংহ তাহা করিয়াছিলেন। হলদিঘাটের পার্বত্য বর্ক্সের প্রতি পাষাণ-ফলকে তাহার কাহিনী লেখা আছে। দেওয়ারের রণক্ষেত্রের দ্বাদশ সহস্র রাজপুতের হৃদয়রক্তে তাহার কাহিনী অক্ষয় মহিমায় লেখা আছে।

বহুদিন পরেও প্রাচীন যোদ্ধৃগণ শীতের রাত্রিতে অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া পৌত্রপৌত্রিগণের নিকট হলদিঘাটের অদ্ভুত বীরত্বের কথা বলিত।...

অদৃশ্যহস্তনিক্ষিপ্ত একটি বর্শ আসিল।–অপু এই গ্রামের চিরশ্যাম বনভূমির ছায়ায়, লতাপাতার নিবিড়তায়, ভিজামাটির গন্ধে মানুষ হইয়াছে।–তবুও সে জানে রাজপুতানার ভীলপ্রদেশের বা আরাবল্লী-মেবারের প্রত্যেকটি স্থান, নাহারা মগরোর অপূর্ব বন্য সৌন্দর্য সে ভালো করিয়াই চেনে।. পর্বত হইতে অবতরণশীল শস্ত্রপাণি তেজসিংহের মূর্তি কি সুন্দর মনে হয়!...

"সেই চপ্পন প্রদেশে অনেকদিন অবধি সেই ভীল গ্রামের নির্জন কন্দরে ও উন্নত শিখরে রজনী দ্বিপ্রহরের সময় একটি রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত গীত শ্রুত হইত। অতি প্রত্যুষে নির্জন প্রান্তরে, পথিকগণ কখনও কখনও একটি রমণীর পাণ্ডুর মুখ ও চঞ্চল-নয়ন দেখিতে পাইত; লোকে বলিত কোনো বিশ্রামশুন্যা উদ্বিগ্ন বনদেবী হইবে'...সেই গানের অস্পষ্ট করুণ মূর্ছনা যেন অপুর কানে বাঁশবাগানের পিছন হইতে ভাসিয়া আসে!...

কমলমীর, সূর্যগড়ের যুদ্ধ, সেনাপতি শাহবাজ খাঁ, সুন্দরী নুরজাহান, পুস্পকুমারী, বন্য ভীলপ্রদেশ, বীরবালক চন্দনসিংহ-দূর সুদূর কল্পনা।–তবুকত নিকট, কত বাস্তব মনে হয়। রাজবারার মরুভূমি আর নীল আরাবল্লীর উন্নত পর্বতের শিখরে শিখরে

চেনার বৃক্ষে ফুল ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে, দেবী মিবার লক্ষ্মীর অলক্ত-রক্তপদচিহ্ন আঁকা রহিয়াছে বুনাস ও বরী নদীর তটভূমির শিলাখণ্ডে, ঝরনার উপলরাশির উপরে, বাজরা ও জওয়ার-ক্ষেতে ও মৌউল বনে।...

চিতোর রক্ষণ হইল না! রানা অমরসিংহ বাদশাহের সম্মান গ্রহণ করিলেন। সর্বহার পিতা প্রতাপসিংহ যিনি পঁচিশ বৎসর ধরিয়া বনে পর্বতে ভীলের পোল লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি ব্যথাক্ষুব্ধচিত্তে কোথা হইতে দেখিয়াছিলেন এ সব?...

তপ্ত চোখের জলে পুকুর, উইটিবি, বৈঁচিবন, বাঁশবাগান-সব ঝাপসা হইয়া আসে।

সেদিন দুপুরে তাহার বাবা একটা কাগজের মোড়ক দেখাইয়া হাসিমুখে বলিল-দ্যাখো তো খোকা, কি বলো দিকি?

অপু তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিল; উৎসাহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—খবরের কাগজ? না বাবা?

সেদিন রামকবচ লিখিয়া দিয়া বেহারী ঘোষের শাশুড়ির নিকট যে তিনটি টাকা পাইয়াছে, স্ত্রীকে গোপন করিয়া হরিহর তারই মধ্যে দুটাকা খবরের কাগজের দাম পাঠাইয়া দিয়াছিল, স্ত্রী জানিতে পারিলে অন্য পাঁচটা অভাবের গ্রাস হইতে টাকা দুইটাকে কোনো মতেই বাঁচানো যাইত না।

অপু বাবার হাত হইতে তাড়াতাড়ি কাগজের মোড়কটা লইয়া খুলিয়া ফেলে। হ্যাঁ—খবরের কাগজ বটে। সেই বড় বড় অক্ষরে "বঙ্গবাসী' কথাটা লেখা, সেই নতুন কাগজের গন্ধটা, সেই ছাপা সেই সব-যাহার জন্য বৎসরখানেক পূর্বে সে তীর্থের কাকের মতো অধীর আগ্রহে ভুবন মুখুজ্যেদের চণ্ডীমণ্ডপের ডাকবাক্সটার কাছে পিওনের অপেক্ষায় প্রতি শনিবারে হা করিয়া বসিয়া থাকিত! খবরের কাগজ! খবরের কাগজ! কি সব নতুন খবর না জানি দিয়াছে? কি অজানা কথা সব লেখা আছে ইহার বড় বড় পাতায়?

হরিহরের মনে হয়-দুইটি টাকার বিনিময়ে ছেলের মুখে যে আনন্দের হাসি ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহার তুলনায় কোন বন্দকী মাকড়ী খালাসের আত্মপ্রসাদ মোটেই বেশি হইত না!

অপু খানিকক্ষণ পড়িয়া বলে-দ্যাখো বাবা, একজন বিলাত যাত্রী'র চিঠি বেরিয়েছে, আজ থেকেই নতুন বেবুলো। খুব সময়ে আমাদের কাগজটা এসেচে-না বাবা?

তবুও তার মনে দুঃখ থাকিয়া যায় যে গত বৎসর কাগজখানা হঠাৎ উহারা বন্ধ করিয়া দেওয়াতে জাপানী মাকড়সাসুরের গল্পটার শেষ ভাগ তাহার পড়া হয় নাই, রাইকো রাজসভায় যাওয়ার পর তাহার যে কি ঘটিল। তাহা সে জানিতে পারে নাই।...

একদিন রানী বলিল—তোর খাতায় তুই কি লিখচিস রে?

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল-কোন খাতায়? তুমি কি করে–

–আমি তোমাদের বাড়ি সেদিন দুপুরে যাইনি বুঝি? তুই ছিলিনে, খুড়িমার সঙ্গে কতক্ষণ বসে কথা বোল্লাম। কেন, খুড়িমা তোকে বলেনি? তাই দেখলাম তোর বই-এর দপ্তরে তেশ্বর সেই রাঙা খাতাখানায় কি সব লিখিচিস-আমার নাম রয়েচে, আর দেবী সিংহ না কি একটা–

অপু লজ্জায় লাল হইয়া বলিল-ও একটা গল্প।

–কি গল্প রে? আমায় কিন্তু পড়ে শোনাতে হবে।

পরদিন রানী একখানা ছোট বাঁধানো খাতা অপুর হাতে দিয়া বলিল-এতে তুই আমাকে একটা গল্প লিখে দিস-একটা বেশ ভালো দেখে। দিবি তো? অতসী বলছিল তুই ভালো লিখতে পারিস নাকি! লিখে দে, আমি অতসীকে দেখাবো।...

অপু রাত্রে বসিয়া বসিয়া খাতা লেখে। মাকে বলে–আর একটা পলা তেল দাও না মা। এইটুকু লিখে রাখি আজ...

তাহার মা বলে-আজ রাত্তিরে আর পড়ে না-মোটে দু’পলা তেল আছে, কাল আবার রাধবো কি দিয়ে? এই খানে রাধছি, এই আলোতে বসে পড়।

অপু ঝগড়া করে।

মা বকে-এঃ, ছেলের রাত্তির হলে যত লেখা-পড়ার চাড়-সারাদিন চুলের টিকিট দেখবার জো নেই। সকালে করিস কি? যা তেল দেবো না।

অবশেষে অপু উনুনের পাড়ে কাঠের আগুনের আলোয় খাতাখানা আনিয়া বসে। সর্বজয়া ভাবে-অপু আর একটু বড় হলে আমি ওকে ভালো দেখে বিয়ে দেবো। এ ভিটতে নতুন পাকা বাড়ি উঠবে। আসচে বছর পৈতেটা দিয়ে নিই, তারপর গাঙ্গুলি-বাড়ির পুজোটা যদি বাঁধা হয়ে যায়–

..চার-পাঁচদিন পরে সে রানীর হাতে খাতা ফিরাইয়া দিলে রানী আগ্রহের সহিত খাতা খুলিতে খুলিতে বলিল-লিখেচিস?

অপু হাসি-হাসি মুখে বলিল-দ্যাখো না খুলে?

রানী দেখিয়া খুশির সুরে বলিল—ওঃ, অনেক লিখেচিস যে রে! দাঁড়া অতসীকে ডেকে দেখাই।

অতসী দেখিয়া বলিল-অপু লিখেচে না আরও কিছু-ইস! এ সব বই দেখে লেখা।

অপু প্রতিবাদের সুরে বলিল—ইঃ, বই দেখে বইকি? আমি তো গল্প বানাই-পাটুকে জিজ্ঞেস কোরো দিকি অতসীদি? ওকে বিকেলে গাঙের ধারে বসে বসে কত বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলিনে বুঝি?

রানী বলিল-না ভাই, ও লিখেচে, আমি জানি!! ও ওই রকম লেখে। খাসা যাত্রার পালা লিখেছিল খাতাতে, আমায় পড়ে শোনালে।... পরে অপুকে বলিল-নাম লিখে দিসনি তোর? নাম লিখে দে।

অপু এবার একটু অপ্রতিভতার সুরে বলিল যে, গল্পটা তাহার শেষ হয় নাই, হইলেই নাম লিখিয়া দিবে এখন। 'সচিত্র যৌবনে-যোগিনী' নাটকের ধরনে গল্প আরম্ভ করিলেও শেষটা কিরূপ হইবে সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে নাই। অথচ দীর্ঘ দিন তাহার কাছে খাতা থাকিলে বানুদিবিশেষ করিয়া অতসীদি পাছে তাহার কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়ে, এই ভয়ে অসমাপ্ত অবস্থাতেই সেখানা ফেরত দিয়াছে।...

তাহার বাবা বাড়িতে নাই। সকালে উঠিয়া সে তাহদের গ্রামের আর সকলের সঙ্গে পাশের গ্রামে এক আদ্যশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে গেল। সুনীলও গেল তাহার সঙ্গে। নানা গ্রামের ফলারে বামুনের দল পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূর হইতেও হ্যাঁটিয়া আসিয়াছে। এক এক ব্যক্তি পাঁচ-ছয়টি করিয়া ছেলেমেয়ে সঙ্গে করিয়া আসিয়াছে; সকলকে সুবিধামতো স্থানে বসাইতে গিয়া একটা দাঙ্গা বাধিবার উপক্রম। প্রত্যেকের পাতে চারিখানি করিয়া লুচি দিয়া যাইবার পর পরিবেশনকারীরা বেগুনভাজা পরিবেশন করিতে আসিয়া দেখিল কাহারও পাতে লুচি নাই,–সকলেই পার্শ্ববতী চাদরে বা গামছায় লুচি তুলিয়া বসিয়া আছে।...ছোট ছোট ছেলে অতশত না বুঝিয়া পাতের লুচি ছিড়িতে যাইতেছে-তাহার বাপ বিশ্বেশ্বর ভট্টচোয হোঁ মারিয়া ছেলের পাত হইতে লুচি উঠাইয়া পাশের চাদরে রাখিয়া বলিলএগুলো রেখে দাও না! আবার এখুনি দেবে, খেয়ো এখন।

তাহার পর খানিকক্ষণ ধরিয়া ভীষণ শোরগোল হইতে লাগিল-"লুচির ধামাটা এ সারিতে" "কুমড়োটা যে আমার পাতে একেবারেই', "ওহে, গরম গরম দেখো', "মশাই কি দিলেন হাত দিয়ে দেখুন দিকি, স্রেফ কাঁচা ময়দা"...ইত্যাদি। ছাঁদার পরিমাণ লইয়া কর্মকর্তাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের তুমুল বিবাদ! কে একজন চিৎকার কবিয়া বলিতে লাগিল-তা হলে সেখানে ভদরলোকেদের নেমস্তেন্ন করতে নেই। স-পাঁচ গণ্ডা লুচি এ একেবারে ধরা-বাঁধা হ্যাঁদার রেট-বল্লাল সেনের আমল থেকে বঁধা রয়েচে। চাইনে তোমার ছ্যাদা, কন্দ্‌দশ্লো মজুমদার এমন জায়গায় কখনও–

কর্মকর্তা হাতে-পায়ে ধবিয়া কন্দর্প মজুমদারকে প্রসন্ন করিলেন।

অপুও এক পুটুলি ছাঁদা বহিয়া আনিল। সর্বজয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া হাসিমুখে বলিল-ওমা, এ যে কত এনেচিস-দেখি খোল তো? লুচি, পানতুয়া, গজা-কত রে! ঢেকে রেখে দি, সকালবেলা খেয়ো এখন।

অপু বলিল-তোমায়ও কিন্তু মা খেতে হবে-তোমাব জন্যে আমি চেয়ে দু'বার করে পানতুয়া নিইচি।

সর্বজয়া বলিল–হ্যাঁরে, তুই বল্লি নাকি আমাব মা খাবে দাও?–তুই তো একটা হাবলা ছেলে!

অপু ঘাড় ও হাত নাড়িয়া বলিল-হ্যাঁ, তাই বুঝি আমি বলি। এমন করে বল্লাম তাবা ভাবলে আমি খাবো।

সর্বজয়া খুশির সহিত পুঁটুলিটা তুলিয়া ঘরে লইযা গেল।

খানিকক্ষণ পরে অপু সুনীলদের বাড়ি গেল। উহাদেব ঘবেব বোযাকে পা দিযই শুনিল, সুনীলের মা সুনীলকে বলিতেছেন-ওসব কেন বযে আনলি বাড়িতে? কে আনতে বলেচে তোকে?

সুনীলও সকলের দেখাদেখি ছাঁদা বাধিঁয়াছিল, বলিল-কেন মা, সবাই তো নিলে–অপুও তো এনেচে।

সুনীলের মা বলিলেন–অপু আনবে না কেন-ও ফলারে বামুনের ছেলে। ও এরপরে ঠাকুরপুজো করে আর ছাদা বেঁধে বেড়াবে,-ওই ওদের ধারা। ওর মা-টাও অমনি হ্যাংলা। ওইজন্যে আমি তখন তোমাদের নিয়ে এ গাযে আসতে চাইনি। কুসঙ্গে পড়ে যত কুশিক্ষে হচ্ছে! যা, ওসব অপুকে ডেকে দিয়ে আয়—যা; না হয় ফেলে দিগে যা। নেমস্তন্ন করেচে। নেমস্তন্ন খেলিছোটলোকের মতো ওসব বেঁধে আনবার দরকাব কি!

অপু ভয় পাইয়া আর সুনীলদের ঘরে ঢুকিল না। বাড়ি ফিরিতে ফিবিতে ভাবিল-যাহা তাহার মা পাইয়া এত খুশি হইল, জেঠাইমা তাহা দেখিয়াই এত রাগিল কেন? খাবারগুলো কি ঢেলামাটি যে, সেগুলো ফেলিয়া দিতে হইবে? তাহার মা হাংলা? সে ফলাবে বামুনের ছেলে? বা রে, জেঠিমা যেন অনেক পানতুয়া-গজা খাইয়াছে, তাহার মা তো ও-সব কিছুই খাইতে পায় না। আর সে-ই বা নিজে এসব ক'দিন খাইয়াছে? সুনীলের কাছে যাহা অন্যায়, তাহার কাছে সেটা কেমন করিয়া অন্যায় হইতে পারে।

লেখাপড় বড় একটা তাহার হয় না, সে এই সবই করিয়া বেড়ায়। ফলার খাওয়া, হ্যাঁদা বাঁধা, বাপের সঙ্গে শিষ্যবাড়ি যাওয়া, মাছধরা। সেই ছোট্ট ছেলে পটু-জেলে পাড়ায় কড়ি খেলিষ্ঠে গিয়া যে সে-বার মারা খাইয়াছিল-সে এ সব বিষয়ে অপুর সঙ্গী। আজকাল সে আরও বড় হইয়াছে, মাথাতে লম্বা হইয়াছে, সব সময় অপুদার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। ওপাড়া হইতে এপাড়ায় আসে। শুধু অপুদার সঙ্গে খেলিতে, আর কাহারও সঙ্গে সে বড় একটা মেশে না। তাহাকে বাঁচাইতে গিয়া অপুদা যে জেলের ছেলেদের হাতে মারা খাইয়াছিল, সেকথা সে এখনও ভোলে নাই।

মাছ ধরিবার শখ অপুর অত্যন্ত বেশি। সোনাডাঙা মাঠের নিচে ইছামতীর ধারে কাঁচিকাটা খালের মুখে ছিপে খুব মাছ ওঠে। প্রায়ই সে এইখানটি গিয়া নদীতীরে একটা বড় ছাতিম গাছের তলায় মাছ ধরিতে বসে। স্থানটা তাহার ভারি ভালো লাগে, একেবারে নির্জন, দুধারে নদীর পাড়ে কত কি গাছপালা নদীর জলে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, ওপারে ঘন সবুজ উলুবন, মাঝে মাঝে লতাদোলানো কদম-শিমুল গাছ, বেগুনী রং-এর বনকলমি ফুলে ছাওয়া ঝোপ, দূরে মাধবপুর গ্রামের বাঁশবন, পাখির ডাকে বনের ছায়ায় উলুবনের শ্যামলতায় মেশামোশি মাখামাখি স্নিগ্ধ নির্জনতা!

সেই ছেলেবেলায় প্রথম কুঠির-মাঠে আসার দিনটি হইতে এই মাঠ-বন-নদীর কি মোহ যে তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে! ছিপ ফেলিয়া ছাতিম গাছের ছায়ায় বসিয়া চারিদিকে চাহিতেই তাহার মান অপূর্ব পুলকে ভরিয়া ওঠে। মাছ হোক বা না হোক, যখনই ঘন বৈকালের ছায়া মাঠের ধারের খেজুর ঝোপের ডাসা খেজুরের গন্ধে ভরপুর হইয়া ওঠে, স্নিগ্ধ বাতাসে চারিধার হইতে বৌ-কথা-কও, পাপিয়ার ডাক ভাসিয়া আসে, ডালে-ডালে অভ্র-আবীর ছড়াইয়া সূর্যদেব সোনাডাঙার মাঠের সেই ঠ্যাঙাড়ে বটগাছটার আড়ালে হেলিয়া পড়েন, নদীর জল কালো হইয়া যায়, গাঙশালিকের দল কলরব করিতে করিতে বাসায় ফেলে, তখনই তাহার মন বিভোর হইযা ওঠে, পুলক-ভরা চোখে চাবিদিকে চাহিয়া দেখে; মনে হয়–মাছ না পাওযা গেলেও রোজ রোজ সে এইখানটিতে আসিয়া বসিবে, ঠিক এই বড় ছাতিম গাছের তলাটাতে।

মাছ প্রায়ই হয় না, শরেব ফাতনা স্থির জলে দণ্ডের পর দণ্ড নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো অটল। একস্থানে অতিক্ষণ বসিয়া থাকিবার ধৈর্য তাহার থাকে না, সে এদিকে ওদিকে ছটফট করিয়া বেড়ায়, ঝোপের মধ্যে পাখির বাসার খোজে, ফিরিয়া আসিয়া হয়তো চোখে পড়ে ফাতনা একটু একটু ঠাকুরাইতেছে! ছিপ তুলিয়া বলে-দূৰ! বেয়া মাছের ঝাক লেগেচে, এখানে কিছু হবে না। পবে সেখান হইতে ছিপ তুলিয়া একটু দূলে শ্যাওলা দামের পাশে গিয়া টোপ ফেলে। জলটার গভীব কালো রঙ-এ মনে হয় বড় বুই কাতলা এখনই টোপ গেলে আর কি! ভ্রম ঘুচিতে বেশি দেবি হয় না, শবের ফাতনা নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হয়...

এক-একদিন সে এক-একখানা বই সঙ্গে করিয়া আনিয়া বসে।

ছিপ ফেলিয়া বই খুলিয়া পড়ে। সুরেশের নিকট হইতে সে একখানা নিচের ক্লাসেব ছবিওয়ালা ইংরাজি বই ও তাহার অর্থপুস্তক চাহিয়া লইয়াছে। ইংরাজি সে বুঝিতে পারে না, অর্থ পুস্তক দেখিয়া গল্পের বাংলাটা বুঝিয়া লয় ও ইংরাজি বইখানাতে শুধু ছবি দেখে। দূর দেশেব কথা ও সকল রকম মহত্ত্বের কাহিনী ছেলেবেলা হইতেই তাহার মনকে বড় দোলা দেয়, এই বইখানাতে সে ধরনের অনেকগুলি গল্প আছে। কোথাকার মুক্ত প্রান্তরে একজন ভ্রমণকারী বিষম তুষাবঝটিকার মধ্যে পথ হারাইয়া চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে শীতে প্রাণ হারায়, অজানা মহাসমুদ্রে পাড়ি দিয়া ক্রিস্টোফার কলম্বাস কিরূপে আমেরিকা আবিষ্কাব করিলেন-এমনি সব গল্প। যে দুটি ইংরাজ বালক-বালিকা সমুদ্রতীরের শৈলগাত্রে গাঙচিলের বাসা হইতে ডিম সংগ্রহ করিতে গিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল, যে সাহসিনী বালিকা প্রাসকোভিয়া লপুলফ নির্বাসিত পিতার নির্বাসনদণ্ড প্রত্যাহার করিবার আশায় জনহীন তুষারাবৃত প্রান্তরের পথে সুদূর সাইবেরিয়া হইতে এক বাহির হইয়াছিল- তাহাদের যেন সে দেখিলেই চিনিতে পারে।

স্যার ফিলিপ সিডনির ছোট্ট গল্পটুকু পড়িয়া তাহার চোখ দুটি জলে ভরিয়া যায়। সুরেশকে গিয়া জিজ্ঞাসা করে-সুরেশদা, এই গল্পটা জানো তুমি? বড় করে বলো না?

সুরেশ বলে-ও, জুটফেনের যুদ্ধের কথা!

অপু অবাক হইয়া বলে-কি সুরেশদা? জুটফেন! কোথায় সে?

সুরেশ ওইটুকুর বেশি আর বলিতে পারে না।...

মাসেখানেক পরে একদিন।

মাছ ধরিতে গিয়া একটা বড় সরপুঁটি মাছ কি করিয়া তাহার ছিপে উঠিয়া গেল। লোভ পাইয়া সে জায়গাটি আর অপু ছাড়ে না-গাছের ডালপালা ভাঙিয়া আনিয়া বিছাইয়া বসে।

ক্রমে বেলা যায়, নদীর ধারের মাঠে আবার সেই অপূর্ব নীরবতা, ওপারের দেয়াড়ের মাঠের পারে সুদূরপ্রসারী সবুজ উলুবনে কাশঝোপে, কদম-শিমুল গাছের মাথায় আবার তাহার শৈশব পুলকের শুভমুহূর্তের অতি পরিচিত, পুরাতন সাথী-বৈকালের মিলিয়ে-যাওয়া শেষ রোদ!

বঙ্গবাসীতে বিলাত-যাত্রীর চিঠির মধ্যে পড়া সেই সুন্দর গল্পটি তাহার মনে পড়ে...

সে সুরেশদাদার ইংরাজি ম্যাপে ভূমধ্যসাগর কোথায় দেখিয়াছে, তারই ওপারে ফ্রান্স দেশ সে জানে। কতকাল আগে ফ্রান্স দেশের বুকে তখন বৈদেশিক সৈন্যবাহিনী চাপিয়া বসিয়াছে, দেশ বিপন্ন, রাজা শক্তিহীন, চারিদিকে অরাজকতা, লুঠ-তরাজ! জাতির এই ঘোর অপমানের দিনে, লোরেন। প্রদেশের অন্তঃপাতী এক ক্ষুদ্র গ্রামে এক দরিদ্র কৃষক দুহিতা পিতার মেষপাল চরাইতে যায়, আর মেষের দলকে ইতস্তত ছাড়িয়া দিয়া নিভৃত পল্লীপ্রান্তরে তৃণভূমির উপর বসিয়া সুনীল নয়ন দুটি আকাশের পানে তুলিয়া নির্জনে দেশের দুর্দশা চিন্তা করে। দিনের পর দিন এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার নিষ্পাপ কুমারী-মনে উদয় হইল কে তাহাকে বলিতেছে-তুমি ফ্রান্সের রক্ষাকত্রী, তুমি গিয়া রাজসৈন্য জড়ো করো, অস্ত্র ধরো, দেশের জাতির পরিত্রামের ভার তোমার হাতে। দেবী মেরী তাহার উৎসাহদাত্রী-দূর স্বর্গ হইতে তাঁহার আহ্বান আসে দিনের পর দিন। তারপর নব্বতেজোদৃপ্ত ফরাসি সৈন্যবাহিনী কি করিয়া শত্রুদলকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল, কি করিয়া ভাবময়ী কুমারী নিজে অস্ত্র ধরিয়া দেশের রাজাকে সিংহাসনে বসাইলেন, তাব।পর অজ্ঞানান্ধ লোকে কি করিয়া তাহাকে ডাইনি অপবাদে জীবন্ত পুড়াইয়া মারিল, এ সকল কথাই সে আজ পড়িয়াছে।

এই বৈকাল বেলাটাতে, এই শান্ত নদীর ধারে গল্পটি ভাবিতে ভাবিতে কি অপূর্ব ভাবেই তাহার মন পূর্ণ হইয়া যায়!-কুমারীর যুদ্ধের কথা, জয়ের কথা, অন্য সব কথা সে তত ভাবে না। কিন্তু যে ছবিটি তাহার বার বার মনে আসে, তাহা শুধু নির্জন প্রান্তরে চিন্তারতা বালিকা আর চারিধারে যাদৃচ্ছিবিচরণশীল মেষদল, নিম্নে শ্যাম তৃণভূমি, মাথার উপর মুক্ত নীল আকাশ। একদিকে দুর্ধর্ষ বৈদেশিক শত্রু, নিষ্ঠুরতা, জয়লালসার দপ, রক্তস্রোত,-অপরদিকে এক সরলা, দিব্য ভাবময়ী নীলনীযনা পল্লীবালিকা। ছবিটা তাহার প্রবর্ধমান বালকমনকে মুগ্ধ করিয়া দেয়।

আরও ছবি মনে আসে। কতদূরের নীল-সমুদ্র-ঘেরা মাটিনিক দ্বীপ। চারিদিকে আখের খেত, মাথার উপর নীল আকাশ-বহু-বহু দূর-শুধু নীল আকাশ আর নীল সমুদ্র!—শুধু নীল আর নীল! আরও কত কি, তাহা বুঝানো যায় না-বলা যায় না।

ছিপ গুটাইয়া সে বাড়ির দিকে যাইবার জোগাড় করে। নদীর ধারে ধারে নতশীর্ষ বাবলা ও সাইবাবলার বন নদীর স্নিগ্ধ কালো জলে ফুলের ভার ঝরাইয়া দিতেছে। সোনাডাঙা মাঠের মাঝে ঠাঙাড়ে বটগাছটার আড়ালে প্রকাণ্ড রক্তবর্ণ সূর্য হেলিয়া পড়িয়াছে'-যেন কোন দেবশিশু অলকার জ্বলন্ত ফেনিল সোনার সমুদ্র হইতে ফু দিয়া একটা বুদ্‌বুদ তুলিয়া খেলাচ্ছলে আকাশে উড়াইয়া দিয়াছিল, এইমাত্র সেটা পশ্চিম দিগন্তে পৃথিবীর বানান্তরালে নামিয়া পড়িতেছে!

পিছন হইতে কে তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল। সে জোর করিয়া হাত দিয়া চোখ ছাড়াইয়া লাইতেই পটু খিলখিল করিয়া হাসিয়া সামনে আসিয়া বলিল-তোকে খুঁজে খুঁজে কোথাও পাইনে অপুদা, তারপল ভাবলাম তুই ঠিক মাছ ধর্তে এইছিস, তাই এলাম। মাছ হয়নি?...একটাও না? চল বরং একখানা নৌকা খুলে নিয়ে বেড়িয়ে আসি–যাবি?

কদমতলায় সাহেবের ঘাটে অনেক দূরদেশ হইতে নৌকা আসে,–গোলপাতা-বোঝাই, ধানবোঝাই, ঝিনুক-বোঝাই নৌকা সারি সারি বাঁধা। নদীতে জেলেদের ঝিনুক-তোলা নৌকায় বড় জাল ফেলিয়াছে। এ সময় প্রতি বৎসরই ইহারা দক্ষিণ হইতে ঝিনুক তুলিতে আসে; মাঝ নদীতে নৌকায় নৌকায় জোড়া দিয়া দাঁড় করিয়া রাখিয়াছে। অপু ডাঙায় বসিয়া দেখিতেছিল,—একজন কলোমতো লোক বার বার ডুব দিয়া ঝিনুক খুঁজতেছে ও অল্পীক্ষণ পরে নৌকার পাশে উঠিয়া হাতের থলি হইতে দু'চারিখানা কুড়ানো ঝিনুক বালি-কাদার রাশি হইতে ছাঁকিয়া নৌকার খোলে ছুড়িয়া ফেলিতেছে। অপু খুশির সহিত পটুকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল-দেখছিস পটু, কতক্ষণ ডুব দিয়ে থাকে? আয় গুনে দেখি এক-দুই করে! পারিস তুই অতক্ষণ ডুবে থাকতে?...

নদীর দুর্বাঘাস-মোড়া তীরটি ঢালু হইয়া জলের কিনারা পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে, এখানে-ওখানে বোঝাই নৌকায় খোটা পোঁতা-নোঙর ফেলা। ইহারা কত দেশ হইতে আসিয়াছে, কত বড় নদী খাল পার হইয়া, বড় বড় নোনা গাঙের জোয়ার-ভাটা-তুফান খাইয়া বেড়ায়,–অপুর ইচ্ছা করে মাঝিদের কাছে বসিয়া সে সব দেশের গল্প শোনে। তাহার কেবল নদীতে নদীতে সমুদ্রে সমুদ্রে বেড়াইতে ইচ্ছা হয়, আর কিছু সে চায় না। সুরেশের বইখানাতে নানা দেশের নাবিকদের কথা পড়িয়া অবধি ওই ইচ্ছাই তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে! পটু ও সে নৌকার কাছে গিয়া দর করে-ও মাঝি, এই গোলপাতা একপাটি কি দর?...তোমার এই ধানের নৌকো কোথাকার, ও মাঝি?...ঝালকাঠির? সে কোন দিকে, এখান থেকে কতদূর?...

পটু বলিল-অপু-দা, চল তেঁতুলতলার ঘাটে একখানা ডিঙি দেখি, একটু বেড়িয়ে আসি চল। দুজনে তেঁতুলতলার ঘাট হইতে একখানা ছোট্ট ডিঙি খুলিয়া লইয়া, তাহাকে এক ঠেলা দিয়া ডিঙির উপর চড়িয়া বসিল। নদীজলের ঠাণ্ডা আদ্র গন্ধ উঠিতেছে, কলমি-শাকের দামে জলপিপি বসিয়া আছে, চরের ধারে-ধারে চাষীরা পটলক্ষেত নিড়াইতেছে, কেহ ঘাস কাটিয়া আঁটি বাঁধিতেছে, চালতেপোতার বাঁকে তীরবতী ঘন ঝোপে গাঙশালিকের দল কলরব করিতেছে, পড়ন্ত বেলায় পুব আকাশের গায়ে নানা রঙের মেঘস্তুপ।

পটু বলিল-অপু-দা একটা গান কর না? সেই গানটা সেদিনের!

অপু বলিল–সেটা না। বাবার কাছে সুর শিখে নিয়েছি একটা খুব ভালো গানের। সেইটে গাইবো, আর-এাষ্ট্র ওদিকে গিয়ে কিন্তু ভাই, এখানে ডাঙায় ওই সব লোক রয়েচে—এখানে না।

–তুই ভারি লাজুক অপু-দা। কোথায় লোক রয়েচে কতদূরে, আবাঁ তোল গান গাইতে-দূৰ, ধরা সেইটো!

খানিকটা গিয়া অপু গান শুরু করে। পটু বাঁশের চটার বৈঠাখানা তুলিয়া লইয়া নৌকোর গলুইএ চুপ করিয়া বসিয়া একমনে শোনে; নৌকা বাহিবার আবশ্যক হয় না, স্রোতে আপনা- আপনি ভাসিয়া ডিঙিখানা ঘুরিতে ঘুরিতে লা-ভাঙার বড় বাঁকের দিকে চলে। অপুর গান শেষ হইলে পটু একটা গান ধরিল। অপু এবার বাহিতেছিল। নৌকা কম দূরে আসে নাই–লা-ভাঙার বাঁকটা নজরে পড়িতেছিল। এরই মধ্যে হঠাৎ পটু ঈশানকোণের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বুলিল– ও অপু দা, কি রকম মেঘ উঠেচে দেখছিস! এখুনি ঝড় এলো বলে-নৌকা ফেরাবি?

অপু বলিল-হোকগে ঝড়, ঝড়েই তো নৌকা বাইতে–গান গাইতে লাগে ভালো, চল আরও যাই।

কথা বলিতে বলিতে ঘন কালো মেঘখানা মাধবপুরের মাঠের দিক হইতে উঠিয়া সারা আকাশ ভরিয়া ফেলিল, তাহার কালো ছায়া নদীজল ছাইয়া ফেলিল। পটু উৎসুক চোখে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। অনেক দূরে সো সে রব উঠিল, একটা অস্পষ্ট গোলমালের সঙ্গে অনেক পাখির কলরব শোনা গেল, ঠাণ্ডা হাওয়া রহিল, ভিজা মাটির গন্ধ ভাসিয়া আসিল। পাখাওয়ালা আকোদর বীজ মাঠের দিক হইতে অজস্র উড়িয়া আসিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে গাছপালা মাথা লুটাই যা দোলাইয়া ভাঙিয়া ভীষণ কালবৈশাখীর ঝড় উঠিল।

নদীর জল ঘন কালো হইয়া উঠিল, তীরের সাইবাবলা ও বড় বড় ছাতিম গাছের ডালপালা ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল, সাদা বকের দল কালো আকাশের নিচে দীর্ঘ সারি বাঁধিয়া উড়িয়া পলাইল! অপুর বুক ফুলিয়া উঠিল, উৎসাহে উত্তেজনায় সে হাল ছাড়িয়া চারিধারে চাহিয়া ঝড়ের কাণ্ড দেখিতে লাগিল, পটু কেঁচার কাপড় খুলিয়া ঝড়ের মুখে পালের মতো উড়াইয়া দিতেই বাতাস বাধিয়া সেখানা ফুলিয়া উঠিল।

পটু বলিল-বড্ড মুখোড় বাতাস অপু-দা, সামনে আর নৌকা যাবে না। কিন্তু যদি উলটে যায়? ভাগ্যিস সুনীলকে সঙ্গে করে আনিনি!

অপু কিন্তু পটুর কথা শুনিতেছিল না, সেদিকে তাহার কান ছিল না-মনও ছিল না। সে নৌকার গলুইয়ে বসিয়া একদৃষ্টি ঝটিকাঙ্কুব্ধ নদী ও আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার চারিধারে কালো-নদীর নর্তনশীল জল, উড়ন্ত বকের দল, ঝোড়ো মেঘের রাশি, দক্ষিণ দেশের মাঝিদের ঝিনুকের স্তুপগুলা, স্রোতে ভাসমান কচুরিপানার দাম সব যেন মুছিয়া যায়! নিজেকে সে “বঙ্গবাসী’ কাগজের সেই বিলাত-যাত্রী কল্পনা করে! কলিকাতা হইতে তাহার জাহাজ ছাড়িয়াছে; বঙ্গোপসাগরের মোহনায় সাগরদ্বীপ পিছনে ফেলিয়া সমুদ্র-মাঝের কত অজানা ক্ষুদ্র দ্বীপ পার হইয়া, সিংহল-উপকূলের শ্যামসুন্দর নারকেলবনশ্রী দেখিতে দেখিতে কত অপূর্ব দেশের নীল পাহাড় দূরচক্রবালে রাখিয়া, সূর্যাস্তের রাঙা আলোয় অভিষিক্ত হইয়া, নতুন দেশের নব নব দৃশ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে!-চলিয়াছো-চিলিয়াছে!

এই ইছামতীর জলের মতোই কালো, গভীর ক্ষুব্ধ, দুরের সে অদেখা সমুদ্রবক্ষ; এই রকম সবুজ বনঝোপ আরব সমুদ্রের সে দ্বীপটিতেও। সেখানে এইরকম সন্ধ্যায় গাছতলায় বসিয়া এডেন বন্দরে সেই বিলাত-যাত্রী লোকাটিব মতো সে রূপসী আরবী মেয়ের হাত হইতে এক গ্লাস জল চাহিয়া লইয়া খাইবে। চালিতেপোতার বাকের দিকে চাহিলে খবরের কাগজে বর্ণিত জাহাজের পিছনেব সেই উড়নশীল জলচর পক্ষীর বাঁককে সে একেবারে স্পষ্ট দেখিতে পায় যেন!..

সে ওই সব জায়গায় যাইবে, ওই সব দেখিবে, বিলাত যাইবে, জাপান যাইবে, বাণিজ্যযাত্রা করিবে, বড় সওদাগর হইবে, অনবরত দেশে-বিদেশে সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরিবে, বড় বড় বিপদের মুখে পড়িবে; চীনসমুদ্রের মধ্যে আজিকার এই মনমাতানো কালবৈশাখীর ঝড়েব মতো বিষম ঝড়ে তাহার জাহাজ ডুবু ডুবু হইলে “আমার অপূর্ব ভ্রমণ’-এ পঠিত নাবিকদের মতো সেও জালি-বোটে করিয়া ডুবোপাহাড়ের গায়ে-লগা গুগলি-শামুক পুড়াইয়া খাইতে খাইতে অকূল দরিযায় পাড়ি দিবে! ওই যে মাধবপুর গ্রামের বাশবনের মাথায় তুতে রং-এর মেঘের পাহাড় খানিকটা আগে ঝুঁকিয়া ছিল—ওরই ওপারে সেই সব নীল-সমুদ্র, অজানা বেলাভূমি, নারিকেলকুঞ্জ, আগ্নেয়গিরি,

তুষাববষী প্রান্তর, জেলেখা, সরযু, গ্রেস ডার্লিং, জুটুফেন, গাঙচিল-পাখির-ডিম-আহরণরতা সেই সব সুশ্রী ইংরাজ বালক-বালিকা, সোনাকর জাদুকর বটগার, নির্জন প্রান্তরে চিস্তারিতা লোরেনের সেই নীলনয়না পল্লীবালা জোয়ান-আরও কত কি আছে! তাহার টিনের বাক্সের বই কখানা, রানু-দিদিদের বাড়ির বইগুলি, সুরেশ-দাদার কাছে চাহিয়া লওয়া বইখানা, পুরাতন “বঙ্গবাসী’ কাগজগুলো ওই সব দেশের কথাই তাহকে বলে; সেসব দেশে কোথায় কাহারা যেন তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। সেখান হইতে তাহারও ৬কি আসিবে একদিন-সো-ও যাইবে!

এ কথা তাহার ধারণায় আসে না কতদূরে সে সব দেশ, কে তাহাকে লইয়া যাইবে, কি করিয়া তাহার যাওয়া সম্ভব হইবো! আর দিনকতক পরে বাড়ি-বাড়ি ঠাকুরপূজা করিয়া যাহাবের সংসার চালাইতে হইবে, রাত্রিতে যাহার পড়িবার তেলের জন্য মায়ের বকুনি খাইতেও হয়, অত বয়স পর্যন্ত যে ইস্কুলের মুখ দেখিল না, ভালো কাপড়, ভালো জিনিস যে কাহাকে বলে জানে না-সেই মূর্খ, অখ্যাত সহায়-সম্পদহীন পল্লীবালককে বৃহত্তর জীবনের আনন্দ-যজ্ঞে যোগ দিতে কে আহ্বান করিবে?

এ সব প্রশ্ন মনে জাগিলে হয়তো তাহার তরুণ-কল্পনার রথবেগ-তাহার আশাভরা জীবনপথের দুর্বর মোহ, সকল ভয় সকল সংশয়কে জয় করিতে পারিত; কিন্তু এসকল কথা তাহার মনেই ওঠে না। শুধু মনে হয়-বড় হইলেই সব হইবে, অগ্রসর হইলেই সকল সুযোগ-সুবিধা পথের মাঝে কুড়াইয়া পাইবে…এখন শুধু বড় হইবার অপেক্ষা মাত্র। সে বড় হইলে সুযোগ পাইবে, দিক দিক হইতে তাহার সাদর আমন্ত্রণ আসিবো,-সে জগৎ জানার, মানুষ চেনার দিগ্বিজয়ে যাইবে।

রঙিন ভবিষ্যৎ জীবন-স্বপ্নে বিভোর হইয়া তাহার বাকি পথটুকু কাটিয়া যায়। বৃষ্টি আর পড়ে না, ঝড়ে কালো মেঘের রাশি উড়াইয়া আকাশ পরিষ্কার করিয়া দিতেছিল। তেঁতুলতলার ঘাটে ডিঙি ভিড়িতেই তাহার চমক ভাঙে; নৌকা বাঁধিয়া পটুর আগে আগে সে বাঁশবনের পথে উল্লাসে শিস্য দিতে দিতে বাড়ির দিকে চলে। সে-ও তাহার মা ও দিদির মতো স্বপ্ন দেখিতে শিখিয়াছে।

# অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

আসলে অপু কিন্তু ঘুমায় নাই, সে জাগিয়া ছিল। চোখ বুজিয়া শুইয়া রাত্রে মায়ের সঙ্গে বাবার যেসব কথাবার্তা হইতেছিল, সে সব শুনিয়াছে। তাহারা এদেশের বাস উঠাইয়া কাশী যাইতেছে। এদেশ অপেক্ষা কাশীতে থাকিবার নানা সুবিধার কথা বাবা গল্প করিতেছিল মায়ের কাছে। বাবা অল্প বয়সে সেখানে অনেকদিন ছিল, সে দেশের সকলের সঙ্গে বাবার আলাপ ও বন্ধুত্ব, সকলে চেনে বা মানে। জিনিসপত্রও সস্তা। তাহার মা খুব আগ্রহ প্রকাশ করিল, সে সব সোনার দেশে কখনও কাহারও অভাব নাই–দুঃখ এ-দেশে বারোমাস লাগিয়াই আছে, সাহস করিয়া সেখানে যাইতে পারিলেই সব দুঃখ ঘুচিবে। মা আজ যাইতে পাইলে আজই যায়, একদিনও আর থাকিবার ইচ্ছা নাই। শেষে স্থির হইল বৈশাখ মাসের দিকে তাহদের যাওয়া হইবে।...

গঙ্গানন্দপুরের সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুর-বাড়িতে সর্বজয়ার পূজা মানত ছিল। কোশ তিনেক দূরে কে পূজা দিতে যায়—এইজন্য এ-পর্যন্ত মানত শোধ হয় নাই। এবার এদেশ হইতে যাইবার পূর্বে পূজা দিয়া যাওয়া দরকার, কিন্তু খুঁজিয়া লোক মিলিল না। অপু বলিল-সে পূজা দিয়া আসিবে ও ওই গ্রামে তাহার পিসিমা থাকেন, তাহার সহিত কখনও দেখাশোনা হয় নাই, আমনি দেখা করিয়া আসিবে। তাহার মা বলিল-যাঃ, বকিস নে তুই, একলা যাবি বই কি? এখান থেকে প্রায় চার-ক্লোশ পথ।

অপু মায়ের সঙ্গে তর্ক শুরু করিল-আমি বুঝি সবদিন এইরকমবাড়িতে বসে থাকবো? যেতে পাববো না কোথাও বুঝি? আমার বুঝি চোখ নেই, কান নেই, পা নেই?

–সব আছে, উনি একলা যাবেন সেই গঙ্গানন্দপুর-বড় সাহসী পুরুষ কিনা!

অবশেষে কিন্তু অপুর নির্বন্ধতিশয্যে তাহাকেই পাঠাইতে হইল।

সোনাডাঙা মাঠের বুক চিরিয়া উঁচু মাটির পথ। পথের দু'ধারে মাঠের মধ্যে শুধুই আকন্দযুলের বন, দীর্ঘ শ্বেতাভ ডাটাগুলি ফুলের ভারে নত হইয়া দূর্বাঘাসের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। পথে কোনো লোক নাই, দুপুরের অল্পই দেরি আছে, গাছপালার ছায়া ছোট হইয়া আসিতেছে। অপুর খালি পায়ে বেলেমাটির তাত লাগিতেছিল-তোহাতে বেশ আরাম হয়। পথের ধারের বন-ঝোপে কত কি ফুল ফুটিয়াছে, সাইবাবলা গাছের নতুন ফোটা ফুলের শিষ সূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া আছে, ছোট এক রকমের গাছে রাঙা রাঙা বনভুমুরের মতো কি ফল অজস্র পাকিয়া টুকটুক করিতেছে, মাটির মধ্য হইতে কেমন রোদপোড়া সোদা সোদা গন্ধ বাহির হইতেছে..সে মাঝে মাঝে নিচু হইয়া ঝোপের ভিতর হইতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বৈঁচিফল তুলিয়া হাতে-সেলাই-করা রাঙা সাটিনের জামাটার দু'পকেট ভর্তি করিয়া লইতেছিল।

যাইতে যাইতে তাহার মন পুলকে ভরিয়া উঠিতেছিল। সে কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে পারে না যে, সে কী ভালোবাসে এই মাটির তাজা রোদপোড়া গন্ধটা, এই ছায়াভিরা দূর্বাঘাস, সূর্যের আলোমাখানো মাঠ, পথ, গাছপালা, পাখি, বনঝোপ, ওই দোলানো ফুলফুলের থোলো, আলকুশি, বনকালমি, নীল অপরাজিতা। ঘরে থাকিতে তাহার মোটেই ইচ্ছা হয় না; ভারি মজা হয় যদি বাবা তাহাকে বলে-খোকা, তুমি শুধু পথে পথে বেড়িয়ে বেড়াও, তাহা হইলে এইরকম বনফুল-ঝুলানো ছায়াচ্ছন্ন ঝোপের তলা দিয়া ঘুঘু-ডাকা দূর বনের দিকে চোখ বাখিয়া এই রকম মাটির পথটি বাহিয়া শুধুই হ্যাঁটে—শুধুই হ্যাঁটে।…মাঝে মাঝে হয়তো বাঁশবনের কঞ্চির ডালে ডালে শরশিরা শব্দ, বৈকালের রোদে সোনার সিঁদুর ছড়ানো আর নানা রঙ-বেরঙ-এর পাখির গান।

অপুর শৈশব কাটিতেছিল এই প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে। এক ঋতু কাটিয়া গিয়া কখন অন্য ঋতু পড়ে-গাছপালায়, আকাশে বাতাসে, পাখির কাকলীতে তাহার বার্তা রাটে। ঋতুতে ঋতুতে ইছামতীর নব নব পরিবর্তনশীল রূপ সম্বন্ধে তাহার চেতনা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল–কোন ঋতু গাছপালায় জলে-স্থলে-শূন্যে ফুলে ফলে কি পরিবর্তন ঘটায় তাহা সে ভালো করিয়া চিনিয়া ফেলিয়াছিল। ইহাদের সহিত এইঘনিষ্ঠ যোগ সে ভালোবাসে, ইহাদের ছাড়া সে জীবন কল্পনা করিতে পারে না। এই বিরাট অপরূপ ছবি চোখের উপরে রাখিয়া সে মানুষ হইতেছিল। গ্রীষ্মের খরতাপ ও গুমোটের অবসানে সারা দিকচক্রবাল জুড়িয়া ঘননীল মেঘসজ্জার গভীর সুন্দর রূপ, অস্তবেলায় সোনাডাঙার মাঠের উপরকার আকাশে। কত বর্ণের মেঘের খেলা, ভদ্রের শেষে ফুটন্ত কাশ-ফুলেভরা মাধবপুরের দূরপ্রসারিত চর, চাঁদিনী রাতে জ্যোৎস্নাজালের খুপরি-কাটা বাঁশবনেব তলা,–অপুর স্মৃটিনোমুখ কৈশোরের সতেজ আগ্রহভরা অনাবিল মনে ইহাদের অপূর্ব বিশাল সৌন্দর্য চিরস্থায়ী ছাপ মারিয়া দিয়াছিল, কান্তিরসের চোখ খুলিয়া দিয়াছিল, চুপি চুপি তাহার কানে অমৃতের দীক্ষামন্ত্র শুনাইয়াছিল।–অপু কখনও জীবনে এ শিক্ষা বিস্মৃত হয় নাই। চিবজীবন সৌন্দর্যের পূজারি হইবার ব্রত, নিজের অলক্ষিতে মুক্তরূপা প্রকৃতি তাহাকে তাহা ধীরে ধীবে গ্রহণ করাইতেছিলেন।…

নতিডাঙার বঁওড়ে কাহারা মাছ ধরিয়াছে। সে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিল। গ্রামেব মধ্যে একটা কানা ভিখারি একতারা বাজাইয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতেছে-ও গান তো অপু জানে– কতবার গাহিয়াছে–

দিন-দুপুরে চাঁদের উদয় রাত পোহানো হোল ভার।…

বোষ্টম দাদু গানটা খুব ভালো গায়।

হরিশপুরের মধ্যে ঢুকিয়া পথের ধারে একটা ছোট্ট চালাঘরে পাঠশালা বসিয়াছে, ছেলেরা সুর করিয়া নামতা পড়িতেছে, সে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। গুরুমশায়ের বয়স বেশি নয়, তাহদের গাঁয়েব প্রসন্ন গুরুমশায়ের চেয়ে অনেক কম।

আর এক কথা তাহার বার বার মনে হইতেছিল। এই তো সে বড় হইয়াছে, আর ছোট নাই, ছোট থাকিলে কি আর মা একা কোথাও ছাড়িয়া দিত?...এখন কেবলই চলা, কেবলই সামনে আগাঁইয়া যাওয়া। তাহা ছাড়া, আসচে। মাসের এই দিনটিতে তাহারা কতদূর, কোথায় চলিয়া যাইবে! কোথায় সেই কাশী-সেখানে!

বৈকালের দিকে গঙ্গানন্দপুরে গিয়া পৌঁছিল। পাড়ার মধ্যে পৌঁছিতেই কোথা হইতে রাজ্যের লজ্জা তাহাকে এমন পাইয়া বসিল যে, সে কোনো দিকে চাহিতেই পারিল না। কায়ক্লেশে সম্মুখের পথে দৃষ্টি রাখিয়া কোনোরকমে পথ চলিতে লাগিল। তাহার মনে হইল সকলেই তাহার দিকে চাহিতেছে। সে যে আজ আসিবে তাহা যেন সকলেই জানো; হয়তো ইহারা এতক্ষণ মনে মনে বলিতেছে-এই সেই যাচ্ছে, দ্যাখা দ্যাখ্য' চেয়ে।...সে যে পুঁটুলির ভিতর বাঁধিয়া নারিকেল-নাড় লইয়া যাইতেছে, তাহাও যেন সকলেই জানে। তাহার পিসেমশায় কুঞ্জ চক্রবতীর বাড়িটা কোনদিকে এ কথাটা পর্যন্ত সে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

অবশেষে এক বুড়িকে নির্জনে পাইয়া তাহাকেই জিজ্ঞাসা করাতে সে বাড়ি দেখাইয়া দিল। বাড়িটার সামনে পাঁচিল-ঘেরা। উঠানে ঢুকিয়া সে কাহারও সাক্ষাৎ পাইল না। দু'একবার কাশিল, মুখ দিয়া কথা বাহির হয়। সাধ্য কি? কতক্ষণ সে চৈত্রমাসের খররৌদ্রে বাহিরের উঠানে দাঁড়াইয়া থাকিত ঠিকানা নাই, কিন্তু খানিকটা পরে একজন আঠারো-উনিশ বছরের শ্যামবর্ণ মেয়ে কি কাজে বাহিরে আসিয়া রোয়াকে পা দিতেই দেখিল-দরজার কাছে কাহাদের একটি অপরিচিত প্রিয়দর্শন বালক পুঁটুলি-হাতে লজ্জাকুণ্ঠিত ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। মেয়েটি বিস্মিতভাবে বলিল–

তুমি কে খোকা? কোথেকে আসচো?...

অপু আনাড়ির মতো আগাইয়া আসিয়া অতিকষ্টে উচ্চারণ করিল–এইআমার বাড়ি–নিশ্চিন্দিপুরে, আমার-নাম অ-অপু।

তাহার মনে হইতেছিল, না আসিলেই ভালো হইত। হয়তো তাহার পিসিমা তাহার এরূপ অপ্রত্যাশিত আগমনে বিরক্ত হইবে, হয়তো ভাবিবে কোথা হইতে আবার এক আপদ আসিয়া জুটিল।...তাহা ছাড়া,-কে জানিত আগে যে অপরিচিত স্থানে আসিয়া কথাবার্তা কওয়া এত কঠিন কাজ? তাহার কপাল ঘামিয়া উঠিল।

কিন্তু মেয়েটি তখনই ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া মহা-আদরে রোয়াকে উঠাইয়া লইয়া গেল। তাহার মা-বাবা কেমন আছেন সেকথা জিজ্ঞাসা করিল। তাহার চিবুকে হাত দিয়া কত আদরের কথা বলিল। দিদিকে যদিও কখনও দেখে নাই। তবুও দিদির নাম করিয়া খুব দুঃখ করিল। নিজের হাতে তাহার গায়ের জামা খুলিয়া হাতমুখ ধোয়াইয়া শুকনা গামছা দিয়া মুছইয়া তাড়াতাড়ি এক গ্লাস চিনির শরবৎ করিয়া আনিল। পিসি বলিতে সে যাহা ভাবিয়ছিল তাহা নয়, অল্প বয়স, রাজীর দিদির চেয়ে একটু বড়।

তাহার পিসিও তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। জ্ঞাতি-সম্পর্কের ভাইপোটি যে দেখিতে এত সুন্দর বা তাহার বয়স এত কম তাহার পিসি বোধ হয় ইতিপূর্বে জানিত না। তাই পাশের বাড়ি হইতে একজন প্রতিবেশিনী আসিয়া অপুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে একটু গর্বের সহিত বলিল-আমার ভাইপো, নিশ্চিন্দিপুরে বাড়ি, খুড়তুতো ভায়ের ছেলে; সম্পর্কে খুবই আপন, তবে আসা-যাওয়া নেই। তাই!... পরে সে পুনরায় গর্বের চোখে অপুর দিকে চাহিয়া রহিল। ভাবটা এই–দ্যাখো আমার ভাইপোর কেমন রাজপুত্তুরের মতো চেহারা, এখন বোঝে কী দরের-কী বংশের মেয়ে আমি!...

সন্ধ্যার পর কুঞ্জ চক্রবর্তী বাড়ি আসিল। পাকশিটে-মারা চোয়াড়ে-চোয়াড়ে চেহারা, বয়স বুঝিবার উপায় নাই। তাহার পিসিকে দেখিয়া তাহার যেমন লজ্জা হইয়াছিল, পিসেমশায়কে তেমনি তাহার ভয় হইল। ছেলেবেলায় সে যে প্রসন্ন গুরুমশায়ের কাছে পড়িত, তেমনি যেন চেহারাটা। মনে হইল এ লোক যেন এখনই বলিতে পারে-বড্ড জ্যাঠা ছেলে দেখচি তো তুমি?...

পরদিন সকালে উঠিয়া অপু পাড়ার পথে এদিকে-ওদিকে একটু ঘুরিয়া আসিল। চারিদিক জঙ্গলে ভরা, ফাঁকা জমি-দূর্বাঘাস প্রায় নাই, এমন জঙ্গল। এই একটা বাড়ি, আবার বনে-ঘেরা সুড়িপথ বাহিয়া গিয়া আবার দূরে একটা বাড়ি। অনেক সময় লোকের বাড়ির উঠানের উপর দিয়া পথ। তাহার বয়সি দু'চারজনকে খেলা করিতে দেখিল বটে, কিন্তু সকলেই তাহার দিকে এমন হ্যাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল যে, তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিবার চেষ্টা করা তো দূরের কথা, সে তাহাদের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না।

পিসির বাড়ির দিকে ফিরিবার সময়ও বিপদ। এরূপ সকালে মার কাছে সে চিড়া, মুড়ি, নাড়ু বা বাসি-ভাত খাইয়া থাকে। এখানে কি উহারা দিবে? কাল তো রাত্রে ভাত খাইবার সময় দুধের সঙ্গে সন্দেশ কিনিয়া আনিয়া দিয়াছে। আজ যদি সে এখনই ফিরে, তবে হয়তো উহারা ভাবিবে ছেলেটা ভারি পেটুক; খাবার খাইবার লোভে-লোভে এত সকালে বাড়ি ফিরিল। রোজ রোজ খাবার খাওয়া কি ভালো?...এখন সে কি করে? নাঃ,

বাড়ি ফিরিবে না। আরও খানিক পথে পথে ফিরিয়া একেবারে সেই ভাত খাওয়ার সময়ের একটু আগে বাড়ি যাইবে। অপরিচিত জায়গায় এতক্ষণ পথেই বা কোথায় দাঁড়াইয়া থাকে?

পায়ে পায়ে সে অবশেষে বাড়িতেই আসিয়া পৌঁছিল।

একটি ছয়-সাত বছরের মেয়ে একটা কাঁসার বাটি হাতে বাড়ি ঢুকিয়া উঠান হইতে ডাকিয়া কহিল-নাউ রেঁধেচো জেঠিমা, মোরে একটু দেবে?...

অপুর পিসিমা ঘরের ভিতর হইতে বলিল-কে রে, গুলকী? না, ওবেলা রাধবো, এসে নিয়ে যাস...

গুলকী বাটি নামাইয়া রোয়াকের ধারে দাঁড়াইয়া রহিল। মাথার চুলগুলা কাঁকড়া ঝাকড়া, ছেলেদের চুলের মতো খাটো। ময়লা কাপড় পরনে, মাথায় তেল নাই, রং শ্যামবর্ণ। অপুর দিকে চাহিয়া, কি বুঝিয়া একবার ফিক করিয়া হাসিয়া সে বাটি উঠাইয়া চলিয়া গেল।

অপু জিজ্ঞাসা করিল-মেয়েটা কাদের পিসিমা?

তাহার পিসি বলিল-কে, গুলকী? ওদের বাড়ি এখানে না-ওর মা-বাপ কেউ কোথাও নেই। নিবারণ মুখুজ্যের বৌ-এই যে পাশের বাড়ি, ওর দূর-সম্পর্কের জেঠি-সেখানেই থাকে।

পরদিন পাড়ার একটা ছেলে আসিয়া যাচিয়া তাহার সঙ্গে ভাব করিল ও সঙ্গে করিয়া গ্রামের সকল পাড়া ঘুরাইয়া দেখাইয়া বেড়াইল। বাড়ি ফিরিবার পথে দেখিল-সেই অনাথা মেয়ে গুলকী পথের ধারে পা ছড়াইয়া একলাটি বসিয়া কী খাইতেছে। তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আঁচল গুটাি‍ইতে গেল-আঁচলে একরাশ আধাপাকা বকুল ফল। অপু। ইতিমধ্যে পিসিমার কাছে তাহার আরও পরিচয় লইয়াছে; নিবারণ মুখুজ্যের বৌ ভালো ব্যবহার করে না, লোক ভালো নয়। পিসিমা বলিতেছিল– জেঠি তো নয় রণচণ্ডী, কত দিন খেতেও দেয় না, এর বাড়ি ওর বাড়ি খেয়ে বেড়ায়। নিজের পুষ্যিই সাতগাণ্ডা—তাদেরই জোটে না, তায় আবার পর!.গুলকীকে দেখিয়া অপুর মোটেই লজ্জা হয় নাছোট্ট একটুকু মেয়েটা, আহা কেহ নাই! তাহার সঙ্গে ভোব করিতে অপুর বড় ইচ্ছা হইল। সে কাছে গিয়া বলিল-আঁচলে কি লুকুচ্চিস দেখি খুকি?..

গুলকী হঠাৎ আঁচল গুটাি‍ইয়া লইয়া ফিক করিয়া হাসিয়া নিচু হইয়া দৌড় দিল। তাহার কাণ্ড দেখিয়া অপুর হাসি পাইল। ছুটিবার সময় গুলকীর আঁচলের বকুল ফল

পড়িতে পড়িতে চলিয়াছিল, সেগুলি সে কুড়াইতে কুড়াইতে বলিল-পড়ে গেল, সব পড়ে গেল, নিয়ে যা তোর বকুল ও খুকি, কিছু বলবো না, ও খুকি!..

গুলকী ততক্ষণে উধাও হইয়াছে।

পুকুরে স্নান সারিয়া আসিয়া সে বসিয়া আছে, এমন সময় দেখিতে পাইল খিড়কি দরজার আড়াল হইতে গুলকী একবার একটুখানি করিয়া উঁকি মারিতেছে আর একবার মুখ লুকাইতেছে। তাহার সহিত চোখোচোখি হওয়াতে গুলকী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। অপু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল-দাঁড়া, তোকে ধরচি এক দৌড়ে—বলিয়া সে খিড়কি-দরজার দিকে ছুটিল।

গুলকী আর পেছন দিকে না চাহিয়া পথ বাহিয়া সোজা পুকুরপাড়ের দিকে ছুটু দিল। কিন্তু অপুর সঙ্গে পরিবে কেন? নিরূপায় দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেই অপু তাহার কাঁকড়া চুলগুরা মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া বলিল-বড় ছুটি দিচ্ছিলি যে? আমার সঙ্গে ছুটে বুঝি তুই পারবি, খুকি?

গুলকীর প্রথম ভয় হইয়াছিল বুঝি বা তাহাকে মারিবে! কিন্তু অপু চুলের মুঠি ছাড়িয়া দিয়া হাসিয়া ফেলায়, সে বুঝিল এ একটা খেলা। সে আবার সেই রকম হাসিয়া ফেলিল।

অপুর বড় দয়া হইল। তাহার মুখের হাসিতে এমন একটা আভাস ছিল যাহাতে অপুর মনে হইল এ তাহার সঙ্গে ভোব করিতে চায়-খেলা করিতে চায়; কিন্তু ছেলেমানুষ, কথা কহিতে জানে না বলিয়া এইরকম উকিঝুকি মারিয়া-ফিক করিয়া হাসিয়া-দৌড়িয়া পলাইয়া-তাহার ইচ্ছা প্রকাশ করে। অন্য উপায় ইহার জানা নাই। এ যেন ঠিক তাহার দিদি: এই বয়সে দিদি যেন এই রকমই ছিল–এই রকম আঁচলে কুল-বেল-বৈঁচি বাঁধিয়া আপন মনে ঘুরিয়া বেড়াইত, কেহ বুঝিত না, কেহ দেখিত না, এই রকম পেটুক-এই রকম বুদ্ধিহীন ছোট মেয়ে!

অপু ভাবিল-এর সঙ্গে কেউ খেলা করে না, একে নিয়ে একটু খেলি। আহা, মা-বাপ-হারা দুঃখী মেয়ে, আপন মনে বেড়ায়!—সে গুলকীর চুলের মুঠ ছাড়িয়া দিয়া হাত ধরিয়াছিল, বলিলখেলা করবি খুকি? চল ওই পুকুরের পাড়ে। না, এক কাজ করা খুঁকি, আমি তোকে ধরবো-আর তুই ছুটে যাবি; ওই কাঁঠাল গাছটা বুড়ি। আয়

মুঠ ছাড়িয়া দিতেই গুলকী আর না দাঁড়াইয়া আবার নিচু হইয়া দৌড় দিল। অপু চেঁচাইয়া বলিল–আচ্ছা যা, যা দেখি কদূর যাবি-ঠিক তোকে ধরব দেখিস। আচ্ছা ওই গেলি তো এই দ্যাখ-বলিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া সে এক দৌড় দিল-চু-উ-উ-উ। গুলকী পিছন দিকে চাহিয়া অপুকে দৌড়িতে দেখিয়া প্রাণপণে যতটুকু তাহার ক্ষুদ্র শক্তিতে

কুলায় দৌড়িবার চেষ্টা করিল–কিন্তু অপু একটুখানি ছুটিয়া গিয়াই তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। ভারি ছুটতে শিখিচিস খুঁকি না? তা কি তুই আমার সঙ্গে পারিস? চল চোর-চৌকিদার খেলা করবি-তুই হবি চোর-এই কাঁঠাল পাতা চুরি

গুলকীর মুখে হাসি আর ধরিতেছিল না-হয়তো সে এতক্ষণ মনে মনে চাহিতেছিল এই সুন্দর ছেলেটির সঙ্গে ভাব করিতে। মাথা নাড়িয়া আশ্বাস দিবার সুরে বলিল-কাইবিচি নেবে?

অপু মনে ভাবিল চাষার গ্রামে থাকিয়া ও এই সব কথা শিখিয়াছে।–তাহদের গ্রামে যেমন গোয়ালা কি সদগোপের ছেলেমেয়েরা কথা বলে তেমনি।

দুপুরবেলা তাহার পিসিমা ডাকিলে পিছনে পিছনে গুলকী আসিল! অপুর খাওয়া হইয়া গেলে তাহার পিসি জিজ্ঞাসা করিল-ভাত খাবি গুলকী? অপুর পাতে বোস-মোচার ঘণ্ট আছে—ডাল দিচ্ছি, অপু ভাবিল–আহা, ও খাবে জানলে দুখানা মাছ ওর জন্যে রেখে দিতাম। গুলকী দ্বিরুক্তি না। করিয়া নির্লজ্জভাবে খাইতে বসিল। অনেকগুলি ভাত চাহিয়া লইয়া ডাল দিয়া সেগুলি মাখিল, পরে অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া অত ভাত না খাইতে পারিয়া পাতের পাশে রাশীকৃত ঠেলিয়া রাখিল। তবুও উঠিবার নাম করে না। অপুর পিসিমা হাসিয়া বলিল-আর খেতে হবে না গুলকী-হ্যাঁসফাঁস কচ্চিাস-নে ওঠ, কত ভাত নিয়ে ফেললি দ্যাখা তো? তোর কেবল দিষ্টি-খিদে-পরে বলিল, জেঠিমার কাণ্ড দ্যাখো-এতখানি বেলা হয়েচে-কাঁচা মেয়েট-ভাত খেতে ডাকেও না? হলাইবা পর-তা হলেও কচি তো?…

শনিবারে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে অপু পূজা দিতে গেল। আচার্য ঠাকুরের খুব লম্বা সাদা দাড়ি বুকের ওপর পড়িয়াছে, বেশ চেহারা। তাহার বিধবা মেয়ে বাপের সঙ্গে সঙ্গে আসে, পূজার আয়োজন করিয়া দেয়, বৃদ্ধ বাপকে খুব সাহায্য করে। মেয়েটি বলিল-চার পয়সা দক্ষিণে কেন খোকা? এতে তো হবে না, বারের পুজোতে দু'আনা দক্ষিণে লাগবে—।

অপু বলিল-আমার মা যে চার পয়সা দিয়েচে মোটে, আর তো আমার কাছে নেই?

মেয়েটি খানকতক কলা মূলা বাছিয়া একখানা পাতায় মুড়িয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলঠাকুরের প্রসাদ এতে রৈল, বেলপাতা আর সিঁদুরও দিলাম, তোমাদের বাড়ির মেয়েদের দিয়ে। অপু ভাবিলে—বেশ লোক এরা, আমার যদি পয়সা থাকতো আরও দু'পয়সা দিতাম—-

পিসিমার বাড়ি ফিরিয়া সে বাহিরের রোয়াকে জ্যোৎস্নার আলোতে বসিয়া পিসিমার সঙ্গে পূজার গল্প করিতেছে, পাশের গুলকীদের ঝড়িতে হঠাৎ গুলকীর সবু গলার আকাশ-ফাটানো চিৎকার শোনা গেল-ওরে জেঠি, অমন করে মেরো না-ওরে বাবারে-ও জেঠি, মোর পিঠ কেটে অক্ত পড়চে-মেরো না জেঠি–

সঙ্গে সঙ্গে একটা কর্কশ গলার চিৎকার শোনা গেল-হারামজাদী-বদমায়েশ-চৌধুরীদের বাড়ি গিয়েচো নেমতান্ন খেতে এমনি তোমার নোলা? তোমার নোলায় যদি আজ হাতা পুড়িয়ে হেঁকা না দিইঃ-লোকের বাড়ি খেয়ে খেয়ে বেড়াবে আর শতেকক্ষোয়ারীরা চোখের মাথা খেয়ে দেখতে পায় না, বলে কি না খেতে দেয় না-আপদ বালাই কোথাকার-বাড়িতে তোমায় খেতে দেয় না?...তোমায় আজ–

অপুর পিসিমা বলিল-দেখচো, ঠেস দিয়ে দিয়ে কথা শুনিয়ে শুনিয়ে বলচে? সত্যি কথা বল্লেই লোকের সঙ্গে আর ভাব থাকে না-তা হলেই তুমি খারাপ—।

অপুর মনটা আকুলি-বিকুলি করিতেছিল। চোখের জলে গলা আড়ষ্ট হওয়ার দরুন কোনো কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না।

পরদিন সন্ধ্যার কিছু আগে আহারাদি সারিয়া অপু গোয়ালাপাড়ার দিকে চলিল। আগেব দিন তাহার পিসেমশায় ঠিক করিয়া দিয়াছে। এ গ্রাম হইতে নবাবগঞ্জে তামাক বোঝাই গাড়ি যাইবে, সেই গাড়িতে উঠিয়া সন্ধ্যার সময় রওনা হইলে সকালের দিকে নিশ্চিন্দিপুরের পথে তাহাকে উহারা নামাইয়া দিবে।

অল্পদূরে গিয়া বামুনপাড়ার পথের মোড়ে গুলকীর সঙ্গে দেখা। সে সন্ধ্যায় খেলা করিয়া বাড়ি ফিরিতেছে। অপু বলিল-বাড়ি চলে যাচ্ছি রে খুকি। আজ-সারাদিন ছিলি কোথায়? খেলতে এলিনে কিছু না-। পরে গুলকী অবিশ্বাসের হাসি হাসিতেছে দেখিয়া বলিল-সত্যি রে, সত্যি বলচি, এই দ্যাখ পুটলি, কার্তিক গোয়ালার বাড়ি গিয়ে গাড়ি উঠবো-আয় না। আমার সঙ্গে একটু এগিয়ে দিবি?

গুলকী পিছনে পিছনে অনেকদূর চলিল। বামুনপাড়া ছাড়িয়া খানিকটা ফাকা মাঠ। তাহার পরেই গোয়ালাপাড়া। গুলকী মাঠের ধার পর্যন্ত আসিল। অপুর রাঙা সাটিনের জামটার দিকে আঙুল দেখাইয়া কহিল-তোমার এই আঙা জামাটা ক’পয়সা?

অপু হাসিমুখে বলিল-দুটাকা-তুই নিবি?

গুলকী ফিক্ করিয়া হাসিল। অর্থাৎ তুমি যদি দাও, এখখনি..

হঠাৎ সামনের পথে চোখ ফিরাইতেই অপু দেখিতে পাইল, মাঠের শেষে গাছপালার ফাকে আলো হইয়া উঠিয়াছে।–অমনি কেমন করিয়া তাহার মনে হইল আগামী মাসের এমন দিনটাতে তাহারা কোথায় কতদূরে চলিয়া যাইবে। পরে গুলকীকে বলিল-আর আসিস নে খুকি, তুই চলে যা-অনেকদূরে এসে গিাইচিস-তোর বাড়িতে হয়তো আবার বকবে-চলে যা খুকি।-আবার এলে দেখা হবে, কেমন তো? হয়তো আর আসবো না, আমরা কাশী চলে যাবো বোশেখ মাসে, সেখানে বাস করবো-গুলকী আর একবার ফিক করিয়া হাসিল।

সেদিন পূর্ণিমা কি চতুর্দশী এমনি একটা তিথি। সে এদিকে আর কখনও আসে নাই, কিন্তু বাল্যের এই এক প্রথম বিদেশ-গমন সম্পর্কিত একটা ছবি অনেক দিন পর্যন্ত তাহার মনে ছিল– সোজা মাঠের পথে দূর-প্রান্তে গাছপালার ফাঁকে পূর্ণচন্দ্র উঠিতেছে (বা চতুর্দশীর চন্দ্র, তাহার ঠিক মনে ছিল না।) পিছনে পিছনে অল্পদিনের পরিচিতা, অনাথা, অবোধ কাঁকড়াচুল ছোট একটি মেয়ে তাহাকে আগাইয়া দিতে আসিয়াছে।

# ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বৈশাখ মাসের প্রথমে হরিহর নিশ্চিন্দিপুর হইতে বাস উঠাইবার সব ঠিক করিয়া ফেলিল। যে জিনিসপত্র সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া চলিবে না, সেগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া নানা খুচরা দেনা শোধ দিয়া দিল। সেকালের কাঁঠালকাঠের বড় তক্তপোশ, সিন্দুক, পিঁড়ি ঘরে অনেকগুলি ছিল, খবর পাইয়া ওপাড়া হইতে পর্যন্ত খরিদ্দার আসিয়া সস্তাদরে কিনিয়া লইয়া গেল।

গ্রামের মুবুব্বীরা আসিয়া হরিহরকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিশ্চিন্দিপুরের দুগ্ধ ও মৎস্য যে কত সস্তা বা কত অল্প খরচে এখানে সংসার চলে সে বিষয়ের একটা তুলনামূলক তালিকাও মুখে মুখে দাখিল করিয়া দিলেন। কেবল রাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য স্ত্রীর সাবিত্রীব্রত উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর বলিলেন-বাপু, আছেই বা কি দেশে যে থাকতে বলবো।–তা ছাড়া এক জায়গায় কাদায় গুণ পুতে থাকাও কোনো কাজের নয়, এ আমি নিজেকে দিয়ে বুঝি-মন ছোট হয়ে থাকে, মনের বাড় বন্ধ হয়ে যায়। দেখি এবার তো ইচ্ছে আছে একবার চন্দ্রনাথটা সেরে আসবে। যদি ভগবান দিন দেন

রানী কথাটা শুনিয়া অপুদের বাড়ি আসিল। অপুকে বলিল-হ্যাঁরে অপু, তোরা নাকি এ গাঁ ছেড়ে চলে যাবি? সত্যি?

অপু বলিল-সত্যি রানুদি, জিজ্ঞেস করো মাকে—

তবুও রানী বিশ্বাস করে না। শেষে সর্বজয়ার মুখে সব শুনিয়া রানী অবাক হইয়া গেল। অপুকে বাহিরের উঠানে ডাকিয়া বলিল-কবে যাবি রে?

–সামনের বুধবারের পরের বুধবারে—

–আসবি নে আর কখনও?

রানীর চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, বলিল-তুই যে বলিস নিশ্চিন্দিপুর আমাদেব বড় ভালো গা, এমন নদী, এমন মাঠ কোথাও নেই-সে। গা ছেড়ে তুই যাবি কি করে?

অপু বলিল-আমি কি করবো, আমি তো আব্ব বলিনি। যাবাব কথা? বাবার সেখানে বাস করবার মন, এখানে আমাদেব চলে না যে? আমার লেখা খাতাটা তোমাকে দিয়ে যাবো বানুদি, বড় হলে হয়তো আবাব দেখা হবে–

রানী বলিল-আমার খাতাতে গল্পটাও তো শেষ করে দিলি নে, খাতায় নাম সইও করে দিলি নি, তুই বেশ ছেলে তো অপু?

চোখের জল চাপিয়া রানী দ্রুতপদে বাটীর বাহির হইয়া গেল। অপু বুঝিতে পারে না রানুদি মিছামিছি কেন রাগ করে! সে কি নিজের ইচ্ছাতে দেশ ছাড়িয়া যাইতেছে?

স্নানের ঘাটে পটুর সঙ্গে অপুর কত কথা হইল। পটুও কথাটা জানিত না, অপুর মুখে সব শুনিয়া তাহার মনটা বেজায় দমিয়া গেল। স্নানমুখে বলিল–তোর জন্যে নিজে জলে নেমে কত কষ্টে শ্যাওলা সরিয়ে ফুটু কাটলাম, একদিনও মাছ ধরবিনে তাতে?

এবার রামনবমীর দোল, চড়কপূজা ও গোষ্ঠবিহার অল্পদিন পরে পরে পড়িল। প্রতি বৎসর এই সময় অপূর্ব অসংযত আনন্দে অপুর বুক ভরিয়া তোলে। সে ও তাহার দিদি এ সময় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিত। অপুর দিক হইতে অবশ্য এবারও তাহার কোনো ত্রুটি হইল না।

চড়কের দিন গ্রামের আতুরী বুড়ি মারা গেল। নতুন যে মাঠটাতে আজকাল চড়কের মেলা বসে, তাহারই কাছে আতুরী বুড়ির সেই দো-চালা ঘরখানা। অনেক লোক জড়ো হইয়াছে দেখিয়া সেও সেখানে দেখিতে গেল। সেই যে একবার আতুরী ডাইনির ভয়ে বাঁশবন ভাঙিয়া দৌড় দিয়াছিল-তখন সে ছোট ছিল-এখন তাহার সে কথা মনে হইলে হাসি পায়। আজ তাহার মনে হইল আতুরী বুড়ি ডাইনি নয়, কিছু নয়। গ্রামের একাধারে লোকালয়ের বাহিরে একা থাকিত-গরিব অসহায়, ছেলে ছিল না, মেয়ে ছিল না, কেহ দেখিবার ছিল না, থাকিলে কি আজ সারাদিন ঘরের মধ্যে মরিয়া পড়িয়া থাকিত? সৎকারের লোক হয় না? পাঁচু জেলের ছেলে একটা হ্যাঁড়ি বাইরে আনিয়া ঢালিল-এক-হ্যাঁড়ি শুকনা আমচুর। ঝোড়ো আম কুড়াইয়া বুড়ি আমসি আমচুর তৈয়ারি করিয়া রাখিয়া দিত ও তাঁহা হাটে হাটে বিক্রয় করিয়া দিনপাত করিত। অপু তাহা জানে, কারণ গত রথের মেলাতেও তাঁহাকে ডালা পাতিয়া আমসি বিক্রয় করিতে দেখিয়াছে।

চড়কটা যেন এবার কেমন ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। আর-বছরও চড়কের বাজারে দিদি নতুন পট কিনিয়া কত আনন্দ করিয়াছে। মনে আছে সেদিন সকলে দিদির সহিত তাহার ঝগড়া হইয়াছিল। বৈকালে তাহার দিদি বলিল-পয়সা দেবো অপু, একখানা সীতাহরণের পট দেখিস যদি মেলায় পাস? অপু প্রতিশোধ লইবার জন্য বলিল-যত সব পানসে পুতু পুতু পাট, তাই তোর কিনতে হবে, আমি পারবো না যা-কেন রামরাবণের যুদ্ধ একখানা কেননা? তাহার দিদি বলিল-তোর কেবল যুদ্ধ আর যুদ্ধ-ছেলের যা কাণ্ড! কেন ঠাকুর-দেবতার পট বুঝি ভালো হল না?...দিদির শিল্পানুভূতি-শক্তির উপর অপুর কোনো কালেই শ্রদ্ধা ছিল না।

তাহাদের বেড়ার গায়ে রাংচিতা ফুল লাল হইয়া ফুটিলে, তাহার মুখ মনে পড়ে, পাখির ডাকে, সদ্যাফোটা ওড়কলমির ফুলের দুলুনিতে-দিদির জন্য মন কেমন করে। মনে হয় যাহার কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিলে খুশি হইত, সে কোথায় চলিয়া গিয়াছো-কতদূর!..আর কখনও, কখনও-সে। এসব লইয়া খেলা করিতে আসিবে না।...

মেলার গোলমালের মধ্যে কে চমৎকার বাঁশি বাজাইতেছে। নতুন সুর তাহার বড় ভালো লাগে-খুঁজিয়া বাহির করিল-মালপাড়ার হারান মাল এক বান্ডিল বাঁশের বাঁশি চাচিয়া বিক্রয় করিবার জন্য আনিয়াছে ও বিজ্ঞাপন স্বরূপ একটা বাঁশি নিজে বাজাইতেছে। অপু জিজ্ঞাসা করিল– একটা ক' পয়সা? হারান মাল তাহাকে খুব চেনে। কতবার তাঁহাদের রান্নাঘর ছাইয়া দিয়া গিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল-তোমরা নাকি শোনলাম খোকা গা ছেড়ে চল্লে? তা কোথায় যাচ্চ-হাগা?

অপু দেড় পয়সা দিয়া সবু বাঁশের বাঁশি একটা কিনিল। বলিল–কোন কোন ফুটোতে আঙুল টেপো হারানকাকা? একবার দেখিয়ে দাও দিকি?

মনে আছে একবার অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া সে খানিকক্ষণ জাগিয়া ছিল। দূরে নদীতে অন্ধকার রাত্রে জেলেদের আলোয় মাছধরা দোনা-জালের একঘেয়ে একটানা ঠক ঠক শব্দ হইতেছিল। এমন সময় তাহার কানে গেল অনেক দূরে যেন কুঠির মাঠের পথের দিক অত রাত্রে কে খোলা গলায় গান গাহিয়া পথ চলিয়াছে। কুঠির মাঠের পথে বেশি রাত্রে বড় একটা কেহ হ্যাঁটে না, তবুও আধঘুমে কতদিন যে নিশীথ রাত্রির জ্যোৎস্নায় অচেনা পথিক-কণ্ঠে মধুকানের পদ-ভাঙা গানের তানকে দূর হইতে দূরে মিলাইয়া যাইতে শুনিয়াছো-কিন্তু সেবার যাহা শুনিয়াছিল। তাহা একেবারে নতুন। সুরাটা সে আয়ত্ত করিতে পারে নাই-আধ-জাগরণের ঘোরে সুষমাময়ী সুরলক্ষ্মী দুই ঘুমের মাঝখানের পথ বাহিয়া কোথায় অন্তহিত হইয়াছিলেন, কোনোদিন আর তাঁহার সন্ধান মিলে নাই-কিন্তু অপু কি তাহা কোনোদিন ভুলিবে?

চড়ক দেখিয়া নানা গায়ের চাষীদের ছেলেমেয়েরা রঙিন কাপড় জামা, কেউবা নতুন কোরা শাড়ি পরনে, সারি দিয়া ঘরে ফিরিতেছে। ছেলেরা বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছে। গোষ্ঠবিহারের মেলা দেখিতে চার-পাঁচ ক্রোশ দূর হইতেও লোকজন আসিয়াছিল। শোলার পাখি, কাঠের পুতুল, রঙিন কাগজের পাখা, রং-করা হ্যাঁড়ি, ছোবা-সকলেরই হাতে কোনো না কোনো জিনিস। চিনিবাস বৈষ্ণব মেলার বেগুনি ফুলুরির দোকান খুলিয়াছিল, তাহার দোকান টুইতে অপু দু' পয়সার তেলে-ভাজ খাবার কিনিয়া হাতে লইয়া বাড়ির দিকে চলিল। ফিরিতে ফিরিতে মনে হইল, যেখানে তাহারা উঠিয়া যাইতেছে সেখানে কি এরকম গোষ্ঠবিহার হয়? হয়তো সে আর চড়কের মেলা দেখিতে পাইবে না! মনে ভাবিল-সেখানে যদি চড়ক না হয় তবে বাবাকে বলবো, আমি

মেলা দেখবো বাবা, নিশ্চিন্দিপুর চল যাই-না হয় দুদিন এসে খুড়িমাদের বাড়ি থেকে যাবো?

চড়কের পরদিন জিনিসপত্র বাঁধার্ছদা হইতে লাগিল। কাল দুপুরে আহারাদির পর রওনা হইতে হইবে।

সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের দাওয়ায় তাহার মা তাহাকে গরম গরম পরোটা ভাজিয়া দিতেছিল। নীলমণি জেঠার ভিটায় নারিকেল গাছটার পাতাগুলি জ্যোৎস্নার আলোয় চিকচিক্ করিতেছে-চাহিয়া দেখিয়া অপুর মন দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এতদিন নতুন দেশে যাইবার জন্য তাহার যে উৎসাহটা ছিল, যতই যাওয়ার দিন কাছে আসিয়া পড়িতেছে, ততই আসন্নবিরহের গভীর ব্যথায় তাহার মনের সুরটি করুণ হইয়া বাজিতেছে।

এই তাঁহাদের বাড়ি-ঘর, ওই বাঁশবন, সলতে-খাগীর আমবাগানটা, নদীর ধার, দিদির সঙ্গে চড়ুইভাতি করার ওই জায়গাটা-এ সব সে কত ভালোবাসে! ওই অমন নারিকেল গাছ কি তাহারা যেখানে যাইতেছে সেখানে আছে? জ্ঞান হইয়া পর্যন্ত এই নারিকেল গাছ সে এখানে দেখিতেছে, জ্যোৎস্নাবাত্রে পাতাগুলি কি সুন্দর দেখায়! সুমুখ জ্যোৎস্নারাত্রে এই দাওয়ায় বসিয়া জ্যোৎস্নাঝরা নারিকেল শাখার দিকে চাহিয়া কত বাত্রে দিদির সঙ্গে সে দশ-পাঁচিশ খেলিয়াছে, কতবার মনে হইয়াছে কি সুন্দর দেশ তাহদের এই নিশ্চিন্দিপুর! যেখানে যাইতেছে, সেখানে কি রান্নাঘরের দাওয়াব পাশে বনের ধারে এমন নাবিকেল গাছ আছে? সেখানে কি সে মাছ ধরিতে পাবিবে, আম কুড়াইতে পরিবে, নৌকা বাহিতে পরিবে, রেল বেল খেলিতে পাবিবে, কদমতলার সায়েবের ঘাটের মতো ঘাট কি সে দেশে আছে? রানুদি আছে? সোনাডাঙার মাঠ আছে? এই তো বেশ ছিল তাহারা, কেন এসব মিছামিছি। ছাড়িয়া যাওয়া?

দুপুবে এক কাণ্ড ঘটিল।

তাহার মা সাবিত্রীব্রতের নিমন্ত্রণে গিয়াছে, হরিহর পাশের ঘরে আহারাদি সারিয়া ঘুমাইতেছে, অপু ঘবের মধ্যে তাকেব। উপবিস্থিত জিনিসপত্র কি লওয়া যাইতে পারে না পারে নাড়িযা চড়িযা দেখিতেছে। উঁচু তাকের উপব একটা মাটির কলসী সরাইতে গিয়া তাহার ভিতর হইতে একটা কি জিনিস গড়াইয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল। সে সেটাকে মেজে হইতে কুড়াইয়া নাড়িয়া চড়িয়া দেখিয়া দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল। ধুলা ও মাকড়সার ঝুল মাখা হইলেও জিনিসটা কি বা তাহার ইতিহাস বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না।

সেই ছোট্ট সোনার কৌটাটা আর বছর যেটা সেজ ঠাকরুনদের বাড়ি হইতে চুরি গিয়াছিল।

দুপুরে কেহ বাড়ি নাই, কৌটাটা হাতে লইয়া অনেকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, বৈশাখ দুপুবের তপ্ত রৌদ্রভরা নির্জনতায় বাশবনের শনশনশব্দ অনেক দূরের বার্তার মতো কানে আসে। আপন মনে বলিল-দিদি হতভাগী চুরি করে এনে ওই কলসীটার মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিইছিল!

সে একটুখানি ভাবিল, পরে ধীরে ধীরে খিড়কি-দোরের কাছে গিয়া দাঁড়াইল-বহুদূর পর্যন্ত বাঁশবন যেন দুপুরের রৌদ্রে ঝিমাইতেছে, সেই শঙ্খচিলটা কোন গাছের মাথায় টানিয়া টানিয়া ডাকিতেছে, দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকায়িত প্রাচীন যুগের সেই পরাজিত ভাগ্যহত রাজপুত্রের বেদনাকরুণ মধ্যাহ্নটা! একটুখানি দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে হাতের কোেটাটাকে একটান মারিয়া গভীর বাঁশবনের দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহার দিদি ভুলো কুকুরকে ডাক দিলে যে ঘন বনঝোপের ভিতর দিয়া ভুলো হ্যাঁপাইতে হ্যাঁপাইতে ছুটিয়া আসিত, ঠিক তাঁহারই পাশে রাশীকৃত শুকনা বাঁশ ও পাতার রাশির মধ্যে বৈঁচি-ঝোপের ধারে কোথায় গিয়া সেটা গড়াইয়া পড়িল।

মনে মনে বলিল-রাইল ওইখানে, কেউ জানতে পারবে না কোনো কথা, ওখানে আর কে যাবে?

সোনার কোটার কথা অপু কাহাকেও কিছু জানাইল না, কখনও জানায় নাই, এমনকি মাকেও না।

দুপুর একটু গড়াইয়া গেলে হীরু গাড়োয়ানের গরুর গাড়ি রওনা হইল।সকালের দিকে আকাশে একটু একটু মেঘ ছিল বটে কিন্তু বেলা দশটার পূর্বেই সেটুকু কাটিয়া গিয়া পরিপূর্ণ প্রচুর বৈশাখী মধ্যাহ্নের রৌদ্র গাছেপালায় পথে মাঠে যেন অগ্নিবৃষ্টি করিতেছে। পটু গাড়ির পিছনে পিছনে অনেক দূর পর্যন্ত আসিতেছিল, বলিল-অপুদা, এবার বারোয়ারিতে ভালো যাত্রাদলের বায়না হয়েচে, তুই শুনতে পেলিনে৷ এবার–

অপু বলিল-তুই পালার কাগজ একখানা বেশি করে নিবি, আমায় পাঠিয়ে দিবি—

আবার সেই চটকের মাঠের ধারা দিয়া রাস্তা! মেলার চিহ্নস্বরূপ সারা মাঠটিায় কাটা ডাবের খোলা গড়াগড়ি যাইতেছে, কাহারা মাঠের একপাশে রাঁধিয়া খাইয়াছে, আগুনে কালো মাটির ঢেলা ও একপাশে কালিমাখা নতুন হ্যাঁড়ি পড়িয়া আছে। হরিহর চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, তাহার যেন কেমন কেমন ঠেকিতেছিল। কাজটা কি ভালো হইল? কতদিনের পৈতৃক ভিটা, ওই পাশের পোড়ো ভিটাতে সে সব ধুমধাম একেবারে শেষ

হইয়া গিয়াছিলই তো, যা-ও বা মাটির প্রদীপ টিম টিম করিতেছিল, আজ সন্ধ্যা হইতে চিরদিনের জন্য নিবিয়া গেল। পিতা রামচাদ তর্কবাগীশ স্বর্গ হইতে দেখিয়া কি মনে করবেন?

গ্রামের শেষ বাড়ি হইতেছে আতুরী বুড়ির সেই দোচালা ঘরখানা, যতক্ষণ দেখা গেল অপু হ্যাঁ করিয়া সেদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পরই একটা বড় খেজুর বাগানের পাশ দিয়া গাড়ি গিয়া একেবারে আষাঢ় যাইবার বাঁধা রাস্তার উপর উঠিল। গ্রাম শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বজয়ার মনে হইল যা কিছু দারিদ্র্য, যা কিছু হীনতা, যা কিছু অপমান সব রহিল পিছনে পড়িয়া—এখন সামনে শুধু নতুন সংসার, নতুন জীবনযাত্রা, নব সচ্ছলতা।.

ক্রমে রৌদ্র পড়িল-গাড়ি তখন সোনাডাঙার মাঠের মধ্যে দিযা যাইতেছিল। হরিহর মাঠের মধ্যের একটা বড় বটগাছ দেখাইয়া কহিল-ওই দ্যাখো ঠাকুরঝি পুকুরের ঠ্যাঙাড়ে বটগাছ। সর্বজয়া তাড়াতাড়ি মুখ বাহির করিয়া দেখিল। পথ হইতে অল্প দূরেই একটা নাবাল জমির ধারে বিশাল বটগাছটা চারিধারে ঝুরি গাড়িয়া বসিয়া আছে। সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও তাহার বালকপুত্রের গল্প সে কতবার শুনিয়াছে। আজ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তাহার শ্বশুরের পূর্বপুরুষ এই রকম সন্ধ্যাবেলা ওই বটতলায় নিরীহ ব্রাহ্মণ ও তঁহার অবোধ পুত্রকে অর্থলোভে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া পাশের ওই নাবাল জমি, যেটা সেকালের ঠাকুরবি পুকুর ছিলওইখানে পুতিয়া রাখিয়াছিল। ছেলেটির মা হয়তো পুত্রের বাড়ি ফিরিবার আশায় কত মাস, কত বছর বৃথা অপেক্ষা করিত, সে-ছেলে আর ফিরে নাই—মাগে! সর্বজয়ার চোখ হঠাৎ জলে ঝাপসা হইয়া আসে, গলায় কি একটা আটকাইয়া যায়!

সোনাডাঙার মাঠ। এ অঞ্চলের সকলের বড় মাঠ। এখানে ওখানে বনঝোপ শিমুল বাবুল গাছ, খেজুর গাছে খেজুর কাঁদি ঝুলিতেছে, সৌদালি ফুলের ঝাড় দুলিতেছে, চারিধারে বৌ-কথা-কও পাপিয়ার ডাক। দূরপ্রসারী মাঠের উপর তিসির ফুলের রং-এর মতো গাঢ় নীল আকাশ উপুড় হইয়া পড়িয়ছে, দৃষ্টি কোথাও বাধে না, ঘন সবুজ ঘাসে মোড়া উঁচু নিচু মাঠের মধ্যে কোথাও আবাদ নাই, শুধুই গাছপালা-বনঝোপের প্রাচুর্য আর বিশাল মাঠটাির শ্যামপ্রসার, সম্মুখে কাঁচা মাটির চওড়া পথটা গৃহত্যাগী উদাস বাউলের মতো দূর হইতে দূরে আপন মনে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। একটু দূরে গিয়া ব্যারাসে-মধুখালির বিল পড়িল। কোন প্রাচীন কালের নদী শুকাইয়া গিয়া জীবনের যাত্রাপথের পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, অন্তর্হিত নদীর বিশাল খাতটা এখন পদ্মফুলে ভরা বিল। অপু গাড়িতে বসিয়া মাঠ ও চারিধারের অপূর্ব আকাশের রংটা দেখিতে দেখিতে যাইতেছিল। বেলাশেষের স্বল্পপটে আবার কত কি শৈশব-কল্পনার আসা-যাওয়া! এই তো সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়াছে। এখন হয়তো কোথায় কতদূরে

চলিবে, যাওয়া তার সবে আরম্ভ হইল, এইবার হয়তো সে-সব দেশ, স্বপ্ন-দেখা সে অপূর্ব জীবন।

হরিহর দূরের একটা গ্রাম আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল-ওই হল ধঞ্চে-পলাশগাছি, ওরই ওপাশে নাটাবেড়ে-ওইখানে বনবিবির দরগাতলায় শ্রাবণ মাসে ভরি মেলা হয়, এমন সস্তা কুমড়ো আর কোথাও মেলে না।

আষাঢ় বাজারের নিচে খেয়ায় বেত্রবতী পার হইবার সময় চীদ উঠিল, জ্যোৎস্নার আলোয় জল চিকচিক্ করিতেছিল। আজ আবদুর হাট, কয়েকজন হাটুরে লোক কলরব করিতে করিতে ওপর হইতে খেয়ানৌকায় এপারে আসিতেছে। অপুদের গাড়িসুদ্ধ পার হইয়া ওপারে উঠিল। অপু বাবাকে বলিয়া আষাঢ়ার বাজার দেখিতে নামিল। ছোট বাজার, সারি সারি বাঁপিতোলা দোকান, স্যাকরার দোকানের টুকটাক্ শুনা যাইতেছে, একটা খেজুরগুড়ের আড়তের সামনে বহু গরুর গাড়ির ভিড়। মাঝেরপাড়া স্টেশন এখনও প্রায় চারি ক্রোশ, রাস্তা। কাঁচা হইলেও বেশ চওড়া, দুধারে নীলকুঠির সাহেবদের আমলে রোপিত বট, অশ্বথ, তুতাগাছ। বৈশাখ মাসের প্রথমে পথিপার্থের বট-অশ্বথের ডালের মধ্যে কোথায় কোকিল ডাকিয়া ডাকিয়া সারা হইতেছে, সারা পথটা প্রাচীন বটের সারির কুরি দোলানো। কচি পাতার রাশি জ্যোৎস্না লাগিয়া স্বচ্ছ দেখাইতেছে।

বাংলার বসন্ত চৈত্র বৈশাখের মাঠে, বনে, বাগানে, যেখানে-সেখানে, কোকিলের এলোমেলো ডাকে, নতপল্লব নাগকেশর গাছের অজস্র ফুলের ভারে, বনফুলের গন্ধভরা জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ দক্ষিণহাওয়ায় উল্লামে আনন্দনৃত্য শুরু করিয়াছে, এরূপ অপরূপ বসন্তদৃশ্য অপু জীবনে এই প্রথম দেখিল। এই অল্প বয়সেই তাহার মনে বাংলার মাঠ, নদী, নিরালা বনপ্রান্তরের সুমুখ জ্যোৎস্না রাত্রির যে মায়ারূপ অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার উত্তরকালের শিল্পীজীবনের কল্পনামুহুর্তগুলি মাধুর্যে ও প্রেরণায় ভরিয়া তুলিবার তাহ্যাঁই ছিল শ্রেষ্ঠ উপাদান।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় স্টেশনে আসিয়া গাড়ি পৌঁছিল। আজ অনেকক্ষণ হইতেই কখন গাড়ি স্টেশনে পৌছাইবে সেই আশায় অপু বসিয়া ছিল, গাড়ি থামিতেই নামিয়া সে একদৌড়ে গিয়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে হাজির হইল। সন্ধ্যা সাড়ে আটটার ট্রেন অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিয়াছে সারারাত্রির মধ্যে আর ট্রেন নাই। ওই হীরু গাড়োয়ানের গরু দুইটার জন্যই এরূপ ঘটিল, নতুবা এখনই সে ট্রেন দেখিতে পাইত। প্ল্যাটফর্মে একরাশ তামাকের গাট সাজানো-দুজন রেলের লোক একটা লোহার বাক্স মতো দেখিতে অথচ খুব লম্বা ডাণ্ডাওয়ালা কলে তামাকের গাট চাপাইয়া কি করিতেছে। জ্যোৎস্না পড়িয়া রেলের পাটি চিক্ চিক করিতেছে।

ওদিকে রেল লাইনের ধারে একটা উঁচু খুঁটির গায়ে দুটা লাল আলো, এদিকে আবার ঠিক সেই রকম দুটা লাল আলো। স্টেশনের ঘরে টেবিলের উপরে চৌপায়া তেলের লণ্ঠন জ্বলিতেছে। এক রাশ বঁধানো খাতপত্র। অপু দরজার কাছে গিয়া খানিকটা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, একটা ছোট্ট খড়মের বউলের মতো জিনিস টিপিয়া স্টেশনের বাবু খটখটি শব্দ করিতেছে।

ইস্টিশান! ইস্টিশান! বেশি দেরি নয়, কাল সকালেই সে রেলের গাড়ি শুধু যে দেখিবে তাহা নয়, চড়িবেও!...

প্ল্যাটফর্ম হইতে নড়িতে তাহার মন সরিতেছিল না। কিন্তু তাহার বাবা ডাকিতে আসিল। খড়মের বউলের মতো জিনিসটাই নাকি টেলিগ্রাফের কল, তাহার বাবা বলিল।

অপু ফিরিয়া দেখিল স্টেশনের পুকুর ধারে রাধিয়া খাইবার জোগাড় হইতেছে। আর একখানি গাড়ি পূর্ব হইতেই সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। আরোহীর মধ্যে আঠারো-উনিশ বৎসরের এক বৌ ও একটি যুবক। অপু শুনিল বেঁটি হবিবপুরের বিশ্বাসদের বাড়ির, ভাইয়ের সঙ্গে বাপের বাড়ি। যাইতেছে। তাহার মায়ের সঙ্গে বেঁটির খুব ভাব হইয়া গিয়াছে। তাহার মা খিচুড়ির চালডাল ধুইতেছে, বৌটি আলু ছাড়াইতেছে। রান্না একত্র হইবে।

সকাল সাড়ে সাতটায় ট্রেন আসিল। অপু হ্যাঁ করিয়া অনেকক্ষণ হইতে গাড়ি দেখিবার জন্য প্ল্যাটফর্মের ধারে বুকিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার বাবা বলিল, খোকা, অত বুকে দাঁড়িয়ে থেকে না, সরে এসো এদিকে। একজন খালাসিও লোকজনদের হাঁটাইয়া দিতেছিল।

কত বড় ট্রেনখানা!! কী ভয়ানক শব্দ! সামনের একেই ইঞ্জিন বলে? উঃ, কী কাণ্ড।

হবিবপুরের বৌটি ঘোমটা খুলিয়া কৌতুহলের সহিত প্রবেশমান ট্রেনখানার দিকে চাহিয়া ছিল।

গাড়িতে হৈ হৈ কারিয়া মোট-ঘাট সব উঠানো হইল। কাঠের বেঞ্চি সব মুখোমুখি করিয়া পাতা। গাড়ির মেজেটা যেন সিমেন্টের বলিয়া মনে হইল। ঠিক যেন ঘর একখানা; জানলা দরজা সব হুবহু! এই ভারী গাড়িখানা, যাহা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা যে আবার চলিবে, সে বিশ্বাস অপুর হইতেছিল না। কি জানি হয়তো নাও চলিতে পারে; হয়তো উহারা এখনই বলিতে পারে, ওগো তোমরা সব নামিয়া যাও, আমাদের গাড়ি আজ আর চলিবে না। তারের বেড়ার এদিকে একজন লোক একবোঝা উলুঘাস

মাথায় করিয়া ট্রেনখানা চলিয়া যাওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল, অপুর মনে হইল লোকটা কৃপার পাত্র! আজিকার দিনে যে গাড়ি চড়িল না, সে বঁচিয়া থাকিবে কি কবিয়া? হীরু গাড়োয়ান ফটকের বাহিরে দাঁড়াইয়া গাড়ির দিকে চাহিয়া আছে।

গাড়ি চলিল। অদ্‌ভুত, অপূর্ব-দুলুনি!! দেখিতে দেখিতে মাঝেরপাড়া স্টেশন, লোকজন, তামাকের গোট, হ্যাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া-থাকা হীরু গাড়োয়ান, সকলকে পিছনে ফেলিয়া গাড়ি বাহিরের উলুখড়ের মাঠে আসিয়া পড়িল। গাছপালাগুলো সর্টসট করিয়া দুদিকের জানালার পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া পলাইতেছে-কী বেগ! এরই নাম রেলগাড়ি! উঃ, মাঠখানা যেন ঘুরাইয়া ফেলিতেছে! ঝোপঝাড় গাছপালা, উলুখড়ের চাউনি, ছোটখাটো চাষীদের ঘর সব একাকার করিয়া দিতেছে! গাড়ির তলায় জাতী-পেষার মতো একটা একটানা শব্দ হইতেছে-সামনের দিকে ইঞ্জিনের কী শব্দটা!

মাঝেরপাড়া স্টেশনের ডিসস্ট্যান্ট সিগন্যালখানাও ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছে!...

অনেক দিন আগের সে দিনটা!

সে ও দিদি যেদিন দুজনে বাছুর খুঁজিতে খুঁজতে মাঠ-জলা ভাঙিয়া উধর্বশ্বাসে রেলের রাস্তা দেখিতে ছুটিয়া গিয়াছিল! সেদিন–আর আজ?

ওই যেখানে আকাশের তলে আষাঢ়-দুর্গাপুরের বাঁধা সড়কের গাছের সারি ক্রমশ দূর হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছে, ওরই ওদিকে যেখানে তাঁহাদের গায়ের পথ বাঁকিয়া আসিয়া সোনাডাঙা মাঠের মধ্যে উঠিয়াছে, সেখানে পথের ঠিক সেই মোড়টিতে, গ্রামের প্রান্তের বুড়ো জামতলাটায় তাহার দিদি যেন ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া তাহাদের রেলগাড়ির দিকে চাহিয়া আছে!...

তাহাকে কেহ লইয়া আসে নাই, সবাই ফেলিয়া আসিয়াছে, দিদি মারা গেলেও দুজনের খেলা করার পথেঘাটে, বাশবনে, আমতলায় সে দিদিকে যেন এতদিন কাছে কাছে পাইয়াছে, দিদির অদৃশ্য স্নেহস্পর্শ ছিল নিশ্চিন্দিপুরের ভাঙা কোঠাবাড়ির প্রতি গৃহ-কোণে-আজ কিন্তু সত্য-সত্যই দিদির সহিত চিরকালের ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল।...

তাহার যেন মনে হয় দিদিকে আব্ব কেহ ভালোবাসিত না, মা নয়, কেউ নয়! কেহ তাহাকে ছাড়িয়া আসিয়া দুঃখিত নয়।

হঠাৎ অপুর মন এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরিয়া গেল। তাহা দুঃখ নয়, শোক নয়, বিয়াহ নয়, তাহা কি সে জানে না। কত কি মনে আসিল অল্প এক মুহূর্তের

মধ্যে.আতুরী ডাইনী…নদীর ঘোট..তাহদের কোঠাবাড়িটা..চালতেতলার পথ…রানুদি..কত বৈকাল, কত দুপুর.কতদিনের কত হাসিখেলা. পটু.. দিদির কত না-মেটা সাধ…

দিদি এখনও একদৃষ্টি চাহিয়া আছে—

পরীক্ষণেই তোহর মনের মধ্যের অবাক ভাষা চোখের জলে আত্মপ্রকাশ করিয়া যেন এই কথাই বার বার বলিতে চাহিল-আমি চাইনি দিদি, আমি তোকে ভুলিনি, ইচ্ছে করে ফেলেও আসিনিওরা আমায় নিয়ে যাচ্ছে—

সত্যই সে ভুলে নাই।

উত্তরজীবনে নীলকুন্তলা সাগরমেখলা ধরণীর সঙ্গে তাহার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু যখনই গতির পুলকে তাহার সারা দেহ শিহরিয়া উঠিতে থাকিত, সমুদ্রগামী জাহাজের ডেকা হইতে প্রতিমুহূর্তে নীল আকাশের নব নব মায়ারূপ চোখে পড়িত, হয়তো দ্রাক্ষাকুঞ্জবেষ্টিত কোন নীল

দেখিতে পাওয়া বেলাভূমি এক প্রতিভাশালী সুরভ্রষ্টার প্রতিভার দানের মতো মহামধুর কুহকের সৃষ্টি করিত তাহার ভাবময় মনে-তখনই, এই সব সময়েই, তাহার মনে পড়িত এক ঘনবর্ষার রাতে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দের মধ্যে এক পুরানো কোঠার অন্ধকার ঘরে, রোগশয্যাগ্রস্ত এক পাড়াগাঁয়ের গরিব ঘরের মেয়ের কথা–

–অপু, সেরে উঠলে আমায় একদিন রেলগাড়ি দেখাবি?

মাঝেরপাড়া স্টেশনের ডিসট্যান্ট সিগন্যালখানা দেখিতে দেখিতে কতদূরে অস্পষ্ট হইতে হইতে শেষে মিলাইয়া গেল।

# ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দুপুরের পর রানাঘাট স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইল। অপুর চোখে দু-দুবার কয়লার গুঁড়া পড়া সত্ত্বেও সে গাড়ির জানোলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া সারাদিনটা বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। স্টেশনে স্টেশনে। ওগুলাকে কি বলে? সিগন্যাল? পড়িতেছে উঠিতেছে কেন? গাড়ি যেখানে লাগিতেছে সেখানটা উঁচুমতো ইটের গাথা, ঠিক যেন রোয়াকের মতো। তাকে প্ল্যাটফর্ম বলে? কাঠের গায়ে বড় বড় অক্ষরে ইংরাজি ও বাংলাতে সব স্টেশনের নাম লেখা আছে-কুড়ুলগাছি, গোবিন্দপুর, বানপুর। গাড়ি ছাড়িবার সময় ঘণ্টা পড়ে-ঢং ঢেং ঢেং ঢেং-চার ঘা-অপু গুনিয়াছে, একটা বড় লোহার চাকার চারিধারে হাতলপরানো, তাহাই ঘুরাইলে সিগন্যাল পড়ে-কুড়ুলগাছি স্টেশনে অপু লক্ষ করিয়া দেখিল।

সর্বজয়া এবার লইয়া মোটে দুইবার রেলে চড়িল। আর একবার সেই কোন কালে–উনি তখন নতুন কাশী হইতে আসিয়া দেশে সংসার পাতিয়াছেন-জ্যৈষ্ঠমাসে আড়ংঘটায় যুগলকিশোর ঠাকুর দেখিতে গিয়াছিল-সে কি আজকার কথা। সে খুশির সহিত স্টেশনে স্টেশনে মুখ লোকজনের ওঠা-নাম লক্ষ করিতেছিল—বউঝিরা উঠিতেছে নামিতেছে-কেমন সব চেহারা, কেমন কাপড়-চোপড়, গহনাপত্র। জগন্নাথপুর স্টেশনে ভালো মুড়ির মোয়া ফিরি করিতেছে দেখিয়া সে ছেলেকে বলিল-অপু, মুড়ির মোয়া খাবি? তুই তো ভালোবাসিস, নেবো তোর জন্যে? টেলিগ্রাফের তারের ওপরকি পাখি বসিয়া দোল খাইতেছে, অপু ভালো করিয়া চাহিয়া চাহিয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল-দ্যাখো মা, কাদের বাড়ির খাঁচা থেকে একটা ময়নাপাখি পালিয়ে এসেচে।

নৈহাটি স্টেশনে গাড়ি বদলাইয়া গঙ্গার প্রকাণ্ড পুলটার উপর দিয়া যাইবার সময়সূর্য অস্ত যাইতেছিল, সর্বজয়া একপৃষ্টে চাহিয়া ছিল-ওপার হইতে হু হু বাতাস বহিতেছে, গঙ্গার জলে নৌকা, দুপারে কত ভালো ভালো বাড়ি বাগান, এ সব দৃশ্য জীবনে সে কখনও দেখে নাই। ছেলেকে দেখাইয়া বলিল-দেখেচিস অপু, একখানা ধোঁয়ার জাহাজ? পরে সে যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া আপন মনে বলিল-মা গঙ্গা, তোমার ওপর দিয়ে যাচ্চি, অপরাধ নিয়ো না মা, কাশীতে গিয়ে ফুলবিথিপত্রে তোমায় পুজো করবো, অপুকে ভালো রেখো, যে জন্যে যাওয়া তা যেন হয়, সেখানে যেন আশ্রয় হয় মা–

আনন্দে পুলকে, অনিশ্চিততার রহস্যে তার হৃদয় দুলিতেছিল-এরকম মনোভাব এর আগে সে কখনও অনুভব করে নাই। সুবিধায় হৌক, অসুবিধায় হৌক, অবাধ মুক্ত জীবনের আনন্দ সে পাইল এই প্রথম, তার চিরকালের বাঁশবনের বেড়া ঘেরা ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ পল্লীজীবনে এরকম সচল দৃশ্যরাজি, এরকম অভিনব গতির বেগ, এত

অনিশ্চয়ের পুলকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় কখনও হয় নাই—যে জীবন চারিধারে পাঁচিল দেওয়াল তুলিয়া আপনাকে আপনি ছোট করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা আজ চলিয়াছে, চলিয়াছে, সম্মুখে চলিয়াছে-ওই পশ্চিম আকাশের অস্তমান সূর্যকে লক্ষ করিয়ানদ-নদী, দেশবিদেশ-ডিঙাইয়া ছুটিয়াছে-এই চলিয়া চলার বাস্তবতাকে সে প্রতি হৃদয় দিয়া অনুভব করিতেছিল আজ।-এই তো সেদিন এক বৎসর আগেও নিশ্চিন্দিপুবের বাড়িতে কত রাত্রে শুইয়া যখনই সে ভাবিত, সুবিধা হইলে একবার চাকদা কি কালীগঞ্জে গঙ্গাস্নানে যাইবে, তখনই তাহা সম্ভবের ও নিশ্চয়তার বহু বাহিরের জিনিস বলিয়া মনে হইয়াছে।–আর আজ?

ব্যান্ডেল স্টেশনে গাড়ি আসিবার একটু আগে সম্মুখের বড় লাইন দিয়া একখানা বড় গাড়ি হু হু শব্দে ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। অপু বিস্ময়ের সঙ্গে সেদিকে চাহিয়া রহিল। কি আওয়াজ!–উঃ! ব্যান্ডেল স্টেশনে পৌঁছিয়া তাহারা গাড়ি হইতে নামিল। এদিকে-ওদিকে এঞ্জিন দৌড়িতেছে, বড় বড় মালগাড়িগুলা স্টেশন কাঁপাইয়া প্রতি পাঁচমিনিট অন্তর না থামিয়া চলিয়া যাইতেছে। হৈ হৈ শব্দ-এদিকে এঞ্জিনের সিটির কানে-তাল-ধরা আওয়াজ, ওদিকে আর একখানা যাত্রীগাড়ি ছাড়িয়া যাইতেছে, গার্ড সবুজ নিশান দুলাইতেছে-সন্ধ্যার সময় স্টেশনের পূর্বে পশ্চিমে লাইনের ওপব এত সিগন্যাল ঝাঁকে ঝাঁকে-লাল সবুজ আলো জ্বলিতেছে-রেল, এঞ্জিন, গাড়ি, লোকজন!–

একটু রাত্রি হইলে তাঁহাদের কাশী যাইবার গাড়ি আসিয়া বিকট শব্দে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইল। বিশাল স্টেশন, বেজায় লোকের ভিড়-সর্বজয়া কেমন দিশেহারা হইয়া গেল।–তাড়া খাইয়া অনভ্যস্ত আড়ষ্ট পায়ে পায়ে স্বামীর পিছনে এখাখানা কামরার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইতেই হরিহর অতিকষ্টে দুর্জয় ভিড় ঠেলিয়া বেপথুমান স্ত্রীকে ও দিশেহারা পুত্রকে কায়ক্লেশে গাড়ির বেঞ্চিতে বসাইয়া দিয়া কুলির সাহায্যে মোট–গাঁট উঠাইয়া দিল।

ভোরের দিকে সর্বজয়ার তন্দ্রা গেল ছুটিয়া। ট্রেন ঝড়ের বেগে ছুটিয়াছে-মাঠ, মাটি, গাছপালা একাকার করিয়া ছুটিয়াছে।–রাত্রের গাড়ি বলিয়া, তাহারা সকলে এক গাড়িতেই উঠিয়াছে-হরিহর তাহাকে মেয়ে-কামরায় দেয় নাই। গাড়িতে ভিড় আগের চেয়ে কম-এক এক বেঞ্চে এক একজন লম্বা হইয়া শুইয়া ঘুমাইতেছে। উপরের বেঞ্চে একজন কাবুলী নাক ডাকাইতেছে। অপু কখন উঠিয়া হ্যাঁ করিয়া জানোলা দিয়া মুখ বাহির করিয়া একদৃষ্টি চাহিয়া আছে।

হরিহর জাগিয়া উঠিয়া ছেলেকে বলিল-ওরকম করে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে না। খোকা, এখখুনি চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়বে।–

কয়লার গুঁড়া তো নিরীহ জিনিস, চোখ দুটা যদি উপড়াইয়া চলিয়াও যায়। তবুও অপুর সাধ্য নাই যে, জানালার দিক হইতে এখন সে চোখ ফিরাইয়া লইতে পাবে। সে প্রায় সারারাত্রি ঠায় এইভাবে বসিয়া। বাবা মা তো ঘুমাইতেছিল-সে যে কত কি দেখিয়াছে। কত স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ায় নাই, আলো লোকজন সুদ্ধ স্টেশনটা বুশ করিয়া হাউইবাজির মতো পাশ কাটাইয়া উড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল-রাত্রে কখনতাহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া যাইতেই সে মুখ বাহির করিয়া দেখিল যে, গভীর রাত্রির জ্যোৎস্নায় রেলগাড়িখানা ঝড়ের বেগে একটা কোন নদীর ছোট সাঁকো পার হইতেছে-সামনে খুব উঁচু একটা কালোমতো টিবি, টিবিটার ওপরে অনেক গাছপালা, নদীর জলে জ্যোৎস্না পড়িয়া চিক চিক করিয়া উঠিল, আকাশে সাদা সাদা মেঘ- তারপর সেই ধরনের বড় বড় আরও কয়েকটা টিবি, আরও সেই রকম গাছপালা। তাহার পর একটা বড় স্টেশন, লোকজন, আলো-পাশের লাইনে একখানা গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল–একজন পানওয়ালার সঙ্গে একটা লোকের যা ঝগড়া হইয়া গেল।-স্টেশনে একটা বড় ঘড়ি ছিল-সে তাহার মাস্টার মশায় নীরেনবাবুর কাছে গাড়ি দেখিতে শিখিয়াছিল, গুনিয়া গুনিয়া দেখিল রাত্রি তিনটা বাজিয়া বাইশ মিনিট হইয়াছে। তারপর আবার গাড়ি ছাড়িল-আবার কত গাছ, আবার সেই ধরনের উঁচু উঁচু টিবি-অনেক সময়ে রেলের রাস্তার দুধারেই সেইরকম টিবি-গাড়িতে সবাই ঘুমাইতেছে, ইহারা যদি কিছু দেখিবে না। তবে রেলগাড়ি চড়িয়াছে যে কোন! কাহাকে সে জিজ্ঞাসা করে যে অত টিবি কিসের? এক-একবার সে জানোলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বুকিয়া মাটির দিকে চাহিয়া নিবৃপণ করিবার চেষ্টা কবিতেছিল গাড়িখানা কত জোরে যাইতেছে- চুল বাতাসে উড়িয়া মুখে পড়ে, মাটি দেখা যায় না, যেন কে মাটির গায়ে কতকগুলি সরল রেখা টানিযা চলিয়াছে- উঃ! রেলগাড়ি কি জোরে যায়!—কৌতুহলে, উত্তেজনায় সে একবার এদিকের জানালায়, একবার ওদিকের জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিতেছিল।

মাঝে মাঝে পূর্বদিকের দ্রুতবিলীয়মান অস্পষ্ট জ্যোৎস্নাভিরা মাঠের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার মনে হইতেছিল, কত দূরে তাহারা আসিয়াছে! এসব কোন দেশের উঁচু নিচু মাঠ দিয়া তাহারা চলিয়াছে?

সকালের দিকে সে আবার একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, একটা প্রকাণ্ড স্টেশনে সশব্দে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইতেই তাহার। তন্দ্রা দুটিয়া গেল-প্ল্যাটফর্মের পাথরের ফলকে নাম লেখা আছে– পাটনা সিটি।

তাহার পর কত স্টেশন চলিয়া গেল। কি বড় বড় পুল! গাড়ি চলিয়াছে, চলিয়াছে, মনে হয় বুঝি পুলটা শেষ হইবে না-কত ধরনের সিগন্যাল, কত কল-কারখানা, একটা কোন স্টেশনের ঘরের মধ্যে একটা লোহার থামের গায়ে চোঙ্‌লাগানো মতো।–তাহারই

মধ্যে মুখ দিয়া একজন রেলের বাবু কি কথা কহিতেছে-প্রাইভেট নম্বর?...হ্যাঁ আচ্ছা-সিক্সটি নাইন-সিক্সটি নাইনহ্যাঁ?...ঊনসত্তর... ছয়ের পিঠে নয়-হ্যাঁ-হ্যাঁ–

সে অবাক হইয়া বাবাকে জিজ্ঞাসা করিল-ও কি কল বাবা? ওর মধ্যে মুখ দিয়ে ওরকম বলচে কেন?

তখন বেলা খুব পড়িয়া গিয়াছে, এমন সময় হরিহর বলিল-এইবার আমরা কাশী পৌঁছে যাবো, বাঁ দিকে চেয়ে থেকে, গঙ্গার পুলের উপর গাড়ি উঠলেই কাশী দেখা যাবে–

অপু একটা কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতেছিল। আজ সে সারা পথ টেলিগিরাপের তার ও খুঁটি দেখিতে দেখিতে আসিতেছে–সেই একটিবার ছাড়া এমন করিয়া এর আগে কখনও দেখে নাই জীবনে। এইবার যদি সে রোল-রেল খেলার সুযোগ পায়, তখনই সে ওই ধরনের তারে খুঁটি বসাইবে। কি ভুলটাই করিত আগে! যেখানে যাইতেছে, সেখানকার বনে গুলঞ্চলতা পাওয়া যায় তো?

দিন পনেরো কাটিয়া গিয়াছে। বাঁশফট্‌কা গলির একখানা মাঝারি গোছের তেতলা বাড়ির একতলায় হরিহর বাসা লইয়া আছে। কোনো পূর্বপরিচিত লোকের সন্ধান সে মিলাইতে পারে নাই। আগে যাহারা যেসব জায়গায় ছিল, এখন সেসব স্থানে তাহদের সন্ধান কেহ দিতে পারে না। কেবল বিশ্বেশ্বরের গলির পুরাতন হালুইকর রামগোপাল সাহু এখনও বাঁচিয়া আছে।

বাড়ির ওপরের তলায় একজন পাঞ্জাবী সপরিবারে থাকে, মাঝের তলায় এক বাঙালি ব্যবসায়ী থাকে, বাইরের ঘরটা তার দোকান ও গুদাম-আশেপাশের দু'তিন ঘরে তার রন্ধন ও শয়নঘর।

এ পাঁচ ছয় দিনে সর্বজয়া নিকটবর্তী সকল জায়গা স্বামীর সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়াছে। স্বপ্নেও কখনও সে এমন দৃশ্যের কল্পনা করে নাই,–এমন মন্দির! এমন ঠাকুর-দেবতা! এত ঘরবাড়ি! আড়ংঘাটার যুগলকিশোরের মন্দির এতদিন তাহার কাছে স্থাপত্য-শিল্পের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন জানা ছিল–কিন্তু বিশ্বনাথের মন্দির?-অন্নপূর্ণার মন্দির? দশাশ্বমেধ ঘাটের ওপরকার লালপাথরের মন্দিরগুলা?

মধ্যে একদিন সে পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটির স্ত্রীর সঙ্গে রাত্রে বিশ্বনাথের আরতি দেখিতে গিয়াছিল-সে যে কি ব্যাপার তাহা সে মুখে বলিতে পারে না। ধূপ-ধুনার ধোঁয়ায় মন্দির অন্ধকার হইয়া গেল-সাত-আটজন পূজারী একসঙ্গে মন্ত্র পড়িতে লাগিল—কি ভিড়,

কি জাঁকজমক, কত বড় ঘরের মেয়েরা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাদের বেশভুষারই বা কি বাহার! কোথাকার একজন রানী আসিয়াছিলেন–সঙ্গে চার-পাঁচজন চাকরানী। দামি বারাণসী শাড়ি পরনে, সোনার কল্কাবসানো আঁচলটা আরতির পঞ্চপ্রদীপের আলোয় আগুনের মতো জ্বলিতেছিল–কি টানা ডাগর চোখ-কি ভুবু কি মুখশ্রী-সত্যিকার রানী সে কখনও দেখে নাই-গল্পেই শুনিয়াছে-হ্যাঁ, রানীর মতো রূপ বটে! তাহাকে বেশিক্ষণ ধরিয়া দেখিয়াছে, কি ঠাকুরের আরতি বেশিক্ষণ দেখিয়াছে, তাহা সে জানে না।

ঠাকুর-দেবতার মন্দির ছাড়া এক-একখানা বসতবাড়িই বা কি!..দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণে নিশ্চিন্দিপুরের গাঙ্গুলি-বাড়ি গিয়া সে গাঙ্গুলিদের নাটমন্দির, দো-মহলা বাড়ি, বাঁধানো পুকুরঘাট দেখিয়া মনে মনে কত ঈর্ষান্বিত হইত—মনে আছে একবার দুর্গাকে বলিয়াছিল–দেখেচিস বড়লোকের বাড়িঘরের কি লক্ষমছিরি?—এখন সে যেসব বাড়ি রাস্তার দুধারে দেখিতেছে—তাহার কাছে গাঙ্গুলি-বাড়ি–

এত গাড়িঘোড়া একসঙ্গে যাইতে কখনও সে দেখে নাই। গাড়িই বা কত ধরনের! আসিবার দিন রানাঘাটে, নৈহাটিতে সে ঘোড়ার গাড়ি দেখিয়াছে বটে, কিন্তু এত ধরনের গাড়ি সে আগে কখনও দেখে নাই। দু-চাকার গাড়িই যে কত যায়!..তাহার তো ইচ্ছা করে পথের ধারে দাঁড়াইয়া দুদণ্ড এইসব দ্যাখে-কিন্তু পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকটি সঙ্গে থাকে বলিয়া লজ্জায় পারে না।

অপু তো একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছে। এরকম কাণ্ডকারখানা সে কখনওকল্পনায় আনিতে পারে নাই। তাদের বাসা হইতে দশাশ্বমেধ ঘাট বেশি দূর নয়, রোজ বিকালে সে সেখানে বেড়াইতে যায়। রোজই যেন চড়কের মেলা লাগিয়াই আছে। এখানে গান হইতেছে, ওখানে কথা হইতেছে, ওদিকে কে একজন রামায়ণ পড়িতেছে, লোকজনের ভিড়, হাসিমুখ, উৎসব, অপু সেখানে শুধু ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া দেখে আর সন্ধ্যার পর বাড়ি আসিয়া মহাউৎসাহে গল্প করে।

কাহাদের চাকর একটি ছোট ছেলেকে কোমরে দড়ি বাঁধিয়া রোজ বেড়াইতে আনে, অপু ভাব করিয়াছে—তার নাম পল্টু, ভালো কথা কহিতে জানে না, ভারি চঞ্চল, তাই পাছে হারাইয়া যায় বলিয়া বাড়ির লোকেদের এই জেল-কয়েদির মতো ব্যবস্থা। অপু হাসিয়া খুন। চাকরকে অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু সে ভয়ে দড়ি খুলিতে চাহে না। বন্দী নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অবোধ-এ ধরনের ব্যবহার যে প্রতিবাদযোগ্য, সে জ্ঞানই তাহার নাই আসিলে সর্বজয়া রোজ তাহাকে বকে-একলা একলা ওরকম যাস কেন? শহরবাজার জায়গা, যদি রাস্তা হারিয়ে ফেলিস?... মায়ের আশঙ্কা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, একথা সে মাকে হাত নাড়িয়া দুবেলা অধ্যবসায়-সহকারে বুঝায়।

কাশীতে আসিয়া হরিহরের আয়ও বাড়িল। কয়েক স্থানে হাঁটাহাঁটি করিয়া সে কয়েকটি মন্দিরে নিত্য পুরাণ-পাঠের কার্য জোগাড় করিল। তাহা ছাড়া একদিন সর্বজয়া স্বামীকে বলিল-দশাশ্বমেধ ঘাটে রোজ বিকেলে পুঁথি নিয়ে বোসো না কেন? কত ফিকিরে লোক পয়সা আনে, তোমার কেবল বসে বসে পরামর্শ আঁটা–

স্ত্রীর তাড়া খাইয়া হরিহর কাশীখণ্ডের পুথি লইয়া বৈকালে দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে। পুরাণ পাঠ করা তাহার কিছু নতুন ব্যবসায় নহে, দেশে শিষ্য বাড়ি গিয়া কত ব্রতপার্বণ উপলক্ষে সে এ কাজ করিয়াছে। পুঁথি খুলিয়া সুস্বরে সে বন্দনা গান শুরু করে–

বর্হপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং।
…মিতসুভগামুখং স্বাধরে ন্যস্ত রেণুং
…ব্রহ্মগোপালবেশিং।

ভিড় মন্দ হয় না।

বাসায় ফিরিয়া বালির কাগজে কি লেখে। স্ত্রীকে বলে, শুধু শ্লোক পড়ে গেলে কেউ শুনতে চায় না-ওই বাঙালি কথকটার ওখানে আমার চেয়ে বেশি ভিড় হয়-ভেবেচি গোটাকতক পালা লিখবো, গান থাকবে, কথকতার মতোও থাকবে নৈলে লোক জমে না-বাঙালটার সঙ্গে পরশু, আলাপ হল, দেবনাগরীর অক্ষর-পরিচয় নেই, শুধু ছড়া কেটে মেয়ে ভুলিয়ে পয়সা নেয়…আমার রেকবি কুড়িয়ে ছ'আনা, আট আনা, আর ওর একটা টাকার কম নয়…শুনবে একটু কেমন লিখচি?

খানিকটা সে পড়িয়া শোনায়। বলে-ওই কথকের পুঁথি দেখে বনের বর্ণনাটা লিখে নেবো ভেবেচি—তা কি দেবে?

–তুমি কোনখানটায় বসে কথা বলে বল তো? একদিন শুনতে যেতে হবে–

–যেয়ো না, ষষ্ঠীর মন্দিরের নিচেই বসি-কালই যেয়ো, নূতন পালাটা বলবো, কাল একাদশী আছে দিনটা ভালো–

-আসবার সময় বিশ্বেশ্বরের গলির দোকান থেকে চার পয়সার পানফলের জিলিপি এনো দিকি অপুর জন্যে-সেদিন ওপরের খোট্টা বউ কি পুজো করে আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে জল খেতে দিলে, বল্লে, পানফলের জিলিপি, বিশ্বেশ্বরের গলিতে পাওয়া যায়, খেতে গিয়ে ভাবলাম অপু জিলিপি খেতে বড় ভালোবাসে-তা জল খেতে দিয়েচে আমি আর কি বলে নিয়ে আসি-এনো দিকি আজ চার পয়সার।

কয়েকদিন ধরিয়া হরিহরের কথকতা শুনিতে বেশ ভিড় হইতেছে। একখানা বড় বারকোশে করিয়া নারদঘাটের কালীবাড়ির ঝি বড় একটা সিধা আনিয়া অপুদের দাওয়ায় নামাইল। সর্বজয়া হাসিমুখে বলিল-আজ বুঝি বারের পুজো? উনি বাড়ি আসচেন দেখলে, হ্যাঁয়া ঝি? চলিয়া গেলে ছেলেকে ডাকিয়া বলিল-এদিকে আয় অপু-এই দ্যাখ! তোর সেই নারকেলের ফোঁপল-তুই ভালোবাসিস? কিশমিশ, কলা, কত বড় বড় আমি দেখেছিস, আয় খাবি, দিই-বোস এখানে

উৎসাহ পাইয়া হরিহর পুরাতন খাতাপত্রের তাড়া আবার বাহির করে। সর্বজয়া বলেধ্রুবচরিত্র শুনতে শুনতে লোকের কান যে ঝালাপালা হল, নতুন একটা কিছু ধরো না?

সারা সকাল ও দুপুর বসিয়া হরিহর একমনে জড়ভরতের উপাখ্যানকে কথকতার পালার আকারে লিখিয়া শেষ করে। মনে পড়ে এই কাশীতেই বসিয়া আজ বাইশ বৎসর পূর্বে যখন সে গীতগোবিন্দের পদ্যানুবাদ করে, তখন তাহার বয়স ছিল চব্বিশ বৎসর। দেশে গিয়া জীবনের উদ্দেশ্য যেন নিজের কাছে আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। কাশীতে এত ছিল না-দেশে ফিরিয়া চারিধারে দাশূরায়ের গান, দেওয়ানজীর গান, গোবিন্দ অধিকারীর শুকসারীর দ্বন্দ্ব, লোকা ধোপার দলের মতি জুড়ির গানের বিস্তৃত প্রচলন ও পাসার তাহার মনে একটা নতুন ধরনের প্রভাব বিস্তার করিল।

রাত্রে স্ত্রীর কাছে গল্প করিত-বাজারের বারোয়ারিতে কবির গান হচ্ছে বুঝলে? বসে বসে শুনলাম, বুঝলে?...সোজা পদ সব.কিছুই না, রও না, সংসারটা একটু গুছিয়ে নিয়ে বসি ভালো হয়ে-নতুন ধরনের পালা বাঁধবো- এরা সকলে গায় সেই মান্ধাতার আমলের পদ-রাজুকে তাই কাল বলছিলাম।

অনেক রাত্রে উঠিয়া এক-একদিন হরিহর বাহিরে দাওয়ায় বসিয়া কি ভাবিত, অনির্দিষ্ট কোন আনন্দে তাহার মন যেন পালকের মতো হালকা হইয়া উঠিত।

কি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাহার সম্মুখে!...

ঝাড়লন্ঠনের আলো-দোলানো বড় আসরে সে দেখিতে পায়, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে তাহার ছড়া, গান, শ্যামাসংগীত, পদ রাত্রির পর রাত্রি ধরিয়া গাওনা হইতেছে। কত দূর-দূরান্তর হইতে মাঠ ঘাট ভাঙিয়া লোক খাবারের পুঁটুলি বাঁধিয়া আনিয়া বসিয়া আছে শুনিতে। দলের অধিকারীরা তাহার বাড়ি আসিয়া সাধিয়া পালা চাহিয়া লইয়া গিয়াছে।

বাঃ! ভারি চমৎকার তো। কার বাঁধা ছড়া?—‘কবির গুরু ঠাকুর হবু-’ হরু ঠাকুরের?– না। নিশ্চিন্দিপুরের হরিহর রায় মহাশয়ের।

এই দশাশ্বমেধ ঘাটেই বসিয়া তো বাইশ বৎসর পূর্বে মনে মনে কত ভাঙাগড়া করিয়াছেতারপর কবে সে সব ধীরে ধীরে ভুলিয়া গেল-কবে ধীরে ধীরে নতুন খাতাপত্রের তাড়া বাক্সের অনাদৃত, গুপ্ত কোণ আশ্রয় করিয়া দিনের আলো হইতে মুখ লুকাইয়া রহিল-যৌবনের স্বপ্নজাল জীবন-মধ্যাহ্নে কুয়াশার মতো দিগন্তে মিলাইয়া গেল।

হারানো যৌবনের দিকে চাহিয়া দেখিলে বুকের মধ্যে কেমন করিয়া ওঠে, কত কথা মনে পড়ে-জীবনের সে সব দিনকে আর একটিবারও ফেরানো যায় না?

দশাশ্বমেধ ঘাটে অনেক ছেলের সঙ্গে অপুর ভাব হইয়াছে। কিন্তু এখানে তাহার বয়সি সব ছেলেই স্কুলে পড়ে, সে-ই কেবল এখনও স্কুলে পড়ে নাই। নিশ্চিন্দিপুরে মাছ ধরিয়া ও নৌকায় বেড়াইয়া দিন কাটানো চুলিত বটে, কিন্তু এখানে সমবয়সিদের কাছে কিছু পড়ে না বলিতে লজ্জা করে।

তাহা ছাড়া দশাশ্বমেধ ঘাটে যেসব ছেলের সঙ্গে তাহার ভাব হইয়াছে, সবাই অবস্থাপন্ন ঘরের চলে। পল্‌টুর দাদা একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিল যে তাহার বাবাকে খুব বিদেশে বেড়াইতে হয়। অপু বলিয়াছিল-কেন, তোমাদের বুঝি খুব শিষ্য-বাড়ি আছে?

পটুর দাদা আশ্চর্য হইয়া বলিল-শিষ্য-বাড়ি? কিসের ভাই?...

অপু সদুত্তর দিবার পূর্বেই সে বলিল-আমার বাবা কন্ট্রাক্টরি করেন কি না? তা ছাড়া কাঁথিতে ছোট জমিদারি আছে- তবে আজকাল কিস্তি দিয়ে কী-ই বা থাকে?

এক-একদিন বৈকালে অপু দশাশ্বমেধ ঘাটে বেড়াইতে গিয়া বাবার মুখে পুরাণপাঠ শোনে। হরিণশিশু শ্বাপদ কর্তৃক নিহত হইলে হরিণ-বালকের স্নেহাসক্ত রাজর্ষি ভারতের করুণ বিরহবেদনা ও পরিশেষে তাহার মৃত্যুর কাহিনী ষষ্ঠী মন্দিরে পৈঠার উপর বসিয়া একমনে শুনিতে শুনিতে তাহার চোখে জল আসে-এদিকে আবার যখন সিন্ধু সৌবীরের রাজা রঘুগণ তাঁহার স্বরূপ না জানিয়া ব্রহ্মার্ষি ভরতকে শিবিকাবাহক নিযুক্ত করেন-তখন হইতে কৌতুহলে ও উৎকণ্ঠায় তাহার বুক দুরু দুরু করে, মনে হয়

এইবার একটা কিছু ঘটিবে; ঠিক ঘটবে। কথকতার শেষে পূরবী সূরের আশীর্বাচনটি তাহারা ভারি ভালো লাগে–

কালে বর্ষতৃ পর্জন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী
লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ...

সন্ধ্যার দিকে মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনির সঙ্গে অস্তসূর্যের রাঙা আভা ও পূরবীর মুর্দ্ধনার সঙ্গে হরিণ-বালকের বিয়োগবেদনাতুর রাজর্ষির ব্যথা যেন মিশাইয়া থাকে।

বাড়িতে কাগজ কলম বাবার কাছে লইয়া গিয়া বলে-আমায় লিখে দাও না বাবা, ওই যে তুমি গাও-কালে বর্ষতু পর্জন্যং?

হরিহর খুশি হইয়া বলে-তুই বুঝি শূনসি খোকা?

-আমি তো রোজই থাকি।–তুমি কাল যখন ভারতের মা মারা যাওয়ার কথা বলছিলে আমি তখন তো তোমার পিছন দিকে বসে-ষষ্ঠীর মন্দিরের ধাপে–

–তোর কি রকম লাগে।–ভালো লাগে?

–খু-উ-উ-ব। আমি তো রোজ রোজ শুনি—

অপু কিন্তু একটা কথা লুকায়। যেদিন তাহার সঙ্গীরা থাকে, সেদিন কিন্তু বাবার দিকে সে যায় না। সেদিন বাবার নিকট দিয়া যাইতেছিল, তাহার বাবা দেখিতে পাইয়া ডাকিল।–খোকা, ও খোকা–

তাহার সঙ্গের বন্ধুটি বলিল-তোমাকে চেনে নাকি?

–অপু শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানায়, হ্যাঁ। সে বাবার কাছে আসে নাই সেদিন। তাহার বাবা ঘাটে কথকতা করিতেছে, একথা বন্ধুরা পাছে টের পায়! সে পল্‌টুর দাদা ছাড়া অন্য বন্ধুদের কাছে গল্প করিয়াছে, কাশীতে তাহদের বাড়ি আছে, তাহারা কাশীতে হাওয়া বদলাইতে আসিয়াছে, দেশে খুব বড় বাড়ি, তাহার বাবা কন্টট্রাক্টরি করেন, তা ছাড়া দেশে জমিদারিও আছে। শেষে বলে-কিন্তু জমিদারি থাকলে কি হবে, কিস্তি দিযে কীইবা থাকে?

তাহার বন্ধুদের বয়স তাহার অপেক্ষা খুব বেশি নয় বলিয়াই বোধ হয় তাহার বর্ণিত গল্পের সঙ্গে তাহার পোশাক-পরিচ্ছদের অসঙ্গতি ধরা পড়ে না, বিশেষত তাহার সুন্দব মুখের গুণে সব মানাইয়া যায়।

পূর্ণিমার দিন কথক ঠাকুরেব ওখানে বেশ ভিড় হইল। সন্ধ্যার পব হরিহর কথা শেষ করিযী। ঘাটের রানায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে, কথক ঠাকুর জলে হাত মুখ ধুইতে নামিল। হরিহরকে দেখিয়া বলিল-এই যে আপনিও আছেন, দেখলেন তো কাণ্ড, পুন্নিমের দিনটা—বলি আজ দিনটা ভালো আছে, বামন-ভিক্ষে লাগাই।–মাসে মাসে এই কাশীতে বামন-ভিক্ষা হলে পরে পনেরো সের আধমণ করে চাল পড়তো-আজকাল মশাই মহা বামন-ভিক্ষেতেও লোকে আর ভেজে না-চালের তো একটা দানাও না-এদিকে সিকে পাঁচেক হবে, তবে মধ্যে আবার দুটো অচল দোয়ানি!.মশায়ের শিক্ষা কোথায়?

–শিক্ষা তো ছিল এ কাশীতেই অনেকদিন আগে। তবে এত দিন দেশেই ছিলাম-এইবার এখানে এসে বাসা করে আছি.

—মশায়ের বাসা কি নিকটে?...একটু চা খাওয়াতে পারেন?...কদিন থেকে ভাবচি একটু চা খাবো।-এই দেখুন না, চাদরের মুড়োয় চা বেঁধে নিয়ে নিয়ে ঘুরি, বলি না হয় কোনো হালুইকরের দোকানে একটু গরম জল করিগে...গলা বসে গিয়েচে, একটু লোন-চা খেলে গলাটা...

-হ্যাঁ হ্যাঁ, আসুন না। এই তো নিকটেই আমার বাসা-চলুন না? কথককে লইয়া হরিহর বাড়ি আসিল।

চা খাওয়ার পাট কোন কালে নাই। কড়ায় জল গরম করিয়া চা তৈরি হইল। অপু’কাঁসার গ্লাসে চা ও রেকাবিতে কিছু খাবার কথকের সামনে লইয়া আসিল। খাবার দেখিয়া কথকঠাকুর ভারি খুশি হইল-খাবারের আশা সে করে নাই।

–এটি ছেলে বুঝি! বাঃ বেশ ছেলে তো আপনার? ভারি সুন্দর দেখতে–বাঃ–এসো এসো বাবা, থাক থাক কল্যাণ হোক-লোন-চা করিয়েছেন তো মশায়?...দেখি–

হরিহর বলিল-আপনার কি ছেলেপিলে সব এখানেই-

–সংসারই নেই তো ছেলেপিলে?...দশ বিঘে জমিও বেরিয়ে গেল অথচ ও মূলেও হাভাত-জমি ক’বিঘে যদি আজ থাকতো-তো আজ কি এই এতদূরে আসি।–আপনিও

যেমন!...এসব কি আর দেশ মশাই?...বিশ্বেশ্বর অবিশ্যি মাথায় থাকুন-এমন শীতকাল যাচ্চে মশাই-না একটু খেজুর রস, না একটু গুড় পাটালি–আমার নিজের মশাই দু'কুড়ি খেজুর গাছ–

–মশাইয়ের দেশটা কোথায়?

–সাতক্ষীরের সন্নিকট-বাদুড়ে-শীতলকাটি জানেন? শীতলকাঠির চক্কত্তিরা খুব ঘবানাহরিহর তামাক সাজিয়া নিজে কয়েক টান দিয়া কথক ঠাকুবের হাতে দিয়া বলিল-খান—

–কিছু না মশায়, ফাগুন মাসের দিকে তো যাই-একটা বাগান আছে, দিয়েআসি বিক্কি করে- আমরা আবার শ্রোত্রিয় কিনা?... তা জমি দশ বিঘে ছিল তাই বন্ধক দিয়ে পণ জোগাড় করলাম–বিয়েও করলাম। –মশাই দশ বছর ঘর করলাম। –হল কি জানেন? সন্ধ্যাবেলা রান্নাঘরের চাল থেকে কুমড়ো কাটতে গিয়েচে-ছিল মশাই সেখানে সাপ আমার জন্যে তৈরি হয়ে-হাতে দিয়েচে কামড়ে–আমি আবার নেই সেদিন বাড়ি–কেইবা বদ্যি কবরেজ দেখিয়েচে, কেই বা করেচে-পাটুলির ঘাট পার হচ্চি–গায়ের মহেশ সাধুখ ওপার থেকে আসচে, আমায় বল্লেশিগগির বাড়ি যান মশায়—আপনার বাড়ি বড় বিপদ-কি বিপদ তা বলে না-বাড়ি পৌঁছে দেখি আগের রাত্রিতেই বৌ তো গিয়েচে মারে!–এই গোল ব্যাপার মশাই...জমিকে জমিও গেল।– এদিকেও–। সেই থেকে বলি যাই, দেশে থেকে আর কী-ই বা হবে।–কোথেকে পাবো তিন-চারশ টাকা যে আবার বিয়ে করবো?...যাই বিশ্বনাথের ওখানে.অন্নকক্টটা তো হবে না...আজ বছর আষ্টেক হয়ে গেল-এক খুড়তুতো ভাই আছো–জমিজমা সামান্য যা একটু আছে, দখল করে বসে আছেবলে তোমার ভাগ নেই।–বেশ বাপু, নেইতো নেই।–গোলমালের মধ্যে কখখনো আমি যাবো না-কবগে যা দখল। উঠি মশাই–আপনাব এখানে বেশ চা খাওয়া গেল-আপনার ছেলেটি কোথায় গেল? বেশ ছেলে, খাসা ছেলে–

পুরানো চামড়ায় তালি দেওয়া ক্যাম্বিসের জুতা জোড়াটা ঝাড়িয়া লইয়া কথকঠাকুর পায়ে দিয়া দবাজার কাছে আসিল-যাইতে যাইতে বলিল-কালও লাগাবো বামনভিক্ষ্যে-দেখি কি হয়—

# একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হরিহরের বাসাটা বিশেষ ভালো নয়। নিচের তলায় স্যাৎসোঁতে ঘর, তাও মাত্র দুখানি, এত অন্ধকার যে হঠাৎ বাহির হইতে আসিলে ঘরের কোনো জিনিস নজরে পড়ে না। এরকম স্থানে সর্বজয়া কখনও বাস করে নাই, তাহাদের দেশের বাড়ি পুরানো হইলেও রৌদ্রহাওয়া খেলিবার বড় বড় দরজা জানোলা ছিল, সেকালের উঁচু ভিতের কোঠা, খটু খটু করিত, শুকনা। এ বাসার স্যাৎসেঁতে মেজে ও অন্ধকারে সর্বজয়ার মাথা ধরে। অপু তো মোটেই ঘরে থাকে না, সূর্যালোকপুষ্ট নবীন তবুর ন্যায়। শুধু আলোর দিকে তার মুখটি থাকে ফিরানো, নিশ্চিন্দিপুরের মুক্ত মাঠে, নদীর আলো হাওয়ায় মানুষ হইয়া এই বদ্ধঘরের অন্ধকারে তার প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে, একদণ্ডও সে সেখানে তিষ্ঠিতে পারে না।

কাশী দেখিয়া সে একটু নিরাশ হইয়াছে। বড় বড় বাড়িঘর থাকিলে কি হইবে, এখানে বন নাই মোটেই।

সন্ধ্যার দিকে একদিন কথকঠাকুর হরিহরের বাসায় আসিল। একথা ওকথার পর বলিল-কই আপনার ছেলেকে দেখচি নে?

হরিহর বলিল–কোথায় বেরিয়েচে খেলা করতে, দশাশ্বমেঘ ঘাটের দিকেই বোধ হয় বেরিয়েচে–

কথকঠাকুর উড়ানির প্রান্তে কি দ্রব্য খুলিতে খুলিতে বলিল-আপনার ছেলের সঙ্গে বড় ভোব হয়ে গিয়েচে মশাই-সেদিন ঘাটে কাছে ডেকে বসিয়ে অনেকক্ষণ ওর সঙ্গে কথা কইলাম-কড়ি খেলতে ভালোবাসে তাই এই দুটো বড় বড় সমুদ্রের কড়ি সেদিন ব্রতের সিধে কারা দিইছিল, ভাবলাম ওকে দিয়ে আসি-রেখে দিন আপনি, ও এলে দেবেন–

অগ্রহায়ণ মাসের শেবে অপু বাবাকে ধরিল সে স্কুলে ভর্তি হইবে। বলিল-সবাই পড়ে ইস্কুলে বাবা, আমিও পড়বো-ওই তো গলির মোড় ছাড়িয়ে একটুখানি গিয়েই ভালো ইস্কুল–

হরিহর ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিল। যদিও ছাত্রবৃত্তিস্কুল তবে ইংরাজি পড়াও হয়। প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালা ছাড়িয়া দেওয়ার পরে-সে। প্রায় চার পাঁচ বছর হইয়া গিয়াছে-এই তাহার পুনরায় অন্য বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া।

মাঘ মাসের মাঝামাঝি কথকঠাকুর এক টুকরা বালির কাগজ হাতে একদিন হরিহরের বাসায় আসিয়া হাজির। কাগজের টুকরা দেখাইয়া বলিল-দেখুন তো মশাই পড়ে, এই রকম যদি লিখি তবে হয়?

হরিহর পড়িয়া দেখিল, কাশীবাসী রামগোপাল চক্রবর্তী নামে কোনো লোক কথকঠাকুরের নামে স্বগ্রামের দশবিঘা জমি দানপত্র লিখিয়া দিতেছে, অমুক অমুক সাক্ষী, স্থান দশাশ্বমেধ ঘাট, অমুক তারিখ। কথকঠাকুর বলিল-ব্যাপারটা কি জানেন! আমাদের দেশে কুমুরে গ্রামের রামগোপাল চকৃত্তি ভারি পণ্ডিত ছিলেন, মরবার বছর খানেক আগে আমাকে বল্লেন-রামধন, তোমার তো কিছু নেই, ভাবচি তোমাকে বিঘে দশেক জমি দান করব।–তুমি নেবে কি? তা ভাবলাম সদব্রাহ্মণ, দিতে চাচ্ছেন, দোষেই বা কি? তারপর তিনি মুখে মুখে জমিটা আমায় দিয়ে দিলেন। দিলেন দিলেন-এতকাল তত গা করিনি, কাশীতেই থাকবো, দেশে ঘরে থাকবো না, কি হবে জমি? তারপর চাকত্তি মশায় গেলেন মারা। জমির দানটা মুখে মুখেই রয়ে গেল। এতকাল পরে ভাবচি দেশে যাবো-ছেলেপিলে না হলে কি আর মানুষ মশাই? আপনাকে বলতে কি, শ'তিনেক টাকা হাতে করেচি-করেচি জলাহার করে.মশাই-আর শ'দুই টাকা পেলে শ্রোত্রিয় ঘরের মেয়ে পাওয়া যায়–তা যদি তাই ঘটে, তবে জমিটা দরকার হবে তো? ভাবলুম মুখে মুখে দান, সে কি আর চাকত্তি মশাই-এর ছেলেরা মানবে? ভেবে চিন্তে এই কাগজখানা বসে বসে লিখিচি-নিজেই লিখিচি মশাই, সাইটই সব-দুজন সাক্ষী, সব বানানো-দেখি লেখা কাগজ যদি মানে। গিয়ে বলবো এই দ্যাখো তোমার বাবা এই জমিটা দান করেচেন–

উঠিবার সময় কথকঠাকুর বলিল-ভালো কথা মশাই, মঙ্গলবারে মাধবী-পূর্ণিমার দিন আপনার ছেলেকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাবো ওই টেওটার রাজার ঠাকুরের বাড়িতে, ঠিক মানমন্দিরের গায়েই একেবারে। সন্ধের পর বছর বছর ব্রাহ্মণভোজন করায় কি না। একটু সগর্বে বলিল-আমায় একখানা করে নেমন্তন্ন পত্তর দ্যায়, বেশ ভালো খাওয়ায়, চমৎকার। আমি এসে নিয়ে যাবো সেদিন কিন্তু।

মাঘী–পূর্ণিমার দিন শেষরাত্রি হইতে পথে স্নানার্থীদের ভিড় দেখিয়া সর্বজয়া অবাক হইয়া গেল। দলে দলে মেয়ে পুরুষে 'জয় বিশ্বনাথজী কি জয়', 'বোলো বোম', 'বোলো বোম' বলিতে বলিতে দুরন্ত মাঘের শীতকে উপেক্ষা করিয়া স্নানের জন্য চলিয়াছে। একটু বেলা হইলে পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকটির সঙ্গে সর্বজয়াও স্নান করিতে গোল–গঙ্গার ঘাটের জল, সিঁড়ি, মন্দির, পথ সব উৎসববেশে সজ্জিত নরনারীতে পূর্ণ। জলে নামা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। ষষ্ঠীর মন্দিরে লাল নিশান উড়িতেছে।

সন্ধ্যার আগে কথকঠাকুর অপুকে লাইতে আসিল। সর্বজয়া বলিল-পাঠিয়ে দাও গিয়ে, কেউ নেই, অপুর ওপর একটা দাম হয়েচে, দশাশ্বমেধ ঘাটে ওকে ডেকে কাছে বসিয়ে গল্প করে, একদিন নাকি পোপে কিনে খাইয়েচে-পাঠিয়ে দাও, লোক ভালো–

অপু প্রথমে কথকঠাকুরের সঙ্গে তাহার বাসায় গেল। খোলার ঘর, মাটির দেওয়ালের নানাস্থানে খড়ি দিয়া হিসাব লেখা। নমুনা–

সিয়ারসোলের রানীর বাড়ি ভাগবত পাঠ ...৪্

মুসম্মত কুন্তার ঠাকুর বাড়ি... ওই ... ... ২্

ধারক লালজী দেবের একদিনের খোরাকি... ৪।০

বিশেষ কিছু আসবাবপত্র নাই। একখানা সবু চৌকি পাতা, একটা ছোট টিনের তোরঙ্গ, একটা দড়ি-টাঙানো আলনা, একজোড়া খড়ম। দেওয়ালের গায়ে পেরেকে একটা বড় পদ্মবীজের মালা টাঙানো।

কথকঠাকুর বলিল-কমললেবুখাবে?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল-আছে আপনার?

কি জানি কেন এই কথকঠাকুরের কাছে তাহার কোনোপ্রকার লজ্জা কি সংকোচ বোধ হইতেছিল না। লেবুর খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে জিজ্ঞাসা করিল-'কালে বর্ষতৃ পর্জন্যং' জানেন আপনি?

–কালে বর্ষতু পর্জন্যং? খুব জানি, রোজ বলি তো, একদিন শুনো না—

এখন বলুন না একটিবার?

কথক সুর করিয়া বলিল বটে। কিন্তু অপুর মনে হইল তাহার বাবার মুখে শুনিলে আরও ভালো লাগে, কথকের গলা বড় মোটা।

দেশে লইয়া যাইবার জন্য কথকঠাকুর নানা খুচুরা মাটির ও পাথরের জিনিস—পুতুল, খেলনা, শিবলিঙ্গ মালা, কাঠের কঁকই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। অপুকে দেখাইয়া বলিল-কাশীর জিনিস, সবাই বলবে কি এনেচ দেখি! তাই নিয়ে যাবো–

নানা সরু গলি পার হইয়া একটা অন্ধকার বাড়ির দরজার সামনে আসিয়া কথকঠাকুর দাঁড়াইল। নিচু দরজা দিয়া অতি কষ্টে কথকের সঙ্গে ঢুকিয়া অপুর মনে হইলবাড়িটায় কেহ কোথাও নাই, সব নিঝুম। কথকঠাকুর দু'একবার গলায় কাশির শব্দ করিতে কে একজন দালানের চারপাই হইতে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া মোটা গলায় হিন্দিতে কি জিজ্ঞাসা করিল, অপু ত্যাহা বুঝিতে পারিল না। কথকঠাকুর পরিচয় দিবার পরেও

মনে হইল লোকটা তাহাকে চিনেও না বা তাহাদের আগমন প্রত্যাশাও করে নাই। পরে লোকটা যেন একটু বিরক্তির সহিত কাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিতে গেল। কিন্তু ফিরিতে এত দেরি করিতে লাগিল যে, অপুর মনে হইল হয়তো ইহারা বলিবে তোমাদের তো নিমন্ত্রণ হয় নাই, যাও তোমরা। যাহ্যাঁই হউক, অন্ধকারে ঠায় পনেরো মিনিট দাঁড়াইবার পরে লোকটা ফিরিয়া আসিয়া দালানের একস্থানে আধ-অন্ধকারে খানকতক শালপাতা পাতিয়া ইহাদের বসাইয়া দিল। একটা মোটা পিতলের লোটায় জল দিয়া গিয়াছে। কথকঠাকুর যেন ভয়ে ভয়ে গিয়া আসনের উপর বসিল। রাজার বাড়ি, কি না জানি খাওয়ায়? অধীর আগ্রহে অপু প্রায় আরও বিশ মিনিট পাতা পাতিয়া বসিয়া রহিল-কাহারও দেখা নাই। নিমন্ত্রণ খাইতে পাইবার নিশ্চয়তার সম্বন্ধে যখন পুনরায় অপুর মনে সন্দেহ দেখা দিতেছে ঠিক সেই সময় পরিবেষ্টার আবির্ভাবরূপ অঘটন ঘটিল। মোটা মোটা আটার পুরী ও স্বাদ-গন্ধহীন বেগুনের ঘণ্ট-শেষে খুব বড় বড় লাড়ু। অপু কামড়াইতে গিয়া লাড়ুতে দাঁত বসাইতে পারিল না, এত কঠিন। কথকঠাকুর চাহিয়া চাহিয়া সেই মোটা পুরী খান দশ-বারো আগ্রহের সহিত খাইল। মাঝে মাঝে অপুর দিকে চাহিয়া বলিতেছিল–পেট ভরে খাও, লজ্জা কোরো না, বেশ খাওয়ায়।–বেশ লাড়ু না? দাঁতে এখনও খুব জোর আছে, বেশ চিবুতে পারি।

একশত বৎসর একসঙ্গে থাকিলেও কেহ হয়তো আমার হৃদয়ের বাহিরে থাকিয়া যায়। যদি না কোনো বিশেষ ঘটনায় সে আমার হৃদয়ের কবাট খুলিতে পারে। আজকার এই নিমন্ত্রণ খাইতে আসার অনাদর, অবজ্ঞা, অপু বালক হইলেও বুঝিযাছিল। তাহার পরও এই খাইবার লোভে ও আনন্দে অপুর অন্তরতম হৃদয়ে ঘা লাগিল। তাহার মনে হইল এ কথকঠাকুর অতি অভাজন। ভাবিল, কথকঠাকুর কখনও কিছু খেতে পায় না, আহা, এই লাড়ু তাই আমন করে খাচ্ছে-ওকে একদিন মাকে বলে বাসাতে নেমন্তন্ন করে খাওয়াবো–

করুণা ভালোবাসার সব চেয়ে মূল্যবান মশলা, তার গাঁথুনি বড় পাকা হয়। তাহার শৈশব মনে এই বিদেশী, দুদিনের পরিচিত, বাঙালি কথকঠাকুর তাহার দিদি ও গুলকীর সঙ্গে এক হারে গাঁথা হইয়া গেল সুদ্ধ এক লাড়ু খাইবার অধীর লোভের ভঙ্গিতে।

ইহার অল্পদিন পরেই কথকঠাকুর দেশে চলিয়া গেল। রাজঘাটের স্টেশনে কথকঠাকুরের নির্বন্ধতিশয্যে হরিহর অপুকে সঙ্গে করিয়া তাহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিতে গেল। হবিহরের মনে হইল আজ বাইশ বৎসর পূর্বে সে যাহা করিতে দেশে গিয়াছিল-এ ব্যক্তি তাহার বর্তমান বয়সের চেয়েও অন্তত আট বৎসর বেশি বয়সে তাহ্যাঁই করিতে অর্থাৎ নূতন করিয়া সংসার পাতিতে দেশে চলিয়াছে। সুতরাং তাঁহারই

বা বয়সটা এমন কি হইয়াছে? কোন কাজ করিবার সময়ের অভাব হইতে পারে তাহার?

গাড়ি ছাড়িলে অপুর চোখে জল আসিল। বালকের প্রাণে সময়ে সময়ে বয়স্ক লোকের উপর স্থায়ী সত্যিকার স্নেহ আসে। দুর্লভ বলিয়াই তাহা বড় মূল্যবান।

মাঘ মাসের শেষের দিকে একদিন হরিহর হঠাৎ বাড়ি ঢুকিয়াই উঠানের ধারে বসিয়া পড়িল। সর্বজয়া কি করিতেছিল, কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া বলিল-কি হয়েচে, এমন করে বসে পড়লে যে? স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কিন্তু মুখের কথাটা তাহার মুখেই রহিয়া গেল। হরিহরের চোখ দুটা জবাফুলের মতো লাল, ডান হাতখানা যেন কাঁপিতেছে। সর্বজয়া হাত ধরিয়া তুলিতে আসিতে সে ঘোর-ঘোর আচ্ছন্নভাবে বলিল-খোকা কোথায় গেল? খোকা?

সর্বজয়া গায়ে হাত দিয়া দেখিল জ্বরে তাহার গা পুড়িয়া যাইতেছে। সন্তপণে হাত ধবিয়া ঘরে লইয়া গিয়া তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া বলিল-অপু আসচে, তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েচে ওপরের ওই নন্দবাবু, বোধ হয় গোধুলিয়ার মোড়ে তার দোকানে নিয়ে গিয়েচে–

অপু দোকানে যায় নাই, নন্দবাবুর ঘরের সামনে ছাদে বসিয়া বসিয়া বই পড়িতেছিল। মাসখানেক হইল নন্দবাবুর সঙ্গে অপুর খুব আলাপ জমিয়াছে। নন্দবাবুর বয়স কত তাহা ঠিক করিয়া বুঝিবার ক্ষমতা তাহার হয় নাই, তবে তাহার বাবার চেয়ে ছোট মনে হয়। নন্দবাবুর উপরের ঘরে সে অনেকগুলি বই আবিষ্কার করিয়াছো-নন্দবাবু যখন ঘরে থাকে তখন বই লইয়া ছাদে বসিয়া পড়ে। কিন্তু ভয় হয় পাছে নন্দবাবু পড়িতে না দিয়া বই কড়িয়া লয়, কারণ একদিন সেরাপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ছাদের এক কোণে রৌদ্রে বসিয়া অপু বই পড়িতেছিল, নন্দবাবুঘরের ভিতর কি খুঁজতে খুঁজতে বাহিরে আসিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া ধমক দিয়া বলিল-আরো রেখে দাও, তোমার বসে বসে যত ওই সব বই পড়া, কোথাকার জিনিস কোথায় রাখে। তার ঠিক নেই, কাজের সময় খুঁজে মেলে না-যাও, রাখো বই, যাও–

সে তো ঘরের অন্য কোনো জিনিসে হাত দেয় না, তবে তাহাকে বকিবার কারণ কি? সেই হইতে সে ভয়ে ভয়ে রই লইয়া থাকে।

নন্দবাবু সন্ধ্যার সময় টেরি কাটিয়া ভালো জামা কাপড় পরিয়া শিশি হইতে কি গন্ধ মাখিয়া রোজ বেড়াইতে যায়। অপুর গায়ে একদিন একটু শিশি হইতে ছড়াইয়া দিয়াছিল, বেশ ভুরিভুরে গন্ধটা।

সন্ধ্যার পরও সে আগে আগে নন্দবাবুর ঘরে পড়িতে যাইত। কিন্তু সন্ধ্যার পরে নন্দবাবু আলমারি হইতে একটা বোতল লইয়া লাল-মতো একটা ঔষধখায়। সে সময়ে সে একদিন ঘরে গিয়া পড়িলে তাহাকে ভারী বকিয়াছিল। নন্দবাবুদের ঘরে উঠিবার সিঁড়ি অন্যদিকে-আর একদিন রাত্রে হঠাৎ ওপরের ঘরে গিয়া সে দেখিয়াছিল একটি কে স্ত্রীলোক ঘরের মধ্যে বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া নন্দবাবু বলিয়াছিল–এখন যাও অপূর্ব, ইনি আমার শালী-দেখতে এসেচেন, এখুনি চলে যাবেন। ফিরিয়া আসিতে আসিতে সে শুনিয়াছিল নন্দবাবু বলিতেছে-ও আমাদের নিচের ভাড়াটের ছেলে–কিছু বোঝে-সোঝে না।

নন্দবাবু তাহকে প্রায়ই তাহার মার কথা জিজ্ঞাসা করে। বলে-তোমার মাকে বলে পান নিয়ে এসো দিকি? আমার চাকরিটা পান সাজতে জানে না–

অপু মায়ের কাছে আবদার করিয়া ওপরে প্রায়ই পান আনে। নন্দবাবু মাঝে মাঝে বলে– তোমার মা আমার কথা কিছু বলেন-টলেন নাকি-না?–

অপু বাড়ি আসিয়া মাকে বলে–নন্দবাবু বেশ লোক মা–তোমার কথা রোজ জিজ্ঞেস করে–

–আমার কথা? আমার কথা কি জিজ্ঞেস করে—

–বলছিল তোমার মাকে বোলো, আমি তার কথা জিজ্ঞেস করি-টরি–বেশ লোক—

–করুক গে—তুই পাঁজি ছেলে অত ওপরের ঘরে যাস-টাস কেন? বিকেলে ওপরে বসে বুসে কি কবিস?

হরিহরের জ্বরটা একটু কমিল। অপু স্কুল হইতে আসিয়া বই নামাইয়া রাখিতেছে। পায়ের শব্দ পাইয়া হরিহর বলিল-খোকা এসো, একটু বসো বাবা–

অপু বসিয়া বসিয়া স্কুলের গল্প করিতে লাগিল। হাসিমুখে নিচু সুরে বলিল-এই দুমাস তো স্কুলে গিাঁইচি, এরই মধ্যে বাবা, স্কুলের সবাই খুব ভালোবাসে, রোজ রোজ ফাস্ট

বসি-স্কুলে আমাদের ক্লাসে একখানা কাগজ ছাপিয়ে বাব করবে এক মাস অন্তর। আমাকে সেই দলে নিয়ে চে–তোমায় দেখাবো বাবা বেবুলে–

হরিহরের বুকের ভিতরটা মমতায় বেদনায় কেমন করে। অপু একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলে–একটা লেখা লিখেচি-কাগজখানা ছাপাবে বলেচে, আমার নামে-কিন্তু যারা দুটাকা করে চাঁদা দেবে শুধু তাদেরই লেখা ছাপবে বলেচে-দুটাকা দেবে বাবা?

হরিহর অধীর আগ্রহে ছেলের হাত হইতে কাগজখানা লইয়া পড়িতে শুরু করে। ছেলে যে লেখে, সে খবর সে জানিত না। রাজপুত্রের মৃগয়ার গল্প সুন্দর বানানো, হরিহর খুশি হইয়া বালিশে ভরা দিয়া উঠিয়া বসে, বলে-তুই লিখিচিস খোকা?

-আমি তো আরও কত লিখিচি বাবা, ভূতের গল্প, রাজকন্যের-বাড়ি থাকতে রানুদির খাতায় লিখে লিখে দিতাম তো–

সর্বজয়া টাকার নাম শুনিয়া দিতে চাহে না। স্বামী অসুখে পড়িয়া এ অবস্থায় যাহা আছে তাহা সংসারের খরচেই কুলাইবে না, দরকার নাই ছাপানো কাগজে। হরিহর বুঝাইয়া বলিয়া টাকা দেওয়ায়, বলে–দাও গিয়ে, আহা খোকার লেখাটা ছাপিয়ে আসুক, সেরে উঠে পথ্যি করলেই ঠাকুর-বাড়ির ভাগবত পাঠটা তো ঠিকই রয়েচে-ওতেও তো গোটা দশেক টাকা পাবো–

দিন দুই পরে অপু নিরাশ মুখে রাঙা ঠোঁট ফুলাইয়া বাবার কাছে চুপি চুপি আসিয়া বলে–হলো না বাবা। ছাপাখানাওয়ালার লোকেরা বেশি দাম চেয়েচে, তাই আজ স্কুলে বলে দিয়েচে, চার টাকা করে চাঁদা চাই–

ছেলের মুখের নিরাশার ভাব হরিহরের বুকে খচ্ করিয়া বিঁধে। খানিকক্ষণ অন্য কথার পর সে বলে-দ্যাখ দিকি খোকা তোর মা কোথায় গেল।...বালিশের তলা হইতে চাবির থোলো বাহির করিয়া দিয়া বলে-চুপি চুপি ওই কাঠের ছাপ বাক্স, যেটাতে আমার কঞ্চির কলমের বান্ডিল আছে, ওইটে খোল তো?...কোণে দাখা তো কটাকা আছে? তাহার পর হরিহর সন্তর্পণে বাক্সখোলা-নিরত পুত্রের দিকে মমতার চোখে চাহিয়া থাকে। অবোধ, অবোধ, নিতান্ত অবোধ!.ওর সুন্দর, শূদ্র চাঁদের মতো ললাটটি ওর মায়ের ললাট, চোখ দুটি ওর মায়ের চোখ। যখন হরিহর প্রথম যৌবনে বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে ঘরে আনে, নববধূ সর্বজয়ার অবিকল সেই মুখের হাসি এগারো বছরের অপুর অনাবিল, নবীন মুখে।

অকারণে হরিহরের বুকের মধ্যে স্নেহসমুদ্র উদ্বেল উত্তাল হইয়া উঠিয়া চোখে জল ভরিয়া আনে।

অপু যেন প্রথম বসন্তের নবকিশলয়, তাহার মুখের আনন্দ যেন প্রভাতের নব-অরুণ আভা, তার ডাগর ডাগর নীলাভ চোখ দুটির চাহনির মধ্যে নিজের অতীত যৌবনদিনের সে অসীম স্বপ্ন, সুনীল পাহাড়ের নবীন শালতারুশ্রেণীর উল্লাস-মর্মর.কুলহারা সমুদ্রের দূরাগত সংগীতধ্বনি।

অপু চুপি চুপি বাবাকে দেখাইয়া বলে—চারটে টাকা আছে বাবা!—হরিহরি সময় অসময়ের জন্য টাকা কয়টি রাখিয়া দিয়াছে নিজের বাক্সে লুকাইয়া, স্ত্রী জানে না, কাজেই সে নিশ্চিন্তমনে বলিতে পারিল–নিয়ে যা খোকা, চাঁদা দিয়ে দিস, কিন্তু তোর মাকে যেন বলিসনে।

অপু খুশির সুরে বলে-ছাপা বেবুলে তোমায় দেখাবো বাবা, আমার নামে ছাপিয়ে দেবে বলেচে—এই সোমবারের পরের সোমবারে বেরুবে—

পরদিন সকাল হইতে হরিহরের অসুখ আবার বাড়িল।

সর্বজয়া ভয় পাইয়া ছেলেকে বলিল-নন্দবাবুকে বলগে যা তো—একবার এসে দেখে যান–

নন্দবাবু দেখিয়া বলিল-একজন ডাক্তার ডাকতে হবে অপূর্ব, তোমার মাকে বলো।

বৈকালে নন্দবাবুই একজন ডাক্তার সঙ্গে করিয়া আনিল। ডাক্তার দেখিয়া শুনিয়া বলিল— ঠাণ্ডা লেগে হয়েচে, ব্রাঙ্কো-নিমোনিয়া-ভালো নার্সিং চাই,–নিচের ঘরে কি এমনি করে। থাকে!… খোকা, তুমি একটা শিশি নিয়ে এসো আমায় ডাক্তারখানায়, ওষুধ দেবো–

অপু কয়দিন গিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর ডাক্তারের ডিসপেন্সারি হইতে ঔষধ আনিল।

বিশেষ কোনো ফল দেখা গেল না। দিন দিন হরিহর দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। এদিকে টাকা যে কয়টি ছিল-ভিজিটে ও পথ্যে খরচ হইয়া গেল। ডাক্তার বলিল, অন্তত এক সেরা করিয়া দুধ ও অন্যান্য ফল না খাইতে দিলে রোগী দুর্বল হইয়া পড়িবে। সাড়ে তিন টাকা দামের একটা বিলাতী পথ্যের ব্যবস্থাও দিয়া গেল। বিদেশী-বিভূই জায়গা। একবার দেখিয়া সাহস দেয় এমন লোক নাই, সর্বজয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিল।

এই বিপদের মধ্যে সর্বজয়া আবার এক নূতন বিপদে পড়ল। উপরের ছাদে দাঁড়াইয়া ঝুঁকিয়া দেখিলে রাঁধিবার ঘর দেখা যায়। ইতিপূর্বেও সে মাঝে মাঝে নন্দবাবুকে ছাদ হইতে তার রান্নাঘরের দিকে উঁকিঝুঁকি মারিতে দেখিয়াছে, সম্প্রতি হরিহরের অসুখ হইবার পর হইতে নন্দবাবু বড় বাড়াইয়া তুলিল। নানা অছিলায় সে দিনে দশবার ঘরের মধ্যে আসে-আগে আগে অপুকে আড়াল করিয়া জিজ্ঞাসা করিত-আজকাল সরাসরিই তাহাকে সম্বোধন করিয়া কথাবার্তা বলে। প্রথমটা সর্বজয়া কিছু মনে করে নাই-বরং বিপদের সময়ে এই অনাত্মীয় লোকটি যথেষ্ট সাহায্য ও দেখাশুনা করিতেছে ভাবিয়া মনে মনে কৃতজ্ঞই ছিল, কিন্তু ক্রমেই যেন তাহার মনে হইতে লাগিল যে, এই যে বাড়াবাড়ি-ইহা কোথায যেন বেখাপ ঠেকিতেছে। নন্দবাবু নিজে পান কিনিয়া আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া বলে–চাকরদের হাতে পান সাজা–জীবনটা গেল বৌঠাকুরন—সাজুন দিকি একবার–তাহাতেও সর্বজয়া দোষ ধরে নাই, বরং এই প্রবাসী আত্মীয়স্নেহবঞ্চিত লোকটির উপর মনে মনে একটু করুণাই হইত-কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ক্রমে শোভনতার সীমা ডিঙাইতে চলিল। আজকাল পান আনিয়া বলে-রাখো দিকি বৌঠাকরুন। হাত হইতে সর্বজয়া লইবে-এইরূপই যেন চায়। অপু তো পাগল-অধিকাংশ সময়ই বাটীতে তাহাকে খুঁজিয়া মেলে না-ওঘরে হরিহর অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে-আর ঠিক সেই সময়টিতেই নন্দবাবু ঘরে আসিবে রোগী দেখিতে!..ছলছুতায় একথাওকথায় আধঘণ্টা না কাটাইয়া সে ঘর হইতে যায় না। বলে—কোনো ভয় নেই বৌঠাকরুন-আমি আছি ওপরে-অপূর্ব থাকে না থাকে-ওই সিঁড়িটার ওপর গিয়ে ডেকো না! বিপদের সময় অত বাছতে গেলে…একটু চুন দাও তো! বোঁটা নেই? আহা আঙুলের মাথাতে করেই একটু দাও না অমনি–

হরিহরের জ্ঞান হইলেই ছেলের জন্য অস্থির হইযা উঠে। এদিকে ওদিকে চাহিয়া ক্ষীণসুরে বলে–খোকা কই! খোকা কই!…সর্বজয়া বলে-আসচে, তাই কি হতচ্ছাড়া ছেলে একটু কাছে বসবে…বেরিযেচে বুঝি সেই ঘাটে। ছেলে বাড়ি এলে বলে-বসতে পারিসনে একটু কাছে। খোকা খোকা করে পাগল-খোকার তো ভেবে ঘুম নেই—যা বসগে, যা, গায়ে মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিতে নেই বুঝি? ছেলে হয়ে স্বগগে ঘণ্টা দেবেন কি না?

অপু অপ্রতিভ মুখে বাবার শিয়রের পাশে বসে। কিন্তু খানিক বসিয়াই মনে ভাবে—ওঃ। কতক্ষণ বসে থাকবো।–বেশ তো? আমার বুঝি একটু বেড়াতে কি খেলা করতে নেই। কনকনে ঠাণ্ডায় পা অবশ হইয়া আসে। তাহার মন ছটফট করে-একদৌড়ে একেবারে সেই দশাশ্বমেধ ঘাট। জলের রানা, নির্মল মুক্ত হাওয়া, সুরেশ নবনারীর ভিড়। পটু, সুবীর…গুলু-পটল-পল্‌টুর দাদা। রামনগরের রাজার সেই ময়ুরপঙ্খীটায় আজ আবার বাচ, বেলা চারটার সময়! উসখুসি করিতে করিতে চক্ষুলজ্জায় সন্ধ্যা করিয়া ফেলে, মায়ের ভয়ে যাইতে সাহস পায় না।

সকালে সর্বজয়া একদিন ছেলেকে বলিল-হ্যারে, ওই সাদা বাড়িটার পাশে কোন ছত্তর জানিস?

–উঁহু–

–তুই ছত্তরে খাসনি একদিনও এখানে এসে? কাশীতে এসে ছত্তরে খেতে হয় কিন্তু, জানিসনে বুঝি! খেয়ে আসিস না আজ?...দেখেই আসিস না?

–কাশীতে এসে ছত্তরে খেতে হয় কেন?

—খেলে পুণ্য হয়—আজ দশাশ্বমেধ ঘাটে নেয়ে অমনি ছত্তর থেকে খেয়ে আসিস বুঝলি। বেলা বারোটার সময় সত্র হইতে খাইয়া অপু বাড়ি ফিরিল। তাহার মা বান্নাঘবেব বাবান্দায বসিয়া বাটিতে কি লইয়া খাইতেছিল–তাহাকে দেখিয়া প্রথমটা লুকাইবার চেষ্টা করিলা বটে কিন্তু অপু অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়িয়াছে-লুকাইতে গেলে সন্দেহ জাগানো হয়। ভাবিয়া সহজ সুরে বলিবার চেষ্টা করিল-খেয়ে এলি? কেন খাওয়ালে রে?

মা অড়হরের ডাল-ভিজা খাইতেছে।

—ভালো না-কুমড়োর একটা ছাই ঘণ্ট-বসে বসে হয়রান—বড্ড ময়লা কাপড়-পরা লোক সব খেতে যায়-আমি আর যাচ্ছি নে, পুণ্যতে আমার দরকার নেই-ওকি খাচ্ছ মা? তোমার বের্তো নাকি? রান্না হয় নি?

–আজি তো আমার কুলুইচণ্ডী—এই দুটো অড়লের ডাল ভিজে-বেশ খেতে লাগে-আমি বড় ভালোবাসি... খাবি দুটো ওবেলা?

রাত্রিতেও রান্না হইল না। তাহার মা বলিল-আড়ালের ডাল ভিজে খেয়ে দ্যাখা দিকি? বেশ লাগবে এখন-এবেলা রাঁধলাম না, ভারি তো খাস, এত কটা ভাতে বসিস বই তো নয়- ওই খেয়ে কি আর খেতে পারবি?

পরদিন দুপুরে নন্দবাবু একতাড়া পান অপুর হাতে দিয়া বলিল-তোমার মার কাছ থেকে সেজে নিয়ে এসো তো? রোগীর ঘরের পাশের ঘরে সর্বজয়া বসিয়া পান সাজিতেছে। নন্দবাবু জুতার শব্দ করিতে করিতে উপর হইতে নামিয়া রোগীর ঘরে ঢুকিল এবং অতি অল্পক্ষণ পরেই সেখান হইতে বাহির হইয়া সর্বজয়া যে-ঘরে পান সাজিতেছে সেখানে ঢুকিল। সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া সর্বজয়ার ঝিমানি ধরিয়াছিল, জুতার শব্দে চমক ভাঙিলে একেবারে সম্মুখে নন্দবাবুকে দেখিয়া সে

জড়সড় হইয়া ঘোমটা টানিয়া দিল। নন্দবাবু বলিল-পান সাজা হয়েচে বৌঠাকরুন? সর্বজয়া নীরবে সাজা পানের খিলিগুলি রেকরিতে করিয়া সামনে দিকে ঠেলিয়া দিতে নন্দবাবু এক খিলি তুলিয়া মুখের মধ্যে পুরিয়া বলিল-চুন বড় কম হয় বৌঠাকরুন তোমার পানে, সরো দেখি আমি নিচ্চি–

সর্বজয়ার কোলের কাছে পানের বাটা। বাড়িতে কেহ নাই, অপু কোথায় বাহির হইয়াছে। পাশের ঘরে হরিহর ঔষধের বশে ঘুমাইতেছে। নিস্তব্ধ দুপুর। হঠাৎ সর্বজয়ার মনে হইল যেন নন্দবাবু চুন লইবার অছিলায় অনাবশ্যকরূপে–তাহার অত্যন্ত কাছে ঘোষিয়া আসিতে চাহিতেছে-একটা অস্পষ্ট চিৎকার করিয়া একলহমার মধ্যে সে উঠিয়া গিয়া ঘরের বাহিরে দাঁড়াইল! একটা বিদ্যুতের মতো কিসের স্রোত তাহার পা হইতে মাথা পর্যন্ত খেলিয়া গেল। আঙুল দিয়া সিঁড়ি দেখাইয়া তীব্রস্বরে বলিল-চলে যান। এখখনি ওপরে।–কখখনো আর নিচে আসবেন না-নিচে এলে আমি মাথা খুঁড়ে খুন হবো-কেন আপনি আসেন? খবরদার আর আসবেন না–

সর্বজয়া পড়িল মহা ফাপারে। বিদেশ জায়গা, এই রোগী ঘরে-নিঃসহায়, হাতে একটি পয়সা নাই, একটি পরিচিত লোক কোনো দিকে নাই, ছেলের বছর এগারো বয়স মোটে-তাও বুদ্ধিসুদ্ধি নাই, নিতান্ত নির্বোধ। এদিকে এই সব উৎপাত।

উপরের পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকটি কালেভদ্রে নিচে নামে-এক আধা বার সর্বজয়াকে উপরে তাহার ঘরে লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পাঁচ-ছয় মাস কাশীতে আসিয়াও সর্বজয়া না পারে হিন্দি বলিতে, না পারে ভালো বুঝিতে, কাজেই আলাপ মোটেই জমে নাই। অদ্য তাহার কাছে গিয়া নন্দবাবুর ঘটনা আনুপূর্বিক বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। পাঞ্জাবী মেয়েটির নাম সূরযকুঁয়ারী, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই পাঞ্জাবের রোয়ালসার জেলার অধিবাসী; স্বামীটি রেলে ওভারসিয়ারের কাজ করে। মেয়েটির বয়স খুব অল্প না হইলেও দেখিতে কম বয়সি, গৌরাঙ্গী, আয়তনয়না, আঁটসাঁট দীর্ঘগড়ন। সে সব শুনিয়া বলিল– কোনো ভয় নাই, আপনি নির্ভয়ে থাকুন, আবার যদি কিছু বদমায়েশির ভাব দেখেন আমায় বলবেন, আমার স্বামীকে দিয়া উহার নাক কাটিয়া ঠাণ্ডা করিয়া ছাড়িব।...

ঠিক দুপুর। কয়রাত্রি জাগিবার পর সর্বজয়া মেজেতে আঁচল পাতিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। উত্তরের ঘরের জানোলা দিয়া একফালি রৌদ্র আসিয়া সবু উঠানটাতে বাঁকাভাবে পড়িয়াছে। অপু মাটির মালসাতে গাঁদাফুলের গাছ লাগাইয়াছিল, দু-তিনটা একপেটে গাদা নিতান্ত বিরক্তভাবে ফুটিয়া আছে।–তলায় একটা বিড়াল-ছানা বসিয়া। অপু বাবার বিছানার পাশেই বসিয়া ছিল। তাহার বাবা আজ সকাল হইতে একটু ভালো আছে—ডাক্তার বলিয়াছে বোধহয় জীবনের আশা হইল। ভালো থাকিলেও রোগীর খুব

চৈতন্য আছে বলিয়া মনে হয় না, বেহুঁশ অবস্থা। তাহার বাবা হঠাৎ চোখ খুলিয়া তাহার দিকে খানিকটা চাহিয়া থাকিয়া কি বলিল। অপুর মনে হইল বাবা তাহাকে আরও কাছে সরিয়া যাইতে বলিতেছে। অপু সরিয়া যাইতে হরিহর রোগশীর্ণ ক্ষীণ দুই হাতে ছেলের গলা জড়াইয়া ধরিয়া নীরবে তাহার মুখের দিকে অনেকক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টি চাহিয়া রহিল। অপু একটু অবাক হইল, বাবার চোখের ওরকম দৃষ্টি কখনও সে দেখে নাই।

রাত্রি দশটার সময় নিদ্রিত অপুর কি শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘরে ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছে– মা অঘোরে ঘুমাইতেছে, বাবার গলার মধ্যে নানাসুরে যেন কি একটা শব্দ হইতেছে। তাহার কেমন ভয় ভয় ঠেকিল। বুঝলমাখানো কড়িকাঠ, স্যাঁতা মেঝে, হাড়ভাঙা শীত, কাঠকয়লার আগুনের ধোঁয়া–সব মিলিয়া যেন একটা কঠিন দুঃস্বপ্ন। বাবার অসুখ সারিলে যে বাঁচা যায়!

শেষ রাত্রে তাহার মায়ের ঠেলা পাইয়া তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল!–অপু, ও অপু ওঠ, শিগগির গিয়ে ওপরে থেকে হিন্দুস্তানী বৌকে ডেকে আনতো–

অপু উঠিয়া শুনিল বাবার গলার সেই শব্দটা আরও বাড়িয়াছে। উপর হইতে সূরযকুঁয়ারী আসিবার একটু পরেই রাত্রি চারটার সময় হরিহর মারা গেল।

মাঝ-বর্ষার ধারামুখর কুয়াশাচ্ছন্ন দিনে মনে হয় যে পৃথিবীর রৌদ্রদীপ্ত দিনগুলো স্বপ্ন না সত্য? এই মেঘ, এই দুর্দিন, অনন্ত ভবিষ্যতের পথে এরাই রহিল চিরসখী–দিগন্তের মায়ালীলার মতো চৈত্র-বৈশাখের যে দিনগুলা অতীতে মিলাইয়া গিয়াছে–আর কি তাহা ফিরিয়া আসে?

চারিধার হইতে সর্বজয়াকে কি এক কুয়াশায় ঘিরিয়া ফেলিল। তাহার মাধ্য দিয়া না দেখা যায় পথ, না চেনা যায় সাথী, না জানা যায় কোথায় আছি। সন্দেহ হয় এ কুয়াশা বোধ হয় বেলা হইলে রৌদ্র উঠিলেও কাটিবে না, এর পেছনে আছে আকাশ-ছাওয়া ফিকে ধূসর রং-এর সারাদিনব্যাপী অকাল বাদলের মেঘ।

বিপদের দিনে পাঞ্জাবী ওভারসিয়ার জালিম সিং ও তাহার স্ত্রী যথেষ্ট উপকার করিল। জালিম সিং অফিস কামাই করিয়া সৎকারের লোকের জন্য বাঙালিটোলায় ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল। খবর পাইয়া রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন সেবকও আসিয়া পৌঁছিল।

মণিকর্ণিকার ঘাটে সৎকার অন্তে সন্ধ্যাবেলা অপু স্নান করিয়া ঠাণ্ডা পশ্চিমে বাতাসে কাঁপিতে কাঁপিতে পৈঠার উপর উঠিল। রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সেবক ও নন্দবাবু

তাহাকে উত্তরীয় পরাইতেছিল। বেলা খুব পড়িয়া গিয়াছে, অস্ত-দিগন্তের ম্লান আলো পাথরের মন্দিরগুলার আগাটুকুতে মাত্র চিকচিক করিতেছে। সারাদিনের ব্যাপারে দিশেহারা অপুর মনে হইল। তাহার বাবার পরিচিত গলায় উৎসুক শ্রোতাগণের সম্মুখে কে যেন বসিয়া আবৃত্তি করিতেছে–

কালে বর্ষতু পর্জন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী....
লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ...

যে বাবাকে সকলে মিলিয়া আজি মণিকর্ণিকার ঘাটে দাহ করিতে আনিয়াছিল, — রোগে, জীবনের যুদ্ধে পরাজিত সে বাবা স্বপ্ন মাত্র–অপু তাহাকে চেনে না, জানে না– তাহার চিরদিনের একান্ত নির্ভরতার পাত্র, সুপরিচিত, হাসিমুখ বাবা জ্ঞান হইয়া অবধি পরিচিত সহজ সুরে, সুকণ্ঠে, প্রতিদিনের মতো কোথায় বসিয়া যেন উদাস পূরবীর সুরে আশীর্বাচন গান করিতেছে–

কালে বর্ষতু পর্জন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী....
লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ...

# দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কোনোরূপে মাসখানেক কাটিল। এই একমাসের মধ্যে সর্বজয়া নানা উপায় চিন্তা করিয়াছে কিন্তু কোনোটাই সমীচীন মনে হয় না। দু-একবার দেশে ফিরিবার কথাও যে তাহার না মনে হইয়াছে এমন নয়, কিন্তু যখনই সে কথা মনে ওঠে, তখনই সে তাহা চাপিয়া যায়। প্রথমত তো দেশের এক ভিটাটুকু ছাড়া বাকি সব কতক দেনার দায়ে, কতক এমনি বেচিয়া কিনিয়া আসা হইয়াছে, জমিজমা কিছুই আর নাই। দ্বিতীয়ত সেখান হইতে বিদায় লইবার পূর্বে সে পথে-ঘাটে বৌ-বিদের সম্মুখে নিজেদের ভবিষ্যতের সুখের ছবি কতভাবে আঁকিয়া দেখাইয়াছে। নিশ্চিন্দিপুরের মাটি ছাড়িয়া যাওয়ার অপেক্ষা মাত্র, এ পোড়া মুখের দেশে তাহার স্বামীর কদর কেহ বুঝিল না, কিন্তু যেখানে যাইতেছে সেখানে যে তাঁহাকে সকলে লুফিয়া লইবে, অবস্থা ফিরিতে যে এক বৎসরও দেরি হইবে না-এ কথা হাতমুখ নাড়িয়া সর্বজয়া কতভাবে তাহদের বুঝাইয়াছে! এই তো চৈত্র মাস, এক বৎসর এখনও পূর্ণ হয় নাই। ইহারই মধ্যে এরূপ নিঃসম্বল দীন অবস্থায়, তাহার উপরে বিধবার বেশে সেখানে ফিরিয়া গিয়া সকলের সম্মুখে দাঁড়াইবার কথাটা ভাবিতেই সে লজ্জায় সংকোচে মাটিতে মিশিয়া যাইতেছিল। যাহা হইবার এখানেই হউক, ছেলের হাত ধরিয়া কাশীর পথে পথে ভিক্ষা করিয়া ছেলেকে মানুষ করিবে, কে দেখিতে আসিবে এখানে?

মাসখানেক পরে একটা সুবিধা হইল। কেদার ঘাটের এক ভদ্রলোক মিশনের অফিসে জানাইলেন যে তাঁহার পরিচিত এক ধনী পরিবারের জন্য একটি ব্রাহ্মণের মেয়ে আবশ্যক, জগতের মেয়ে, ঘরে আসিবেন, কাজকর্মে সাহায্য করিবেন। মিশন এরূপ কোনো লোকের সন্ধান দিতে পারেন কি না? শেষ পর্যন্ত মিশনের যোগাযোগে ভদ্রলোকটি অপূদের সেখানে পাঠাইতে রাজি হইলেন। সর্বজয়া অকুল সমুদ্রে কুল পাইয়া গেল। দিন-দুই পরে সেই ভদ্রলোকটি বলিয়া পাঠাইলেন যে, বাসা একেবারে উঠাইয়া যাইবার জন্য যেন ইহারা প্রস্তুত হয়, কারণ সেই ধনী গৃহস্থদের বাটী লইয়া যাইবেন।

প্রকাণ্ড বড় হলদে বঙের বুড়িটা। কাশীতে যে রকম বড় বড় বাড়ি আছে, সেই ধরনের খুব বড় বাড়ি। সকলেব পিছনে পিছনে সর্বজয়া ছেলেকে লইয়া সংকুচিতভাবে বাড়ির ভিতর ঢুকিল।

অন্তঃপুরে পা দিতেই অভ্যর্থনার একটা রোল উঠিল—তাহার জন্য নহে-যে দলটি এইমাত্র কাশী হইতে বেড়াইয়া ফিরিল, তাহাদের জন্য।

ভিড় ও গোলমাল একটু কমিলে বাড়ির গিন্নি সর্বজয়ার সম্মুখে আসিলেন। খুব মোটাসোটা, এক সময়ে বেশ সুন্দরী ছিলেন বোঝা যায়, বয়স পঞ্চাশের উপর। গিন্নিকে প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন-থাক, থাক, এসো, এসো-আহা এই অল্প বয সেই এই–এটি ছেলে বুঝি? খাসা ছেলে–কি নাম?

আর একজন কে বলিলেন-বাড়ি বুঝি কাশীতেই? না?–তবে বুঝি—

সকলের কৌতূহল-দৃষ্টির সম্মুখে সর্বজয়া বড় লজ্জা ও অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। গিন্নির হুকুমে যখন ঝি তাহার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে তাহাকে লইয়া গেল, তখন সে হাঁপ ফেলিয়া বাঁচিল।...

পরদিন হইতে সর্বজয়া চুক্তিমতো রান্নার কাজে ভর্তি হইল। রাঁধুনী সে এক নয়, চার-পাঁচজন আছে। তিন-চারটা বান্নাঘর। আঁশ নিরামিষ, দুধের ঘর, রুটির ঘর, বাহিরের লোকদিগেব রান্নার আলাদা ঘর। ঝি-চাকরের সংখ্যা নাই। রান্নাবাড়িটা অন্তঃপুরের মধ্যে হইলেও একটু পৃথক। সেদিকটা যেন বি-চাকিব-বামুনের রাজত্ব। বাড়ির মেয়েরা কাজ বলিয়া ও বুঝাইয়া দিয়া যান মাত্র, বিশেষ কারণ না ঘটিলে রান্নাবাড়িতে বড় একটা থাকেন না।

সর্বজয়া কি রাঁধিবে একথা লইয়া আলোচনা হয়। সর্বজয়ার বরাবরই বিশ্বাস সে খুব ভালো রাঁধিতে পারে। সে বলিল, নিরামিষ তরকারি রান্নার ভার বরং তাহার উপর থাকুক। রাঁধুনী বামনী মোক্ষদা মুচকি হাসিয়া বলিল-বাবুদের রান্না তুমি করবে? তা হলেই তো চিত্তির। পরে পাচিবিকে ডাক দিয়া কহিল, শূনচিস, ও পাঁচি, কাশীর ইনি বলচেন নাকি বাবুদের তরকারি রাধবেন! কি নাম গো তোমার? ভুলে যাই-মোক্ষদার ওষ্ঠের কোণের ব্যঙ্গের হাসিতে, সর্বজয়া সেদিন সংকোচে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু দু-একদিনেই সে বুঝিতে পারিল যে তাহার পাড়াগাঁয়ের কোনো তরকারি রান্না সেখানে খাটিবে না। ঝোলে যে এত চিনি মিশাইতে হয় বা বাঁধাকপি ফ্রিটার্স বলিয়া যে একটা তরকারি আছে, একথা সে এই প্রথম শুনিল।

গৃহিণী সর্বজয়াকে মাস দুই বেশ যত্ন করিয়াছিলেন। হালকা কাজ দেওয়া, খোঁজখবর নেওয়া। ক্রমে ক্রমে অন্য পাঁচজনের সমান হইয়া দাঁড়াইতে হইল। বেলা দুইটা পর্যন্ত কাজ করার পর প্রথম প্রথম সে বড় অবসন্ন হইয়া পড়ে, এভাবে অনবরত আগুনের তাতে থাকার অভ্যাস তাহার কোনো কালে নাই, অত বেলায় খাইবার প্রবৃত্তি বড় একটা থাকে না। অন্য অন্য রাঁধুনীরা নিজেদের জন্য আলাদা করিয়া মাছ তরকারি লুকাইয়া রাখে, কতক খায়, কতক বাহিরে কোথাও লইয়া যায়। সে পাতের কাছে একবার বসে মাত্র!

রান্নার বিরাট ব্যাপার দেখিয়া সর্বজয়া অবাক হইয়া যায়, এত বড় কাণ্ড-কারখানার ধারণা কোনো দিন স্বপ্নেও তাহার ছিল না, বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবে, দু'বেলায় তিন সেরা করে তেলের খরচ? রোজ একটা যজ্ঞির তেল-ঘি এর খরচ!... পাড়াগায়ের গরিব ঘরের ছোট সংসারের অভিজ্ঞতা লইয়া সে এসব বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

একদিন সবু চালের ভাত রান্নার বড় ডেকচিটা নামাইবার সময় মোক্ষদা বামনীকে ডাক দিয়া বলিল-ও মাসিমা, ডেকচিটা একটুখানি ধরবে?

মোক্ষদা শুনিয়াও শুনিল না।

এদিকে ভাত ধরিয়া যায় দেখিয়া নিজেই নামাইতে গিয়া ভারী ডেকচিটা কত করিযা ফেলিল, গরম ফেন পায়ের পাতায় পড়িয়া তখনই ফোস্কা পড়িয়া গেল। গৃহিণী সেই দিনই তাঁহাকে বুটির ঘরে বদলি করিয়া বলিয়া দিলেন, পা না। সারা পর্যন্ত তাহাকে কোনো কাজ করিতে হইবে না।

সর্বজয়া ছেলেকে লইয়া নিচের একটা ঘরে থাকে। ঘরটা পশ্চিমদিকের দালানের পাশেই। কিন্তু সেটা এত নিচু, আর মেঝে এত স্যাতসেঁতে এবং ঘরটাতে সব সময় এমন একটা গন্ধ বাহির হয় যে, কাশীর ঘরাও এর চেয়ে অনেক ভালো ছিল। দেয়ালের নিচের দিকটা নোনা-ধরা, বাঙা, রাঙা বড় বড় ছোপ, প্রতিবার বাহির হইতে ঢুকিয়াই অপু বলে-উঃ, কিসের গন্ধ দেখচোঁ মা, ঠিক যেন পুরোনো চালের কি কিসের গন্ধ বলো দিকি?...নিচের এ ঘরগুলা কর্তৃপক্ষ মনুষ্যবাসের উপযুক্ত করিয়া তৈয়ারি করেন নাই, সেইজন্যই এগুলিতে চাকর-বাকর রাঁধুনীরা থাকে।

উপরের দালানের সব ঘরগুলি অপু বাহির হইতে বেড়াইয়া বেড়াইয়া দেখিয়াছে, বড় বড় জানালা দরজা। জানালায় সব কাচ বসানো। ঘরে ঘরে গদি-আঁটা বড় বড় চেয়ার, ঝকঝকে টেবিল, যেন মুখ দেখা যায়, এত ঝকঝকি করে। অপুদের বাড়িতে যেমন কর্পোেটের পুরানো আসন ছিল, ওই রকম কিন্তু ওর চেয়েও ঢের ভালো, পুরু ও প্রায় নতুন-কার্পেট মেজেতে পাতা! দেওয়ালে আয়না টাঙানো, এত বড় বড় যে, অপুর সমস্ত চেহারাখানা তাহাতে দেখা যায়। সে মনে মনে ভাবে-এত বড় বড় কাচ পায় কোথায়? জুড়ে জুড়ে করেচে। বোধ হয়–

দোতলার বারান্দায় আর একটা বড় ঘর আছে–সেটা প্রায়ই বন্ধ থাকে, মাঝে মাঝে চাকরবাকরে আলো হাওয়া খাওয়াইবার জন্য খোলে। সেটার মধ্যে কি আছে জানিবার জন্য অপুর অদম্য কৌতূহল হয়। একদিন ঘরের দরজা খোলা দেখিয়া সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াছিল। কি বড় বড় ছবি! পাথরের পুতুল! বড় বড় গদি-আঁটা চেয়ার-আয়না,-সে

ঘুরিয়া বেড়াইয়া সব দেখিতেছে, এমন সময় ছটু খানসামা তাহাকে ঘরের মধ্যে দেখিতে পাইয়া বুখিয়া আসিয়া বলিল—কোন বা?... কাহে ইসমে ঘুসা?

হয়তো সেদিন সে মারই খাইত, কিন্তু বাড়ির একজন ঝি দালান দিয়া যাইতে যাইতে দেখিয়া বলিল-এই ছটু, ছেড়ে দাও, কিছু বোলো না-ওর মা এখানে থাকে-দেখচে দেখুক না–

সকলের খাওয়া-দাওয়া সারা হইলে সর্বজয়া বেলা আড়াইটার সময়ে নিজের ঘরটিতে আসিয়া খানিকটা শোয়। সারাদিনের মধ্যে এই সময়ের মধ্যে কেবল মায়ের সঙ্গে মন খুলিয়া কথা হয় বলিয়া মাঝে মাঝে অপু এসময়ে ঘরে আসে। তাহার মা তাহাকে একবার করিয়া দিনের মধ্যে চায়। এ বাড়িতে আসা পর্যন্ত অপু যেন দূরে চলিয়া গিয়াছে। সারাদিন খাটুনি আর খাটুনি-ছেলের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে হয়। বহু রাত্রে কোজ সারিয়া আসিতে অপু ঘুমাইয়া পড়ে, কথা হয় না। এই দুপুবটার জন্য তার মন তৃষিত হইয়া থাকে।

দোরে পায়ের শব্দ হইল। সর্বজয়া বলিল-কে, অপু! আয়-দোর ঠেলিয়া বামনী মাসি ঘরে ঢুকিল। সর্বজয়া বলিল-আসুন, মাসিম বসুন। সঙ্গে সঙ্গে অপুও আসিল। বামনী মাসি বাবুদের সম্পর্কে আত্মীয়া। কাজেই তাঁহাকে খাতিব করিয়া বসাইল। বামনী মাসির মুখ ভারী-ভারী। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল-দেখলে তো আজ কাণ্ডখানা বড়-বৌমার? বলি কি দোষটা, তুমি তো বরাবরই বুগির ঘরে ছিলে? মাছ, ঘি এনে চুপড়িতে করে রেখে গেল, আমি ভাবলাম বাঁধাকপিতে বুঝি-কি রকম অপমানটা দেখলে তো একবার? পোলোয়ার মাছ তো সে কথা বিকে দিয়ে বলে পাঠালে তো হত। সন্দু বিও কি কম বদমায়েশের ধাড়ি নাকি?.. গিন্নির পেয়ারের ঝি কিনা? মাটি মাড়িয়ে চলে না, ওপরে গিয়ে সাতখানা করে লাগায়। –ওই তো ছিরিকণ্ঠ ঠাকুরও ছিল—বলুক দিকি? গল্প করিতে করিতে বেলা যায়। মাসি বলে, যাই জলখাবারের ময়দা মাখি গো-চারটে বাজালো–

মাসি চলিয়া গেলে অপু মায়ের কাছে ঘেঁষিয়া বসিল। তাহার মা আদর করিয়া চিবুকে হাত দিয়া বলিল—কোথায় থাকিস দুপুরে বলা তো?...

অপু হাসিয়া বলিল-ওপরের বৈঠকখানা ঘরে কলেব গান বাজাচে মা-শুনছিলাম–ওই বারান্দাটা থেকে–

সর্বজয়া খুশি হইল।

–হ্যাঁরে, তোর সঙেগ বাবুদের ছেলেদের ভাব-সাব হয় নি?...তোকে ডেকে বসায়?

–খু-উ-উব!...

অপু এটা মিথ্যা বলিল। তাহাকে ডাকিয়া কেহ বাসায় না। ওপরের বৈঠকখানাতে গ্রামোফোন বাজানোর শব্দ পাইলেই খানিকটা ইতস্তত করিয়া পরে ভয়েভয়েউপরে উঠিয়া যায় ও বৈঠকখানার দোরের পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া গান শোনে। প্রতি মুহুর্তেই তাহার ভয় হয় এইবার হয়তো উহারা তাহাকে বলিবে নিচে চলিয়া যাইতে। গান শেষ হইলে নিচে নামিবার সময় ভাবে– কেউ তো কিছু বক্‌লে না? কেন বক্‌বে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনি বাইরে, আমি তো বাবুদের ঘরের মধ্যে যাচ্ছি নে? এরা ভালো লোক খুব–

এ বাড়ির ছেলেদের সঙ্গেও তার মেলামেশা হইল না। তাহারা উহাকে আমলই দেয় নাই। সেদিন রমেন, টেবু, সমীর, সন্তু-ইহারা একটা চৌকা পিড়ির মতো তক্তা সামনে পাতিয়া কাঠের কালো কালো গুটি চলিয়া এক রকম খেলা খেলিতেছিল, নাম নাকি ক্যাবাম খেলা—সে খানিকটা দূরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খেলোটা দেখিতেছিল–তার চেয়ে বেগুনবিচি খেলা ঢের ভালো।

বৈশাখেব প্রথমে বড়বাবুর মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে বাড়ি সরগরম হইয়া উঠিল। গয়া, মুঙ্গের, এলাহাবাদ, কলিকাতা, কাশী নানাস্থান হইতে কুটুম্ব-কুটুম্বিনীদের আগমন শুরু হইল। সকলেই বড়লোকের ঘরের মেয়ে ও বড়ঘরের বধূ, প্রত্যেকের সঙ্গে নিজেদের ঝি-চাকর আসিয়াছে নিচের তলার দালান-বারান্দা রাত্রে তাহারাই দখল করে। সারারাত্রি হৈ চৈ।

সকালে সর্বজয়াকে ডাকিয়া গিন্নি বলিলেন—ও অপূর্বের মা, তুমি এক কাজ করো, এখন দিন দুই রান্নাঘরের কাজ তোমার থাকুক, নানান জায়গা থেকে তত্ত্ব আসচে, তুমি আর ছোট মোক্ষদা সে সবগুলো গুছিয়ে তোমাদের বুটির ঘরের ভঁড়ারে তোলাপাড়া করো-মিষ্টি খাবার ওখানেই রেখো, ফল-ফুলুরি যা দেখবে পাঁচবার মতো, সদৃঝির হাতে পাঠিয়ে দেবে, নয়তো রেখে দিয়ো, জলখাবারের সময় নিয়ে আসলে বামনী মাসি–

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিস্ত-বেহারাদের মাথায় কত জায়গা হইতে যে কত তত্ত্ব আসিতে লাগিল সর্বজয়া গুনিয়া সংখ্যা করিতে পারে না। মিষ্টান্নের জায়গা দিতে পারা যায় না, ছোট ছোট রূপার চন্দনের বাটি জমিয়া গেল পনেরো-ষোলটা। আমি এখনও উঠে নাই, তবুও একটা বড় ধামা আমে বোঝাই হইয়া গেল।

সর্বজয়া বামনী মাসির হাতে খাবার তুলিয়া দিতে দিতে ভাবে -এই এত ভালোমন্দ, এত কাণ্ড, তাই কি ছেলেটার জন্যে কিছু-আহা, বাছা আমার সরকারীদের খাবার ঘরের কোণটায় কাঁচুমাচু হয়ে বসে দুটো ভাত খাম, না দিতে পারি পাতে দুখানা ভালো দেখে মাছ, না একটু ভালো তরকারি, না এক হাত দুধ – তখখুনি ওই সদু হারামজাদী লাগবে নিজের ছেলের পাতে বাবুদের হেঁসেল থেকে সব–

বিবাহের দিন খুব ভিড়। বাবপক্ষ সকালের গাড়িতে আসিয়া পৌঁছিয়া শহরের অন্য এক বাড়িতে ছিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা করিয়া বর আসিল।

বাহিরের উঠান নিমন্ত্রিতাদের দলে ভরিয়া গিয়াছে। সারা উঠানটাতে শতরঞ্চি পাতা, এক কোণে চওড়া জরিপাড় লাল মখমলে মোড়া উঁচু ববাসন, জুরির ঝালরী-দোলানো নীল সাটিনের চাদোষা, দুপাশে কিংখাবের তাকিয়া, বড় বড় বেলফুলেব মালা তিনগাছ করিয়া চাঁদোয়ার খিলানে খিলানে টাঙানো। চারিপাশে বরযাত্রীগণের চেয়ার ও কৌচ। বিলাতি সেন্ট ও গোলাপ জলের পিচকারি ঘন ঘন ছুটিতেছে।

অপু এ সমস্ত বিশেষ কিছু দেখে নাই, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। একবার মাত্র সে বাড়ির মধ্যে গিয়াছিল, তখন স্ত্রী-আচার হইতেছে, রাত্রি অনেক! মাকে কোথাও খুঁজিয়া পাইল না, উৎসবের ভিড়ে কে জানে কোথায় কি কাজে ব্যস্ত আছে। দামি বেনারসী শাড়ি-পরা মেয়েদের ভিড়ে উঠানের কোথাও এতটুকু স্থান ফাঁকা নাই। ছোটবাবুর মেয়ে অরুণা কাহাকে ডাকিয়া বাহিরের বৈঠকখানা হইতে বড় অর্গানটা বাড়ির ভিতর আনিতে বলিতেছে।

বিবাহের দিন দুই পরে শখের থিয়েটার উপলক্ষে আবার খুব হৈ চৈ! উঠানের এক কোণে স্টেজ বাঁধা হইয়াছে। গোলাপফুলে ও আর্কিডে স্টেজটা খুব চমৎকার সাজানো! পাঁচশত ডালের প্রকাণ্ড ঝাড়টা স্টেজের মধ্যে খাটানো হইল।এ কয়দিনের ব্যাপারে তো একেই অপুর তাক লাগিয়াছে, আজকার থিয়েটার জিনিসটি কি সে আদৌ জানে না, আগ্রহ ও কৌতূহলের সহিত পূর্ব হইতেই ভালো জায়গাটি দখল করিয়া রাখিবার জন্য সে আসরের সামনের দিকে সন্ধ্যা হইতে বসিয়া রহিল।

ক্রমে ক্রমে একে একে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা আসিতে লাগিলেন, চারিদিকে আলো জ্বলিয়া উঠিল। বাড়ির দারোয়ানেরা জরির উর্দি পরিয়া আসরের বাহিরে ও দরজার কাছে দাঁড়াইল। সরকার ইতস্তত দুটাছুটি করিয়া কাজ দেখাইতে লাগিল। কনসার্ট আরম্ভ হইল। যখন ড্রপসিন উঠিবার আর বেশি দেরি নাই, বাড়ির গোমস্ত গিরিশ সরকার তাহার কাছে আসিয়া নিচু হইয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল-কে? অপু মুখ উঁচু করিয়া চাহিয়া দেখিল কিন্তু মুখচোরা বলিয়া খানিকক্ষণ কথা কহিতে পারিল না।

তাহাকে জবাব দিবার অবকাশ না দিয়াই গিরিশ সরকার বলিল-ওঠো, ওঠো, এখানে বাবুরা বসবেন-ওঠো-গিরিশ সরকার আন্দাজে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল।

অপু পিছনে চাহিয়া বিপন্নমুখে নামতা পড়ার সুরে বলিল-আমি সন্দে থেকে এইখানটায় বসে আছি, পেছনে যে সব ভর্তি, কোথায় যাবো?...তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে গিরিশ সরকার তাহার হাতের নড়া ধরিয়া জোরে ঝাঁকুনি দিয়া উঠাইয়া দিয়া বলিল—তোর না কিছু করেছে, জ্যাঠা ছোকরা কোথাকার, জ্ঞান নেই, একেবারে সামনে-বাবুরা বসবেন, উনি রাঁধুনীর ব্যাটা এসেছেন মুখের কাছে বসতে! কোথায় যাবো ওঁকে বলে দাও-ফাজিল জ্যাঠা কোথাকার-যা এখান থেকে যা, ওইথামটার কাছে বসগে, যা কোথাও–

পিছন হইতে দু'একজন কর্মকর্তা বলিলেন–কি হয়েচে, কি হয়েচে গিরিশ-কিসের গোল? কে ও?

-এই দেখুন না ম্যানেজারবাবু, এই জ্যাঠা ছোকরা বাবুদের এখানে এসে বসে আছে, একেবারে সামনে-চন্দননগরের ওঁরা এসেচেন, বসাবার জায়গা নেই।–উঠতে বলচি, আবার মুখোমুখি তর্ক!

ম্যানেজারবাবু বলিলেন–দাও না দুই থাপ্পড় বসিয়ে–

অপু জড়সড় হইয়া কোনো দিকে না চাহিয়া অভিভূতের মতো আসরের বাহির হইয়া আসিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল আসরের সকলের চোখ তাহার দিকে, সকলেই কৌতূহলের সহিত তাহার দিকে চাহিয়া আছে! প্রথমটা ভাবিল হঠাৎ এক দৌড় দিয়া সে এখনই এক আসর লোকের চোখের আড়ালে যে কোনো জায়গায় ছুটিয়া পলায়। তাহার পর সে গিয়া এক থামের আড়ালে দাঁড়াইল। তাহার গা ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছিল ভয়ে; অপমানে, লজ্জায়, তাহার সূক্ষ্ম অনুভূতির পর্দাগুলিতে হঠাৎ বেখাপ্পা গোছের কাঁপুনি লাগিয়াছিল। একটু সামলাইয়া লইয়া থামের আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল. কিন্তু চারিধারে চাকর-বাকর, ওপরের বারান্দায় চিকের আড়ালে মেয়েরা, বিরাঁধুনীরা নিচের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে-তাহারা তো সকলেই ব্যাপারটা দেখিয়াছে, কি মনে করিতেছে। উহারা! না জানিয়া কি কাণ্ডই করিয়া বসিয়াছে! সে তো জানে না। ওটা বাবুদের জায়গা! সে বার বার মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল। তাহাকে সম্ভবত কেহ চিনিতে পারে নাই। কে না কে, কত তো বাইরের লোক আসিয়াছো-কে তাহকে চিনিয়াছে?

তাহার পর থিয়েটার আরম্ভ হইয়া গেল। সেদিকে তাহার লক্ষ্যই রহিল না। সম্মুখের এই লোকের ভিড়, বদ্ধ বায়ু, আলোর মেলা, দারোয়ান চাকরের হৈচৈ-কোনোদিকে

তাহার খেয়াল রহিল না! ছটু খানসামা একটা রূপার হাঁসের পানদান লইয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সারিতে পান বিলি করিতেছিল-সেইটার দিকে চাহিয়া অপুর গা যেন কেমন করিয়া উঠিল। ওপরের ঘেরা বারান্দার দিকে চাহিয়া ভাবিল, ওদিকে মা নাই তো? যদি মা একথা জানিতে পারে? কিন্তু অপুর ভয় সম্পূর্ণ অমূলক, তাহার মা তখন সে অঞ্চলেও ছিল না, এসব কথা তাহার কানেও যায় নাই।

# ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পরের বাড়ি নিতান্ত পরাধীন অবস্থায় চোরের মতো থাকা সর্বজয়ার জীবনে এইপ্রথম। সুখে হৌক, দুঃখে হৌক, সে এতদিন এক ঘরের এক গৃহিণী ছিল। দরিদ্র সংসারের রাজরানী—সেখানে তাহার হুকুম এই এত বড় বাড়ির গৃহিণী, বৌ-রানীদের চেয়ে কম কার্যকরী ছিল না। এ যেন সর্বদা জুজু হইয়া থাকা, সর্বদা মন যোগাইয়া চলা, আর একজনের মুখের দিকে চাহিয়া পথ হাঁটা, পান থেকে চুন না খসে!-ছোেটর ছোট তস্য ছোট!”. এ তাহার অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। খাটিতে খাটিতে মুখে রক্ত ওঠে-কিন্তু এখানে খাটার মূল্য নাই। প্রাণপণে খাটো-কেহ নাম করিবার নাই। উহারা যখন দিবে তখন গর্বের সঙ্গে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে—তোমার খাটার মূল্য দিতেছে বলিয়া সমানে সমানে দিবে না। তোমাকে হাঁটু গাড়িয়া লইতে হইবেই।

এ ক্রমে তাহার অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু উপায় কি?...বাহিরে যাইবার সুবিধা কই? আশ্রয় কে দিবে? কোথায় দাঁড়াইবে?...

চিরকাল এইরকম কাটিবে? যতদিন বাঁচিবে ততদিন? ওই বামনী মাসির মতো?...

বিবাহের উৎসবের জের এখনও মেটে নাই, আজ মেয়েদের প্রীতিভোজ, সন্ধ্যার পর হইতেই নিমন্ত্রিত মহিলাদের গাড়ি পিছনের গেটে আসিতে শুরু করিল। ভিতরের বড় দরজা পার হইয়া সম্মুখেই মেয়ে-মহলের দোতলার বারান্দায় উঠিবার চওড়া মার্বেলের সিঁড়িটা নীলফুলের কাজ-করা কার্পেট দিয়া মোড়া। সারা বারান্দাতে ও সিঁড়িতে গ্যাসের আলো, দোতলার বারান্দায় উঠিবার মুখে বড় গ্যাসের ঝাড় জ্বলিতেছে। দুই বৌ-রানী ও বাড়ির মেয়েরা অভ্যর্থনা করিয়া সকলকে উপরে পাঠাইয়া দিতেছিলেন। নিমন্ত্রিতা মেয়েরা কেহ মুচকি হাসিয়া, কেহ হাসির লহর তুলিয়া কেহ ধীর, কেহ ক্ষিপ্র, কেহ সুন্দর অপূর্ব গতি-ভঙ্গিতে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছেন।

অপু অনেকক্ষণ হইতে নিচের বারান্দায় একটা থামের কাছে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। এ ধরনের দৃশ্য জীবনে সে এই প্রথম দেখিল, সেদিন বিবাহের রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িবার দরুন সে বিশেষ কিছু দেখে নাই। সকলের চেয়ে তাহার ভালো লাগিতেছিল এ বাড়ির মেয়ে সুজাতাকে। সে কার্পেট-মোড়া মার্বেল পাথরের সিঁড়ি বাহিয়া এক-একবার নামিয়া আসিতেছে, নিমন্ত্রিতাদের মধ্যে কাহারও দিকে চাহিয়া হাসিমুখে বলিতেছে-বা বেশ তো মণি-দি? একেবারে রাত আটটা কোরে? বকুলবাগানের বৌদি এলেন না?

অভ্যর্থিতা সুন্দরী হাসিয়া বলিলেন-গাড়ি সাজিয়ে বসে আছি বেলা ছটা থেকে...বেবুনো তো সোজা নয়। ভাই, সব তৈরি না হলে তো... জানোই তো সব

সুজাতা কাঞ্চনফুল রং-এর দামি চায়না কেপের হাতকটা জামার ফাঁক দিয়া বাহির হওয়া শুভ্র, সুগোল, নিটোল বাহু দিয়া পিছন হইতে নিমন্ত্রিতাকে বেষ্টন করিয়া আদরের ধরনে তঁহার ডান কঁধে মুখ রাখিয়া একসঙ্গে উপরে উঠতে লাগিল। বলিতে বলিতে চলিল-মা বলছিলেন বকুলবাগানের বৌদি নাকি সামনের মাসে যাবেন কলকাতা-বুধবারে মা গেছলেন যে-ঠিক কিছু হল?

সিঁড়ির ওপরের ধাপে মেজ বৌ-রানী দেখা দিলেন। বয়স একটু বেশি, বোধ হয় ত্রিশের উপর, অপূর্ব সুন্দরী। র্তার বেশের কোনো বাহুল্য নাই, ফিকে চাঁপা রং-এর চওড়া লালপাড় রেশমী শাড়ির প্রান্ত মাথার চুলে হীরার ক্লিপ দিয়া আঁটা, সিঁড়ির বড় ঝাড়ের আলোয় গলার সরু সোনার চেন চিক চিক্ করিতেছিল, সুন্দর গড়ন, একটু ধীর, গভীর-এই বয়সেও দুধে আলতা রং-এর আভা অপূর্ব। মার্সখানেক হইল উপযুক্ত ভাই মারা যাওয়াতে একটুখানি বিষাদের ছায়া পরিণত মুখের সৌন্দর্যকে একটি সংযত শ্রী দান করিয়াছে।

মণি-দি উঠিতে উঠিতে মেজ বৌ-রানীকে সম্মুখে দেখিয়া সিঁড়ির ওপরই দাঁড়াইয়া গেলেনমেজ বৌদির শরীর আজকাল কেমন আছে? এই দেখুন না, একবার আসবো আসবো করে. কাল ওঁরা এটোয়া থেকে সব এলেন, তাই নিয়ে অনেক রাত অবধি…

এত সুন্দর দেখিতে মানুষ হয়, অপুর এ ধারণা ছিল না। অপুইহাকে এই প্রথম দেখিল কারণ ইনি এতদিন এখানে ছিলেন না, ভাইয়ের মৃত্যুর পর সবে দিনকয়েক হইল বাপের বাড়ি হইতে আসিয়াছেন—সে মুগ্ধ চোখে আপলক বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। এই আলো, চারিধারে সুন্দরীর মেলা, দামি পুষ্পসারের মৃদু, মনমাতানো সৌরভ, বীণার ঝংকারের মতো সুর ও হাসির লহরীতে তাহার কেমন এক নেশা জমিয়া গেল। এই যদি সারাদিন চলে?…

মেজ বৌ-রানী অনেকক্ষণ হইতে দেখিতেছিলেন সিড়ির কোণে একজন অপরিচিত ছেলে দাঁড়াইয়া আছে। সকলকে তিনি জানেন না-র্তাহার বোপও খুব বড়লোক, প্রায়ই বাপের বাড়ি থাকেন। দু’ধাপে নামিয়া আসিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন-খোকা, এসো উঠে। দাঁড়িয়ে কেন? তুমি কোথেকে আসচ?…

অপু অন্যদিকে চাহিয়া অন্য একদল আগন্তুকদের লক্ষ করিতেছিল-হঠাৎ ফিরিয়া চাহিয়া তাহাকেই মেজ বৌ-রানী ডাকিতেছিলেন দেখিয়া প্রথমটা বিস্মিত হইল-যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না। পরে রাজ্যের লজ্জা আসিয়া জুটিতেই সে উপরে উঠিয়া যাইবে কি ছুটিয়া পলাইবে ভাবিতেছে- এমন সময় মেজ বৌ-রানী নিজেই নামিয়া আসিলেন-কাছে আসিয়া বলিলেন–কোথেকে আসচ খোকা?…

অতি কষ্টে অনেক চেষ্টায় অপুর মুখ দিয়া বাহির হইল-আমি-আমি-ওই-আমার মা–এই বাড়ি থাকেন-সঙ্গে সঙ্গে তাহার অত্যন্ত ভয় হইল যে, এখানে সে দাঁড়াইয়া আছে-কোথাকার রাধুনীর ছেলে–একথা শুনিয়া এখনই হয়তো ইনি কাহাকেও ডাকিয়া বলিবেন-ইহাকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দাও এখান থেকে!...

মেজ বৌ-রানী কিন্তু সে সব কিছুই করিলেন না-তিনি বিস্মিত মুখে বলিলেন–এ বাড়ি থাকেন তোমার মা?... কে বলো তো.. কি করেন? কতদিন তোমরা এসেচ?

অপু ভাঙা ভাঙা কথায় আবোলতাবোল ভাবে পরিচয় দিল। মেজ বৌ-রানী বোধ হয় ইহাদের কথা এবার আসিয়া শুনিয়াছেন—বলিলেন -ও তোমরা কাশী থেকে এসেছ বুঝি?...কি নাম তোমার?–তাহার সুন্দর, সরল চোখের দিকে চাহিয়া তাঁহার বোধ হয় কেমন করুণা হইল। বলিলেন–এসো না ওপরে দাঁড়াবে-এখানে কেন?—ওপরে এসো–

অপু চোরের মতো বৌ-রানীর পিছনে পিছনে উপরে উঠিয়া কোণ ঘোষিয়া দাঁড়াইয়া রহিল!

উপরে মেয়েদের বড় মজলিশ, সারা বারান্দাটা কার্পেট-মোড়া! ধারে পারে বড় বড় কাঁচকড়ার টবে গোলাপ গাছ, এরিকা পাম। কোণে বড় বৈঠকখানার অর্গানটা। একটি মেয়ে খানিকক্ষণ সাধাসাধির পর অগ্যানের ধারে ছোট গদি-আঁটা টুলে গিয়া বসিলেন ও দু' একবার হালকা হাতে চাবি টিপিয়া-খানিকক্ষণ চুপ করিয়া হাসিমুখে একটি গান ধরিলেন; মেয়েটি দেখিতে সুশ্রী নয়, রংটা মাঝামাঝি, কিন্তু গানের গল; ভাবি সুন্দর। তাহার পর আর একটি মেয়ে গান গাহিলেন, এ মেয়েটি দেখিতে তত ভালো নয়।মেজ বৌ রানীর মেয়ে লীলা একটি হাসির কবিতা ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে আবৃত্তি করিয়া সকলকে খুব হাসাইল। ভারি সুন্দর মেয়ে, মায়ের মতো সুশ্রী। আর কি মিষ্টি হাসি।

অপু ভালিতেছিল। এই সময় তাহার মা একবার উপরে আসিয়া দেখিল না কেন? কোথায় রহিল মা কোন রান্নাঘরে পড়িয়া, হয়তো কাজ করিতেছে, এ সব মা আর কোথায় দেখিতে পাইবে? মেয়েদের মজলিশ চলিতেছে, এমন সময় নিচে এক হৈচৈ উঠিল। গিরিশ সরকারের গলাটা খুব শোনা যাইতেছিল।

সদু ঝি হাসিতে হাসিতে উপরে উঠিয়া বলিল-পোড়ানি! কাণ্ড দ্যাখো... হি হি, বলে কিনা হুঁকোর মধ্যে...হি হি...।

দুই-তিনজন নিমন্ত্রিত মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন–কি হয়েচে রে? কি?

—-ওই ঠিকে ঠাকুর একটা এসেছিল কেত্থেকে…লুচি ভাজতে গিয়েচে…সরকারদের খাবার ঘরের উঠোনে বসে লুচি ভাজচে… বলে আসি বাইরে থেকে একবার… হুঁকোর মধ্যে… হিহি… নিয়ে যাচ্ছে পুরে চুরি করে… আধাসেরের ওপর… গোমস্ত মশায় ধরেচে… রামনিহোর সিং মার যা দিচ্চে…চুলের ঝুঁটি না ধরে

সর্বজয়ার আজ সকাল হইতে নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ ছিল না। প্রায় দুই মন মাছ ভাজার ভার তার একার উপর-সকল আটটা হইতে সে মাছের ঘরে এই কাজেই লাগিয়া আছে। চেঁচামেচি শুনিয়া সে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল এক উঠান লোকের মধ্যে একজন পঁচিশ-ত্রিশ বছরের পাতলা ময়লা রং-এর ময়লা কাপড়-পরা বামুনের ছেলেকে দু-তিনজনে মিলিয়া কেহ কিল, কেহ চড় বর্ষণ করিতেছে-লোকটা ঠিকে রাঁধুনী, আদ্যকার কার্যের জন্যই বাহির হইতে আসিয়াছিল—সে নাকি হুঁকার ভিতর করিয়া ঘি চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার সে হুঁকাটি একদিকে ছিটকাইয়া ঘিটুকু উঠানের একদিকে পড়িয়া গিয়াছে-কাছা মারের চোটে খুলিয়া গিয়াছে–লোকটা বিপন্নভাবে সাফাই গাহিবার চেষ্টা করিতেছে এবং হুঁকার ভিতরে ঘৃত পাওয়া একটা যে খুব স্বাভাবিক এবং নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা বা ইহার মধ্যে সন্দেহের বা আশ্চর্য হইবার কথা কিছুই নাই-এই কথা উন্মত্ত জনসঙঘকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে। কথা শেষ না করিতে দিয়াই শম্ভ্রনাথ সিং দারোয়ান তাহাকে এমন এক ঠেলা মারিল যে, সে অস্পুট স্বরে 'বাবা রে' বলিয়া দালানের কোণের দিকে ঘুরিয়া পড়িয়া গেল এবং থামের কোণে মাথাটা ঠিক করিয়া জোরে লাগিয়া বোধ হয় রক্তও বাহির হইল।সর্বজয়া ক্ষেমি ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল–কি হয়েচে ক্ষেমিমাসি?… আহা, ওরকম করে মারে?… বামুনের ছেলে…

ক্ষেমি বলিল-মারবে না! হাড় গুঁড়ো করে ছাড়বে… মারার হয়েছে কি এখনও… পুলিশে দেবে, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা–

ক্ষেমি ঝির মুখের কথা মুখেই বুহিয়া গেল।

সে উপরে উঠিবার সিঁড়ির দিকে চাহিয়াই তটস্থ অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল! সর্বজয়া চাহিয়া দেখিল একজন পঁয়ষট্টি-সত্তর বছরের বৃদ্ধা সিঁড়ি বাহিয়া নমিতেছেন, পাশাপাশি গৃহিণী, পিছনে দুই বৌ-রানী ও এ বাড়ির মেয়ে অরুণা ও সুজাতা। সকল ঝি চাকরের দল তটস্থ অবস্থায় সিঁড়ির নিচের বারান্দায় কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া-এ উহার পিঠে উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। সর্বজয়া ক্ষেমি ঝিকে চুপি চুপি বলিল, কে ক্ষেমিমাসি? ক্ষেমি ঝি ফিসফিস করিয়া কি বলিল— কোথাকার রানীমা— সর্বজয়া ভালো শুনিতে পাইল না। কিন্তু তহার মনে হইল ঠিক এইরকম চেহারার মানুষ সে যেন কোথায় আগে দেখিয়াছে। গিন্নি কাহাকে বলিলেন—খিড়কির ফটকে ইঁহার

পালকি আসিয়াছে কিনা দেখিয়া আসিতে। বৃদ্ধার নিজের সঙ্গে দুই তিনটি ঝি আসিয়াছে, তাহারা পিছনে পিছনে আছে। নানা বিদায় আপ্যায়নের বিনিময় হইল, বহু বিনীত হাস্য বিস্তার লাভ করিল, হঠাৎ এ বাড়ির ঝি-চাকরের দল মাটিতে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া খানিকক্ষণ যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া রহিল। সর্বজয়া মনে মনে ভাবিল—এরা এর বড়লোক, এরা যখন এত খাতির করচে, তখন তো যে সে নয়…! বুদ্ধার ষোল বেহারার প্রকাণ্ড পালকিটা খিড়কির ফটকেই এতক্ষণ ছিল, বুদ্ধাও পালকিতে উঠিলেন। তাহার দারোয়ানেরা পালকির সামনে পিছনে দাড়াইল। তাঁহাকে বিদায় দিয়া গৃহিণী, অন্যান্য মেয়েরা উপরে উঠিয়া গেলেন।

মাসিমা রুটির ঘরে আসিয়া চুপি চুপি বলিলেন-পয়সা রে বাপু, দেখলে তো পয়সার আদরটা? নিজেরই মস্ত জমিদারি, দুলাখ টাকা দান করেছেন, বাঙাল দেশের কোথাকার কলেজের জন্যে—পয়সারই আদর—আর এই তো আমিও আছি…ওদের তো আপনার লোক…গেরাজ্জি করে কেউ!

সর্বজয়ার কিন্তু সেদিকে মন ছিল না। এই মাত্র তাহার মনে পড়িয়াছে; অনেকটা এই রকম চেহারার ও এইরকম বয়সের–সেই তাহার বুড়ি ঠাকুরঝি ইন্দির ঠাকরুন, সেই ছেড়া কাপড় গেরো দিয়া পরা, ভাঙা পাথরে আমড়া ভাতে ভাত, তুচ্ছ একটা নোনাফলের জন্য কত অপমান, কেউ পোঁছে মা, কেউ মানে না, দুপুর বেলায়, সেই বাড়ি হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া, পথে পড়িয়া সেই দীন মৃত্যু…

সর্বজয়ার অশ্রু বাধা মানিল না।

মানুষের অন্তর-বেদনা মৃত্যুর পরপারে পৌঁছায় কিনা সর্বজয়া জানে না, তবু সে আজ বার বার মনে মনে ক্ষমা চাহিয়া অপরিণত বয়সের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিল।

# চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কয়েকদিন পরে অপু দালান দিয়া যাইতেছে, উপরের সিঁড়ি বাহিয়া মেজ বৌ-রানীর মেয়ে লীলা নামিতেছিল। তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিল–দাঁড়াও না? তোমার নাম কি-অপু না কি?

অপু বলিল-অপু বলে মা ডাকে–ভালো নাম শ্রীঅপূর্বকুমার রায়…

সে একটু অবাক হইল। এ বাড়ির ছেলেমেয়েরা কখনও ডাকিয়া তাহার সঙ্গে কথা কহে নাই। লীলা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কি সুন্দর মুখ। রানুদি, অতসীদি, অমলাদি, সকলেই দেখিতে ভালো বটে। কিন্তু তখন সে তাহাদের চেয়ে ভালো কাহাকেও দেখে নাই। এ বাড়ি আসিয়া পর্যন্ত তাহার পূর্বেকার ধারণা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া মেজ বৌ-রানীর মতো সুন্দর কোনো মেয়ে কল্পনাও সে করে নাই। লীলাও মায়ের মতো সুন্দরী-সেদিন যখন লীলা মেয়ের মজলিশে হাসির কবিতা বলিতেছিল, তখন অপু একদৃষ্টি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, কবিতা সে ভালো শোনে নাই।

লীলা বলিল-তোমরা কতদিন এসেচ আমাদের বাড়ি? সেবার এসে তো দেখিনি?

-আমরা ফাল্গুন মাসে এইচি, এই ফাল্গুন মাসে–

–কোথেকে এসেচ তোমরা?

–কাশী থেকে। আমার বাবা সেইখানেই মারা গেলেন কিনা-তাই–

অপুর যেন বিশ্বাস হইতেছিল না। সারা ঘটনাটা এখনও যেন অবাস্তব, অসম্ভব ঠেকিতেছিল। লীলা, মেজ বৌ-রানীর মেয়ে লীলা তাহাকে ডাকিয়া যাচিয়া তাহার সঙ্গে কথা কহিতেছে! খুশিতে তাহার সারা গা কেমন করিতে লাগিল!

লীলা বলিল-চলো, আমার পড়ার ঘরে গিয়ে বসি, মাস্টার মশায়ের আসবার সময় হয়েচে—এসো–

অপু জিজ্ঞাসা করিল-আমি যাবো?

লীলা হাসিয়া বলিল-বারে, বলচি তো চলো, তুমি তো ভারি লাজুক?—এসো-তুমি দেখোনি আমার পড়ার ঘর? ওই পশ্চিমের দালানের কোণে?…

ঘর বেশি বড় নয়। কিন্তু বেশ সাজানো। একটি ছোট পাথরের টেবিলের দুপাশে দুখানা চামড়ার গদি-আঁটা চেয়ার পাতা। একখানা বড় ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডার। সবুজ কাঁচকড়ার খোলে একটা ছোট টাইমপিস ঘড়ি। একটা বই রাখিবার ছোট দেরাজ। চার-পাঁচখানা বাঁধানো ফটোগ্রাফ এ দেওয়ালে, ও দেওয়ালে। লীলা একটা চামড়ার অ্যাটাশি কেস খুলিয়া বলিল—এই দ্যাখো আমার জলছবি, মাস্টার মশায় কিনে দিয়েছেন, ভাগ শিখলে আরও দেবেন, জলছবি ওঠাতে জানো?

অপু বলিল-তুমি ভাগ জানো না??

—তুমি জানো? ভাগ কষেচ?

অপু তাচ্ছিল্যের সহিত ঠোঁট উলটাইয়া বলিল-কবে!...

এই ভঙ্গিতে অপুর সুন্দর মুখখানি আরও ভারি সুন্দর দেখাইল।

লীলা হাসিয়া উঠিয়া বলিল-তুমি বেশ মজার কথা বলতে পারো তো? পরে সে অপুর ঠোঁটের নিচে হাত দিয়া বলিল-এটা কি? তিল? বেশ দেখায় তো তোমার মুখে, তিলে বেশ মানিয়েচে, তোমার বয়স কত? তেরো? আমার এগারো–তোমার চেয়ে দু'বছরের ছোট–

অপু বলিল-তুমি সেদিন মুখস্ত বলেছিলে, সেই একটা হাসির ছড়া, বেশ লেগেচে আমার–

–তুমি জানো কবিতা?

-জানি-বাবার একখানা বই আছে, তা থেকে শিখিচি—

–বলো দিকি?

লীলার গলার সুর কি মিষ্টি, এমন সুর সে কোনো মেয়ের এ পর্যন্ত শোনে নাই।

অপু ঘাড় দুলাইয়া বলিল–

যে জনের খড় পেতে খেজুর চেটায় ঘুমিয়ে কাল কাটে, ।
তাকে খাট-পালঙ্ক থাসা মশারি খাটিয়ে দিলে কি খাটে?

কথার শেষে সে জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ে। বলিল-দাশু রায়ের পাঁচালীর ছড়া, আমার কাছে বই আছে–

লীলা হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে আর কি। বলিল-তুমি ভারি মজার কথা জানো তো? এমন হাসাতে পারো তুমি!...

লীলার মুখের প্রশংসায় অপুর মনে আহ্লাদ ধরে না। সে উৎসাহের সুরে বলিল—আর একটা বলবো? আমি আরও জানি-পরে সে কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া একটুখানি ভাবিয়া লইয়া পরে আবার ঘাড় দুলাইয়া আরম্ভ করে–

মুনির চিন্তা চিন্তামণি নাই অন্য আশা
নিষ্কর্মা লোকের চিন্তা তাস আর পাশা।
ধনীর চিন্তা ধন আর নিরেনব্বই এর ধাক্কা
যোগীর চিন্তা জগন্নাথ, ফকিরের চিন্তা মক্কা,
গৃহস্থের চিন্তা বজায় রাখতে চারি চালের ঠাট্‌টা,
শিশুর চিন্তা সদাই মাকে, পশুর চিন্তা পেট্‌টা।

এ ছড়ার সকল কথার অর্থ লীলা বুঝিতে পারিল না। কিন্তু আবার হাসিয়া গড়াইয়া পড়িবার জোগাড় করিল। বলিল, দাঁড়াও লিখে নেবো–

লীলা অ্যাটাশি কেসটা হইতে একটা কলম বাহির করিয়া বলিল-বলো দিকি?

অপু আবার বলিতে শুরু করিল। খানিকটা পরে একটু অবাক হইয়া বলিল-কালি নেওনি তো লিখচো কেমন করে?

লীলা বলিল—এ তো ফাউন্টেন পেন-কালি তো লাগে না, এর মধ্যে ভরা আছে-জানো না?

অপুর হাতে লীলা কলামটা তুলিয়া দিল। অপু উলটাইয়া-পালটাইয়া দেখিয়া বলিল-এ তো বেশ, কালিতে মোটে ডোবাতে হয় না!

–তা নয়, কালি ভরা থাকে, ভরে নিতে হয়-এই দ্যাখো, দেখিয়ে দি–

–বাঃ বেশ তো! দেখি একবারটি—

লীলা কলমটা অপুর হাতে দিয়া হাসিমুখে বলিল—তোমায় দিয়ে দিলাম একেবারে—

অপু অবাক হইয়া লীলার দিকে চাহিল। পরে লজ্জিতমুখে বলিল-না। আমি নেবো না—

লীলা বলিল—কেন?

–উঁহু—

–কেন?

–নাঃ!

লীলা একটু দুঃখিত হইল। বলিল-নাও না?...আমি আর একটা বাবার কাছ থেকে নেবো, নাও তুমি এটা, দেখি তোমার হাত? বাস!... আর ফেরত দিতে পারবে না।

ব্যাপারটা অপুর সম্পূর্ণ অবাস্তব ঠেকিল। সে বলিল—কিন্তু তোমায় যদি কেউ বকে?

লীলা বলিল-ফাউন্টেন পেন দেবার জন্যে? কেউ বকবে না, আমি মাকে বলবো অপূর্বকে দিয়ে দিলাম-বাবার কাছ থেকে আর একটা নেবো-বাবার ফটো দেখবো?...ওই ক্যালেন্ডারের পাশে টাঙানো-দাঁড়াও পাড়ি–

তাহার পর লীলা আরও দু'তিনখানি ফটো দেখাইল। আলমারি হইতে খানকতক বই বাহির করিয়া বলিল-মাস্টার মশায় কিনে দিয়েছেন—তুমি কোন স্কুলে পড়ো?

অপু কাশীতে সেই যা দিনকতক স্কুলে পড়িয়াছিল, আর ঘটে নাই। বলিল-কাশীতে পড়তাম এখন আর পড়ি না-কথাটা বলিতে সে সংকোচ বোধ করিতেছিল বলিয়াই শেষের কথাটা এমন সুরে বলিল, যেন না পড়িয়া খুব একটা বাহাদুরি করিতেছে। একখানা বইয়ে অনেক ছবি। অপু বলিল-বইখানা পড়তে দেবে একবারটি?

লীলা বলিল-নাও না? আমার আরও অনেক ছবির বই আছে, তিন বছরের বাধানো মুকুল আছে, মায়ের ঘরের আলমারিতে, এনে দেবো, পড়ো—

অপু বলিল–আমার কাছেও বই আছে, আনবো?

লীলা বলিল-চলো, তোমাদের ঘরে যাই—

লীলাকে নিজেদের ঘরে লইয়া যাইতে অপুর লজ্জা করিতে লাগিল। আসবাবপত্র কিছু নাই, ছেড়া বালিশের ওয়াড়, আলনায় গায়ে দেওয়ার কাঁথা। লীলা তবুও গেল। অপু নিজের টিনের বাক্সটা খুলিয়া একখানা কি বই হাসি-হাসি মুখে দেখাইয়া গর্বের সুরে বলিল-আমার লেখা, এই দ্যাখো, ছাপার অক্ষরে লেখা আছে আমার নাম–

লীলা তাড়াতাড়ি হাত হইতে লইয়া বলিল – দেখি দেখি?

সেই কাশীর স্কুলের ম্যাগাজিনখানা। হরিহর ছেলের গল্প ছাপানো দেখিয়া যাইতে পারে নাই, তাহার মৃত্যুর তিন দিন পরে কাগজ বাহির হয়। লীলা পড়িতে লাগিল, অপু তাহার পাশে বসিয়া উৎফুল্ল মুখে লীলার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া পঠিত লাইনগুলি নিজেও মনে মনে একবার করিয়া পড়িয়া যাইতেছিল। শেষ করিয়া লীলা প্রশংসমান চোখে অপুর মুখের দিকে খানিকটা চাহিয়া থাকিয়া বলিল-বেশ তো হয়েছে, আমি এখানা নিয়ে যাই, মাকে দেখাবো।–

অপুর ভারি লজ্জা হইল। বলিল-না—

লীলা শুনিল না। কাগজখানা হাতে করিয়া রাখিল। বলিল–নিশ্চিন্দিপুর লেখা আছে, নিশ্চিন্দিপুর কোথায়?

–নিশ্চিন্দিপুর যে আমাদের গাঁ-সেইখানেই তো আমাদের আসল বাড়ি– কাশীতে তো মোটে বছর খানেক হল আমরা–

এমন সময় ছোট মোক্ষদা দুয়ারের কাছে আসিয়া ঘরের মধ্যে মুখ বাড়াইয়া কহিল– -ওমা দিদিমণি, তুমি এখানে বসে? আমার পোড়ানি! ওদিকে মাস্টারবাবু বসে বসে হয়রান, আমি ওপর নিচে সব ঘর খুঁজে খুঁজে।–তা কে জানে তুমি এঁদো-পড়া কুঠুরিতে–এসো এসো–

লীলা বলিল—যা তুই, আমি যাচ্ছি, যা—

ছোট মোক্ষদা বলিল–তা বসবার কি এই জায়গা নাকি? বলে আমাদেরই তাই মাথা ধরে–তাই কি ওই আস্তাবলের খোট্টা মিন্সেরা ঘোড়ার জায়গাগুলো ঝাঁট দেয়, না ধোয়? উহু-হু, কি গন্ধ আসছে দ্যাখো-এসো দিদিমণি, শিগগির–

লীলা বলিল—যাবে না। যাঃ, আমি আজ পড়বো না, যা বলগে যা—কে তোকে বলেছে এখানে বকবক করতে? যা মাকে বলগে যা–

ছোট মোক্ষদা থর্ থর্ করিয়া চলিয়া গেল। অপু বলিল–তোমার মা বকবেন না? কেন ওকে ওরকম বল্লে?

পরদিন দুপুরে সে নিজেব ঘরে ঘুমাইতেছিল। কাহার ঠেলায় ঘুম ভাঙিয়া চোখ চাহিয়াই দেখিল-লীলা হাসিমুখে বিছানার পাশে। সে মেঝেতে মাদুর পাতিয়া

ঘুমাইতেছিল, লীলা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহাকে ঠেলা মারিয়া উঠাইয়াছে, এখনওসেই ভাবেই কৌতুকপূর্ণ ডাগর চোখে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। হাসিমুখে বলিল-বেশ তো, দুপুর বেলায় বুঝি এমন ঘুমোয়? আমি বা'র থেকে ডাক দিলাম, এসে দেখি খুব ঘুম–

অপু কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। বলিল-সকালবেলা পড়তে আসোনি? আমি তো পড়ার ঘর-টর সব খুঁজে দেখি কেউ কোথাও নেই–

লীলা অপুর স্কুলের সেই কাগজখানা অপুর হাতে দিয়া বলিল-মাকে পড়ে শোনালাম কাল রাত্রে, মা নিজেও পড়ে দেখলেন।

অপুর সারা গা খুশিতে কেমন করিয়া উঠিল। অত্যন্ত লজ্জা ও সংকোচ বোধ হইল। মেজ বৌ-রানী তাহার লেখা পড়িয়াছেন।

লীলা বলিল-এসো আমার পড়ার ঘরে, 'সখা-সখী' বাঁধানো এনে রেখেচি তোমার জন্যে–

অপু আলনার দিকে চাহিল। তাহারা ভালো কাপড়খানা এখনও শুকায় নাই, যেখানা পরিয়া আছে সেখানা পরিয়া বাহিরে যাওয়া যায় না। বলিল-এখন যাবো না–

লীলা বিস্ময়ের সুরে বলিল-কেন?

অপু ঠোঁট চাপিয়া সকৌতুক হাসিমুখে ঘাড় নাড়িল। সে জানে না তাহার মুখ কি অপূর্ব সুন্দর দেখায় এই ভঙ্গিতে।

লীলা মিনতির সুরে বলিল—এসো এসো–

অপু আবার মুখ টিপিয়া হাসিল।

-বাবা, কি একগুঁয়ে ছেলে যে তুমি! না বল্লে আর হ্যাঁ হবার জো নেই বুঝি? আচ্ছা দাঁড়াও, বইটা এখানে–

অপু হাসি চাপিতে না পারিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

লীলা বলিল-অত হাসি কেন? কি হয়েছে বলো-না বলতেই হবে–বলো ঠিক–

অপু আলনার দিকে হাসি ভরা চোখের ইঙ্গিত করিল মাত্র, কিছু বলিল না।

এবার লীলা বুঝিল। আলনার কাছে গিয়া হাত দিয়া বলিল—একটুখানি শুকিয়েছে, তুমি বসো, আমি বইখানা আনি-ফাউন্টেন পেনে লিখচো? কেমন, বেশ ভালো লেখা হয় তো?

তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া লীলার আনা বই দুজনে দেখিল। বই মাদুরে পাতিয়া দুইজনে পাশাপাশি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া উপুড় হইয়া বই-এর উপর ঝুঁকিয়া বই দেখিতেছিল। লীলার রেশমের মতো চিকন নরম চুলগুলি অপুর খোলা গায়েলাগিয়া যেন গা সির সির করে। হঠাৎ লীলা বই হইতে মুখ তুলিয়া বলিল—তুমি গান জানো?

অপু ঘাড় নাড়িল।

–তবে একটা গাও—

—তুমি জানো?

-একটু একটু, কেন বিয়ের দিন শোনোনি?

ছোট মোক্ষদা ঝি ঘরে উঁকি মারিয়া কহিল–এই যে দিদিমণি এখানে। আমিও মনে ভেবেচি তাই, উপরে নেই, পড়ার ঘরে নেই, তবে ঠিক-এসো দিকি, এই দুধ টুকু খেয়ে যাও, জুড়িয়ে গেলা-হাতে করে খুঁজে খুঁজে হয়রান—

রূপার ছোট গ্লাসে এক গ্লাস দুধ! লীলা বলিল-রেখে যা-এসে এর পর গ্লাস নিয়ে যাস–

ঝি চলিয়া গেল। আরও খানিকটা বইয়ের ছবি দেখা চলিল। এক ফাঁকে লীলা দুধের গ্লাস হাতে তুলিয়া বলিল-তুমি খেয়ে নাও আদ্ধেকটা–

অপু লজ্জিত সুরে বলিল-না।

–তোমাকে ভারি খোশামোদ কর্তে হয় সব তাতে-কেন ওরকম? আমাদের মুলতানী গরুর দুধ-খেয়ে নাও-ক্ষীরের মতো দুধ, লক্ষ্মী ছেলে–

অপু চোখ কুচকাইয়া বলিল-ইঃ লক্ষ্মী ছেলে? ভারি ইয়ে কি না? উনি আবার–

লীলা দুধের গ্লাস অপুর মুখে তুলিয়া দিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল-আর লজ্জায় কোজ নেই–আমি চোখ বুজে আছি, নাও–

অপু এক চুমুকে খানিকটা দুধ খাইয়া-ফেলিয়া মুখ নামাইয়া লইল ও ঠোঁটের উপরের দুধের দাগ তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁটে মুছিতে মুছিতে হাসিয়া ফেলিল।

লীলা গ্লাসে চুমুক দিয়া বাকি দুধ টুকু শেষ করিল, পরে সেও খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বেশ মিষ্টি দুধ, না?

–আমার এঁটো খেলে কেন? খেতে আছে পরের এঁটো?

-আমার ইচ্ছে-একটুখানি থামিয়া কহিল-তুমি বল্লে জলছবি তুলতে জানো, ছাই জানো, দাও তো আজ আমার ক'খানা জলছবি তুলে?

# পঞ্চস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সর্বজয়া চাহিয়া-চিন্তিয়া কোনো রকমে অপুর উপনয়নের ব্যবস্থা করিল। পরের বাড়ি, ঠাকুর-দালানের রোয়াকের কোণে ভয়ে ভয়ে কাজ সারিতে হইল। বাম্‌নী মাসি নাড়ু ভাজিতে সাহায্য করিল, দু'একজন রাঁধুনী-বামুনঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল, বাহিরের সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্যে বীবু গোমস্তা ও দীনু খাতাঞ্জি। উপনয়ন মিটিয়া যাওয়ার দিনকতক পরে অপু নিজের ঘরটিতে বসিয়া বসিয়া লীলার দেওয়া বাঁধানো 'মুকুল' পড়িতেছিল। খোলা দরজা দিয়া কে ঘরে ঢুকিল। অপু যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতেই পারিল না, তাহার পরই বলিয়া উঠিল-এ কি, বাঃ—কখন—

লীলা কৌতুক ও হাসিভরা চোখে দাঁড়াইয়া। অপু বলিল-বাঃ, বেশ তো তুমি। বলে গেলে সোমবারে আসবো কলকাতা থেকে, কত সোমবার হয়ে গেল-ফিরবার নামও নেই–

লীলা হাসিয়া মেজেতে বসিয়া পড়িল। বলিল-আসবো কি করে? স্কুলে ভর্তি হয়েচি, বাবা দিয়েছেন ভর্তি করে, বাবার শরীর খারাপ, এখন আমরা কলকাতার বাড়িতেই থাকবো কি না? এখন ক'দিন ছুটি আছে তাই মার সঙ্গে এলাম-আবার বুধবার যাবো।

অপুর মুখ হইতে হাসি মিলাইয়া গেল। বলিল-থাকবে না। আর তোমরা এখানে?

লীলা বলিল-বাবার শরীর ভালো হলে আবার আসবো–

পরে সে হাসিমুখে বলিল-চোখ বুজে থাকো তো একটু?

অপু বলিল-কেন?

–থাকো না?

অপু চক্ষু বুজিল ও সঙ্গে সঙ্গে হাতে কি একটা ভারী জিনিসের স্পর্শ অনুভব করিল। চোখ খুলিতেই লীলা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। একটা কার্ড বোর্ডের বাক্স তাহার কোলের উপর। বাক্সটা খুলিয়া ফেলিয়া লীলা দেখাইল ভালো দেশী ধুতি চাদর ও রাঙা সিল্কের একটা পাঞ্জাবি। লীলা হাসিমুখে বলিল-মা দিয়েছেন।–কেমন হয়েচে? তোমার পৈতের জন্যে–

ধুতি-চাদর বিশেষ করিয়া পাঞ্জাবিটা দরের জিনিস, ব্যবহার করা দূরের কথা। এ বাড়িতে পা দিবার পূর্বে অপু চক্ষেও কখনও দেখে নাই।

লীলা অপুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—এক মাসে তোমার মুখ বদলে গিয়েছে? আরও বড় দেখাচ্চে, দেখি নতুন বামুনের পৈতো?–তারপর কান বিঁধতে লাগলো না? আমার ছোট মামাতো ভাইয়েরও পৈতে হল কিনা, সে কেঁদে ফেলেছিল–

হঠাৎ অপু একখণ্ড 'মুকুল' দেখাইয়া বলিল-পড়েচো এ গল্পটা?

লীলা বলিল—কি দেখি?

অপু পড়িয়া শোনাইল। সমুদ্রের তলায় কোন স্থানে স্পেনদেশের এক ধনরত্নপূর্ণ জাহাজ দুই তিনশত বৎসর পূর্বে ডুবিয়া যায়-আজ পর্যন্ত অনেকে খোঁজ করিয়াছে, কেহ স্থানটা নির্ণয় করিতে পারে নাই। গল্পটা এইমাত্র পড়িয়া সে ভারি খুশি হইয়াছে।

বলিল-কেউ বার কর্তে পারেনি-কত টাকা আছে জানো? একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ-পঞ্চাশ লক্ষ পাউন্ডের সোনা-রুপো... এক পাউন্ডে তেরো টাকা-গুণ করো দিকি?* তাহার পরে সে তাড়াতাড়ি একটু কাগজে আঁকটা কষিয়া দেখাইয়া বলিল-এই দ্যাখো এত টাকা!...আগেও সে আঁকটা একবার কষিয়াছে। উজ্জ্বলমুখে বলিল-আমি বড় হলে যাবো-দেখবো গিয়ে-ঠিক বার করবো দেখো-কেউ সন্ধান পায়নি এখনও সেখেনে–

লীলা সন্দিগ্ধ হইয়া বলিল-তুমি যাবে? কোন জায়গায় আছে তুমি বার করবে কি করে?

-এই দ্যাখো লিখেচে 'পোর্তে প্লাতার সন্নিহিত সমুদ্র গর্ভে'-খুঁজে বার করবো।....

সে গল্পটি পড়িয়াই ভাবিয়াছে, ভালেই হইয়াছে কেহ বাহির করিতে পারে নাই। সবাই সব বাহির করিয়া লইলে তাহার জন্য কি থাকিবে? সে বড় হইয়া। তবে কি তুলিবে? এখন সে যাওয়া পর্যন্ত থাকিলে হয়!...

লীলার বয়স কম হইলেও খুব বুদ্ধিমতী। ভাবিয়া ভাবিয়া বলিল-ওদের মতো জাহাজ পাবে কোথায়? তোমার একখানা আলাদা জাহাজ চাই-ওদের মতন–

-সে হয়ে যাবে, কিনবো, বড় হলে আমার টাকা হবে না বুঝি?

এবার বোধ হয় লীলার অনেকটা বিশ্বাস হইল। সে এ লইয়া আর কোনও তর্ক উঠাইল না।

খানিকটা পরে বলিল-তুমি কলকাতা গিয়েচ?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল-আমি দেখিনি কখখনো-খুব বড় শহর?—এর চেয়ে বড়?

লীলা হাসিয়া বলিল—ঢের ঢের–

–কাশীর চেয়েও বড়?

–কাশী আমি দেখিনি—

তারপর সে অপুকে নিজের পড়ার ঘরে লইয়া আসিল। একখানা খাতা দেখাইয়া বলিল–দ্যাখো তো কেমন ফুলগাছ এঁকেচি, কি রকম ড্রইংটা?

অপু খানিকটা পরে বলিল-আমি শুইগে, মাথাটা বড় ধরেচে—

লীলা বলিল-দাঁড়াও আমি একটা মন্তর জানি মাথা-ধরা সারাবার-দেখি? পরে সে দুহাতের আঙুল দিয়া কপাল এমনভাবে টিপিয়া দিতে লাগিল যে অপু হাসিয়া উঠিয়া বলিল-উঃ বড় সুড়সুড়ি লাগচে।

লীলা হাসিয়া বলিল-আমার বড় মামাতো ভাইকে কুস্তি শেখায় একজন পালোয়ান আছে, তার কাছে শেখা-বেশ ভালো না? সেরেচে তো?

দিনকতক পরেই লীলারা পুনরায় কলিকাতায় চলিয়া গেল।

অপু মাকে বলিয়া কহিয়া একটা ছোট স্কুলে যায়। যে বড় রাস্তার ধারে ইঁহাদের বাড়ি, সেখান হইতে কিছুদূর গিয়া বঁ-ধারে ছোট গলির মধ্যে একতলা বাড়িতে স্কুল। জনপাঁচেক মাস্টার, ভাঙা বেঞ্চি, হাতল-ভাঙা চেয়ার, তেলকালি ওঠা ব্ল্যাকবোর্ড, পুরানো ম্যাপ খানকতক-ইহাই স্কুলের আসবাব। স্কুলের সামনেই খোলা ড্রেন, অপুদের ক্লাস হইতে জানালা দিয়া বাহিরে চাহিলে পাশের বাড়ির চুনবালির কাজ-বিরহিত নগ্ন ইটের দেওয়াল নজরে পড়ে। সে স্কুলে যাইতে যাইতে দেখে ধাঙড়ে ড্রেন সাফ করিতে করিতে চলিয়াছে, স্থানে স্থানে ময়লা জড়ো করা। সারাদিন স্কুলের মধ্যে কেমন একটা বদ্ধ বাতাসের গন্ধ, পাশের এক হিন্দুস্থানী ভুজাওয়ালা দুপুরের পর কয়লার আঁচ দেয়, কাঁচা কয়লার ধোঁয়ার মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বাহির হয়, অপুর মাথার মধ্যে কেমন করে, স্কুলের বাহিরে আসিয়া যেন সেটা কাটিতে চায় না।

তাহার ভালো লাগে না, মোটেই ভালো লাগে না, শহরের এই সব ইট-সিমেন্টের কাণ্ড-কারখানায় তাহার হাঁফ ধরে, কেমন যেন দম আটকাইয়া আসে। কিসের অভাবে প্রাণটা যেন আকুলি-বিকুলি করে, সে বুঝিতে পারে না কিসের অভাবে।

পথে ঘাস খুব কম, গাছপালা বেশি নাই, দু' একটা এখানে ওখানে। সুরকির পথ, পাকা ড্রেন, দুই বাড়ির মাঝখানের ফাঁকে আবর্জনা, ময়লা জল, ছেঁড়া কাপড়, কাগজ। একদিন সে এক সহপাঠীর সঙ্গে তাহদের বাড়িতে গিয়াছিল। একতলা খোলার ঘর। অপরিসর উঠানের চারিধারের ঘরগুলিতে এক-একঘর গৃহস্থ ভাড়াটে থাকে। দোরের গায়ে পুরানো চটের পর্দা। ঘরের মেঝে উঠান হইতে বিঘাতের বেশি উঁচু নয়, কাজেই আদ্রতা কাটে না। ঘরের মধ্যে আলো-হাওয়ার বালাই নাই। উঠান বিশ্রী নোংরা, সকল গৃহস্থই একসঙ্গে কয়লার আঁচ দিয়াছে, আবার সেই মিষ্টি মিষ্টি গন্ধটা। সবসুদ্ধ মিলিয়া অপুর অত্যন্ত খারাপ লাগে, মন যেন ছোট এতটুকু হইয়া যায়, সেদিন তাহরা উহাকে বসিতে বলিলেও সে বেশিক্ষণ থাকিতে পারে নাই, সদর রাস্তায় আসিয়া তবুও অনেকটা স্বস্তি বোধ করিয়াছিল।

বাড়ি ফিরিয়াও সেই বদ্ধতা। বরং যেন আরও বেশি। এখানে ইট-সিমেন্ট আর মার্বেল পাথরে চারিধার মায় উঠান পর্যন্ত বাঁধানো। অপু মাটি দেখিতে না পাইলে থাকিতে পারে না, এখানে যা মাটি আছে, তাও যেন অন্যরকম। যে মাটির সঙ্গে তার পরিচয় এ যেন সে মাটি নয়। তাহা ছাড়া ইহাদের বাড়ি চলিবার ফিরিবার স্বাধীনতা কই? থাকিতে হয় ভয়ে ভয়ে চোরের মতো। কে কি বলিবে, উঁচু গলায় কথা কওয়া যায় না, ভয় করে।

এক-একদিন অপু দপ্তরখানায় গিয়া দেখিয়াছে বুড়ো খাতাঞ্জি একটা লোহার সিক বসানো খাঁচার মতো ঘরে অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া থাকে। অনেকগুলি খেরো বাঁধানো হিসাবের খাতা একদিকে স্তূপীকৃত করা। ছোট্ট কাঠের হাতবাক্স সামনে করিয়া বুড়া সারাদিন ঠায় একটা ময়লা চিট তাকিয়া হেলান দিয়া আছে। ঘরে এত অন্ধকার যে, দিনমানেও মাঝে মাঝে ছোট্ট একটা রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলে। গিরিশ গোমস্ত জমা-সেরেস্তায় বসে। নিচু তক্তাপোশের উপর ময়লা চাদর পাতা-চারিধারে দু' কোণে কাপড়ে বাধা রাশি রাশি দপ্তর। সে ঘরটা খাতাঞ্জিখানার মতো অত অন্ধকার নয়, দু' তিনটি বড় বড় জানালাও আছে, কিন্তু তক্তপোশের নিচে রাশীকৃত তামাকের গুল ও ছেড়া কাগজ এবং কড়িকাঠে মাকড়সার জাল ও কেরোসিন আলোর ঝুল। যখন বীরু মুকুরি হ্যাঁকিয়া বলে-ওহে রামদায়াল, দেখো তো গত তৌজিতে বাদ্যকর খাতে কত খরচ লেখা আছে?... তখনই কি জানি কেন অপুর মনে দারুণ বিতৃষ্ণা আবার জাগিয়া উঠে।

সকালবেলা। অপু দেউড়ির কাছটায় আসিয়া দেখিল বাড়ির ছেলেরা চেয়ার-গাড়িটা ঠেলিয়া খেলিতেছে। গাড়িটা নূতন তৈয়ারি হইয়া আসিয়াছে, ডাণ্ডালাগানো লোহার চেয়ার, উপরে চামড়ার গদি, বড় বড় চাকা-ঝকঝকে দেখিতে। সে কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, রমেন বলিল-এই এসে ঠেল তো একবার আমাদের–

এই গাড়িটা আসা অবধি অপুর মনে মনে ইহার উপর লোভ আছে, খুশি হইয়া বলিল–ঠেলচি, আমায় একবার চড়তে দেবেন তো?

রমেন বলল-আচ্ছা হবে, ঠেল। তো-খুব জোরে দিবি—

খুব খানিকক্ষণ খেলা হইবার পর রমেন হঠাৎ বলিল-আচ্ছা খুব হয়েচে এবেলা-থায় আর নয়–

পরে গাড়ি লইয়া সকলে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া অপু বলিল-আমি এটু চড়বো না?

রমেন বলিল-আচ্ছা যা যা, এ কেলা আর চড়ে না, বেশি চড়লে আবার ভেঙে যাবে-দেখা যাবে ওবেলা–

ক্ষোভে অপুর চোখে জল আসিল। সে এতক্ষণ ধরিয়া আশায় আশায় ইহাদের সকলকে প্রাণপণে ঠেলিয়াছে।

বলিল-বা, আপনি যে বল্লেন আমাকে একবার চড়তে দেবেন আমার পালায়? আমি সকলকে ঠেললাম-বেশ তো! সেদিনও ওইরকমই চড়ালেন না শেষকালে–

রমেন বলিল-ঠেললি কেন তুই, না ঠেলিলেই পাত্তিস-যা-কে বলেচে তোকে চড়তে দেবে? গাড়ি কিনতে পয়সা লাগে না?

সে বলিল-কেন আপনিও বল্লেন, ওই সন্তুও তো বল্লে-ঠেলে ঠেলে আমার হাত গিয়েছে।–আর আমি বুঝি একবারটি-বেশ তো আপনি—

রমেন গরম হইয়া বলিল-আমি বলিনি। যা—

সন্তু বলিল-ফু-র্-র্-র্,-বক দেখেচ?

কোনও কিছু না, হঠাৎ বড়বাবুর ছেলে টেবু আসিয়া তাহার গলায় হাত দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে বলিল—যা যা—আমরা চড়াবো না আমাদের খুশি—তোর নিজের ঘরের দিকে যা–এদিকে আসিস কেন খেলতে?

টেবু অপুর অপেক্ষা বয়সে ছোট বলিয়া তাহার কৃত অপমানের দরুনই হউক বা সকলের ঠাট্টা বিদ্রুপের জন্যই হউক–অপুর মাথা কেমন বেঠিক হইয়া গেল-সে বাঁকুনি দিয়া ঘাড় ছিনাইয়া লইয়া টেবুকে এক ধাক্কা মারিতেই টেবু ঘুরিয়া গিয়া দেওয়ালের উপর পড়িয়া গেল-কপালটা দেওয়ালে লাগিয়া খানিকটা কাটিয়া রক্তপাত হইতে টেবু সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ঝি-চাকর ছুটিয়া আসিল, খানসামা দারোয়ান ছুটিয়া আসিল—উপরের বৈঠকখানায় বড়বাবু সকালবেলা কাছারি করিতেছিলেন, তিনি সদলবলে নিচে নামিয়া আসিলেন। দশ দিক হইতে দশ ঘটি জল…বাতাস…জলপটি, হৈ হৈ কাণ্ড।

গোলমাল একটু কমিলে বড়বাবু বলিলেন–কই, কে মেরেচে দেখি?

রামনিহোরা সিং দারোয়ান পিছন হইতে ঠেলিয়া অপুকে বড়বাবুর সামনে দাঁড় করাইয়া দিল।

বড়বাবু বলিলেন—এ কে? ওই সেই কাশীর বামুনঠাকরুনের ছেলে না?

গিরিশ সরকার আগাইয়া আসিয়া বলিল-ভারি বদ ছোকরা—আবার জ্যাঠামি ওর যদি শোনেন বাবু, সেই সেবার থিয়েটারের দিন, বসেচে একেবারে সকলের মুখের সামনে বাবুদের জায়গায়, সরে বসতে বলেচি, মুখোমুখি তর্ক কি? সেদিন আবার দেখি ওই শেঠেদের বাড়ির মোড়ে রাস্তায় একটা লাল পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে বার্ডসাই খেতে খেতে আসচে–এই বয়সেই তৈরি–

বড়বাবু রমেনকে বলিলেন–সকলে আজ তোমাদের মাস্টার আসেনি? পড়াশুনো ছিল না? এই, আমার বেতের ছড়িটা নিয়ে এসো তো কেউ? ওর সঙ্গে মিশে খেলা কর্তে কে বলে দিয়েচে তোমাদের?

রমেন কঁদো কঁদো মুখে বলিল-ও-ই তো আমাদের খেলার সময় আসে, আমরা কেন যাবো, জিজ্ঞেস করুন, বরং সন্তুকে-আপনার সেই ছবিওয়ালা ইংরাজি ম্যাগাজিনগুলোর ছবি দেখতে চায়-আবার বড় বৈঠকখানায় ঢুকে এটা সেটা নেড়েচেড়ে দেখে–

গিরিশ সরকার বলিল-দেখুন, শখটা দেখুন আবার—

এবার অপুর পালা। বড়বাবু বলিলেন।–সরে এসে এদিকে-টেবুকে মেরেছ কেন?

ভয়ে অপুর প্রাণ ইতিপূর্বেই উড়িয়া গিয়াছিল, সে রাগের মাথায় ধাক্কা দিয়াছিল বটে। কিন্তু এত কাণ্ডের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে আড়ষ্ট জিহ্বা দ্বারা অতি কষ্টে উচ্চারণ করিল-টেবু আমাকে আগে তো—আমাকে–

বড়বাবু কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন-টেবুর বয়স কত আর তোমার বয়স কত জানো?

গুছাইয়া বলিতে জানিলে অপুর পক্ষ হইতেও একথা বলা চলিত যে টেবুর বয়স কিছু কম হইলেও কার্যে সে অপুর জেঠামশাই নীলমণি রায় অপেক্ষাও পাকা। বলা চলিতে পারিত যে, টেবু ও এ-বাড়ির সব ছেলেই বিনা কারণে যখন তখন তাহাকে বাঙাল বলিয়া খোপায়, বক দেখায়, পিছন হইতে মাথায় ঠোকর মারে-সে না হয় একটু খেলা করিতে যায়। এই তো তাহার অপরাধ। কিন্তু উঠানভরা লোকারণ্যের কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে বিশেষ করিয়া বড়বাবুর সঙ্গে কথা কহিতে জিহ্বা তাহার তালুর সঙ্গে জুড়িয়া গিয়াছিল-সে শুধু বলিল-টেবুও-আমাকে-শুধু শুধু-আমাকে এসে–

বড়বাবু গর্জন করিয়া বলিলেন-স্টুপিড, ডেঁপো ছোকরা-কে তোমাকে বলে দিয়েচে এদিকে এসে ওদের সঙ্গে মিশতে-এই দাও তো বেতোটা-এগিয়ে এসো-এসো–

সপাং করিয়া এক ঘা সজোরে পিঠে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সে কেমন বিস্ময়ের চোখে বড়বাবু ও তাঁহার পুনর্বার উদ্যত বেতের ছড়িটার দিকে চাহিল-জীবনে সে কখনও ইহার পূর্বে মার খায় নাই, বাবার কাছেও নয়।–তাহার বিভ্রান্ত মন যেন প্রথমটা প্রহার খাওয়ার সত্যটাকে গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না-পরে সে কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই বেতোটা ঠেকাইবার জন্য হাত দুখানা উঠাইল। কিন্তু এবার আর তাহার দুঃখ করিবার কিছু রহিল না যে, সে তাহার পালার বেলা ফাঁকে পড়িল। বেতের সপাসপ শব্দে টেবুকেও কপালের ব্যথা ভুলিয়া চাহিয়া দেখিতে হইল। রাঁধুনীর ছেলের যাহাতে স্পর্ধা আর না হয়, বড়বাবু এ বিষয়ে তাহাকে সুশিক্ষাই দিলেন। অন্য বেত হইলে ভাঙিয়া যাইত, এ বেতটা বোধ হয় খুব দামি।

বড়বাবু হাঁপ জিরাইয়া লইয়া বলিলেন-বুড়ো ধাড়ি বয়াটে ছোকরা কোথাকার, আজ তোমাকে সাবধান করে দিচ্চি, ফের যদি শুনি এ বাড়ির কোনো ছেলের সঙ্গে মিশেচ, কান ধরে তক্ষুনি বাড়ি থেকে বিদেয করে দেবো-পরে কাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন-দেখুন না ধীরেনবাবু, বিধবা মা, সতীশবাবু ম্যানেজার কাশী থেকে আনলেন, ভাবলাম জাতের মেয়ে থাকুক-দেখুন কাণ্ড, মা ভাত রাঁধে-উনি পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে সিগারেট খেয়ে বেড়ান–

ধীবেনবাবু বলিলেন-ওসব ওই রকমই হয়ে থাকে-এরপর কোকেন খাবে-মা’র বাক্স ভাঙবে-ওর নিয়মই ওই-তার ওপর আবার কাশীর ছেলে–

বাড়ির মধ্যে সব কথা গিয়া পৌঁছায় না, অপুর মার খাওয়ার কথা কিন্তু সর্বজয়া শুনিল। একটু ভালো করিয়াই শুনিল। গৃহিণী বলিলেন-ওরকম যদি গুণ্ডে ছেলে হয় তা হলে বাছা-ইত্যাদি।

রুটির ঘর হইতে আসিয়া দেখিল অপু স্কুলে গিয়াছে, মাকে কিছু বলে নাই, এসব কথা সে কখনও মাকে বলেও না। রাগে দুঃখে, ক্ষোভে সর্বজয়ার গা ঝিম ঝিম করিতে লাগিল, সর্বাঙ্গ হইতে যেন ঝাল বাহির হইতে থাকিল, ঘরে না থাকিতে পারিয়া সে বাহিরের অপরিসর বারান্দাটাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহার অপুর গায়ে হাত! সে যে এখনও বলে, মা সিঁড়ির ঘর দিয়ে যখন তুমি রান্নাবাড়ি থেকে আসবে তখন রাত্রে তোমায় একদিন এমন ভয় দেখাবো?...তাহার কি কোনো বুদ্ধি আছে? কত লাগিয়াছিল, কে তাহাকে বুঝিয়াছে সেখানে, কে শুনিয়াছে তাহার কান্না?

সর্বজয়ার বুক ফাটিয়া কান্না আসিল।....

অন্ধকার রাত, আকাশে দু’একটা তারা জ্বল জ্বল করে-আস্তাবলের মাথায় আমলকি গাছের ডালে বাতাস বাধে, দালানের কোণের লোহার ফুটা চৌবাচ্চার পাশে বসিয়া কথাটা ভাবিতে ভাবিতে কান্নার বেগে তাহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল–

-ঠাকুর, ঠাকুর, ও আমার বড় আদরের ধন, তুমি তো জানো ও একদণ্ড চোখের আড়াল থেকে সরলে আমি স্থির থাকতে পারি নে, যা কিছু শাস্তি দেবার আমার ওপর দিয়ে দাও, ঠাকুর ওকে কিছু বোলো না, আমার বুক ফেটে যায় ঠাকুর, তা আমি সইতে পারবো না—

সকাল সকাল অপুদের স্কুলের ছুটি হইয়া গেল। তাহার ক্লাসের ছেলেরা ধরিলে তাহদের ফুটবল খেলায় অপুকে রেফারি হইতে হইবে। অপু ভারি খুশি হইল, ফুটবল খেলা সে এ শহরে আসিবার পূর্বে কোনোদিন দেখে নাই, সে খুব ভালো খেলিতেও পারে না, তবুও কিন্তু ক্লাসের ছেলেরা তাহাকেই সকলের চেয়ে পছন্দ করে, খেলায় রেফারি হইতে প্রায়ই তাহার ডাক পড়ে।

সে বলিল-সেই বড় হুইসিলটা বাড়ি থেকে নিয়ে আসি ভাই, বাক্সে পড়ে রয়েচে, আমি ঠিক চারটের সময় মাঠে যাবো এখন–

পথে আসিতে আসিতে অপুর সকালের কথাটা মনে উঠিল। আজ সারা দিনটাই সে সে-কথা ভাবিয়াছে। বার্ডসাই খাইতে গিয়া সেদিন গিরিশ সরকারের সামনে পড়িয়া গিয়াছিল একথা ঠিক কিন্তু বার্ডসাই কি সে রোজ খায়? সেদিন মেজ বৌরানীর দেওয়া রাঙা পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়া স্কুল হইতে ফিরিবার-পথে তাহার হঠাৎ শখ হইয়াছিল, এই রকম পাঞ্জাবি গায়ে দিয়া বাবুরা বার্ডসাই খায়, সেও একবার খাইবে। তাই খাবারের পয়সাটায় বার্ডসাই কিনিয়া সে ধরাইয়া খাইতেছিল, কিন্তু সেই একদিন নিশ্চিন্দিপুরে লুকাইয়া খাইতে গিয়াও ভালো লাগে নাই, সেদিনও লাগিল না। তাহার মনে হইয়াছিল-দূর! এ না কিনে এক পয়সার ছোলাভাজা কিনলে বেশ হত! এ যে কেন লোকে কিনে খায়, কিন্তু গিরিশ সরকার না জানিয়া-শুনিয়া তাহাকে যা-তা বলিল কেন?

ভাগ্যিস লীলা এখানে নাই। থাকিলে সে দেখিলে বড় লজ্জার কথা হইত।মাও বোধ হয় টের পায় নাই। পাছে মা টের পায় এই জন্যই তো সে ওবেলা তাড়াতাড়ি স্কুলে চলিয়া আসিয়াছিল!

লীলা কতদিন এখানে আসে নাই! সেই আর বছর গিয়াছে আর আসে নাই। এখন আসিলেই কি আর উহারা তাহার সহিত কথা কহিতে দিবে?

বাড়ি ফিরিতেই দেউড়ির কাছটায় আসিয়া শুনিল উপরের বৈঠকখানায় কলের গান হইতেছে। শব্দটা কানে যাইতেই সে খুশি-ভরা উৎসুক চোখে মুখ উঁচু করিয়া দোতলার জানলার নিচে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া গেল। রাস্তা হইতে গানের কথা সব ভালো বোঝা যায় না। কিন্তু সুরটি ভারি চমৎকার, শুনিতে শুনিতে-স্কুল, খেলা, রেফারিগিরি, ওবেলা মারা-খাওয়া, মন হইতে সব একেবারে মুছিয়া গেল।

গানের সুরে তাহার মনটা আপনা-আপনি কোথায় উড়িয়া যায়-সেই তখন তখন নিশ্চিন্দিপুরের নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়া কতদিন দেখিত, ওপারে উলুখড়েব মাঠে ছোট রাঙা ফুলে-ভরা শিমুল চারা, তাহাদের পিছনে কত দূরে নীল আকাশের পট-খড়ের মাঠ যেন আঁকা, রাঙা-ফুল শিমুলচারা যেন আঁকা, শুকনো ডালে কি পাখি বসিয়া থাকিত-সব যেন আঁকা। তাঁহাদের সকলের পিছনে সেই দেশটা, ব-হু-উ-দূরের দেশটা-কোন দেশ তাহার জানা নাই, মাত্র মনের খুশিতে সেটা ধরা দিত।

কে যেন ডাকে, কতদূর হইতে উচ্ছ্বসিত আনন্দভরা পরিচিত সুরের ডাক আসে-অপু-উ-উ-উ-উ—

মন খুশিতে ভরিয়া উঠিয়া সাড়া দেয়-যা—আ-আ-ই-ই-ই-

তাহদের ছোট ঘরটাতে ফিরিতে তাহার মা জিজ্ঞাসা করিল–সকাল সকাল এলি যে?

সে বলিল-ওপর ক্লাসের ছেলেরা বল খেলায় জিতেছে তাই হাফ স্কুল—

তাহার মা বলিল-আয় বোস এখানে। খানিকক্ষণ পরে গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে একটু ইতস্তত করিয়া বলিল-আজ তোকে ওরা কি জন্যে নাকি ডেকে নিয়ে গিয়ে নাকি-বকেচে?

–নাঃ, ওই টেবুর একটুখানি লেগেচে। তাই বড় বাবু ডেকে বলছিলেন কি হয়েচে-তাই-

-বকে-টকে নি তো?

–নাঃ–

তাহার মা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল-একটা কথা ভাবচি, এখান থেকে চলে যাবি?

সে আশ্চর্য হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিল। পরে হঠাৎ খুশি হইয়া বলিয়া উঠিল–কোথায়

মা, নিশ্চিন্দিপুর? সেই বেশ তো, চলো, আমি সেখানে ঠাকুর-পূজো করবো-পৈতেটা তো হয়ে গিয়েচে-নিজেদের দেশ, বেশ হবে-এখানে আর থাকবো না–

সর্বজয়া বলিল-সে কথাও তো ভাবচি আজি দু'বছর। সেখানে যাবি বলচিস, কি আর আছে বল দিকি সেখানে? এক বাড়িখানা, তাও আজ তিন বছর বর্ষার জল পাচ্চে, তার কিছু কি আছে অ্যাদ্দিন? মান্ধাতার আমলের পুরোনো বাড়ি-ছিল একটু ধানের জমি, তাও তো-গিয়ে মাথা গোঁজবার জায়গাটুকু নেই-শত্তুর হাসাতে যাওয়া… খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—একটা কাজ কল্লে হয়, চল বরং-আচ্ছা কাশী যাবি?

বিশেষ কিছু ঠিক হইল না। তাহার মায়ের তখনও খাওয়া হয় নাই। স্নান সারিয়া পুনরায় রান্নাবাড়ি চলিয়া গেল। অপুর একটা কথা মনে হইল। তাহার গানের গলা আছে, দিদি বলিত, যাত্রাদলের বন্ধুও সেবার বলিয়াছিল। সে যদি কোনো যাত্রাদলে যায়, তাহাকে নেয় না? এখানে মা'র বড় কষ্ট। এখান হইতে সে মাকে লইয়া যাইবে!

উঃ কি গরম! রান্নাবাড়ির নলের মুখে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছে, কার্নিসের গায়ে রোদ, ঘরের ভিতরটা এরই মধ্যে অন্ধকার, আস্তাবলে মাতাবিয়া সহিস কি হিন্দি বুলি বলিতেছে. পাথর-বাঁধানো মেজেতে ঘোড়ার খুর ঠুকিবার খট্‌ খট্‌ আওয়াজ, ড্রেনের সেই গন্ধ… তাহার মাথাটা এমন ধরিয়াছে যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছে। সে ভাবিল … এখন একটু শুয়ে নিই, এরপর উঠে খেলার মাঠে যাবো–মোটে তিনটে বেজেছে-এখন বড় রোদটা।

বিছানায় শুইয়া একটা কথাই বার বার তাহার মনে আসিতে লাগিল। এ কথাটা এতদিন এভাবে সে ভাবিয়া দেখে নাই। এতদিন যেন তাহার মনের কোন কোণে সব সময়ই স্পষ্টভাবে জাগিয়া থাকিত যে, এ সবের শেষে যেন তাহদের গ্রাম অপেক্ষা করিয়া আছে–তাহদের জন্য! যদিও সেখান হইতে চলিয়া আসিবার সময় ফিরিবার কোনো কথাই ছিল না-সে জানে, তবুও এ মোহটুকু তার একেবারে কাটে নাই।

কিন্তু আজকার সমুদয় ব্যাপারে বিশেষ করিয়া মাযেব ও বড়বাবুব কথায় তাহাদের নিরাশ্রয়তা ও গৃহহীনতার দিকটা তাহার কাছে বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। আর কি কখনও সে তাহাদের গায়ে ফিরিতে পাইবে না?–কখনও না?–কখনও না?

এই বিদেশ, এই গিরিশ সরকার, এই চোর হইয়া থাকা-না হয় মায়ে ছেলে হাত ধরিয়া ছন্নছাড়া পথে পথে চিরকাল-এরাই কি কায়েম হইতে আসিয়াছে?

আস্তাবলে দুই সহিসে বাগড়া বাধাইয়াছে, রান্নাবাড়ির ছাদে কাকের দল ভাতের লোভে দলে দলে জুটিতেছে-একটু পরে তাহার মনে হইল, একই কি কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতেছে, একই কি কথা। আস্তাবলে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ থামে নাই.. সে যেন মাটির ভিতর কোথায় সেঁধিয়া যাইতেছে… খুব, খুব মাটির ভিতর. নিচের দিকে কে যেন টানিতেছে… বেশ আরাম…মাথা ধরা নাই, বেশ আরাম…

উঃ—কি রোদটাই ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে! দিদির যা কাণ্ড—এত রোদ্দুরে চড়ুইভাতি! সে বলিতেছে—দিদি শুয়ে নে, এত রোদ্দুরে চড়ুইভাতি?

রানুদি কানের কাছে বসিয়া কি সব কথা, অনেক কি সব কথা বলিয়া যাইতেছে। রানুদির ছলছল ডাগর চোখ দুটি অভিমান-ভরা! সে কি করিবে? নিশ্চিন্দিপুরে তাদের চলে না যে? রানুদি না লীলা?

হারান কাকা বাঁশের বাঁশি বেচিবার জন্য আনিয়া বাজাইতেছে…ভারি চমৎকার বাজায়! সে বাবাকে বলিল—এক পয়সার বাঁশের বাঁশি কিনবো বাবা, একটা পয়সা দেবে?…

তাহার বাবা তাহার বড় বড় চুল কানের পাশে তুলিয়া দিতে দিতে আদর করিয়া বলিতেছে–বেশ হয়েচে তোর গল্পটা, ছাপিয়ে এলে আমায় দেখতে দিস খোকা?

সে বলিতেছে-কোকেন কি বাবা? গিরিশ সরকার বলেচে। আমি নাকি কোকেন খাবো—

বাবার গলায় পদ্মবীজের মালা। সেই কথকঠাকুরের মতো।

তাহদের মাঝেরপাড়ার ইস্টিশন। কাঠের বড় তক্তাটায় লেখা আছে, মা-ঝে-র-পা-ড়া। সে আগে আগে ভারী বোঁচকাটা পিঠে, মা পিছনে পিছনে। তাহার গায়ে রাঙা পাঞ্জাবিটা। কেমন ছায়া সারাপথে। আকাশে সন্ধ্যাতারা উঠিয়াছে। পাকা বটফলের গন্ধে-ভরা বাতাসটা।

নিশ্চিন্দিপুরের পথ যেন ফুরাইতেছে না…সে চলিয়াছে…চলিয়াছে..চলিয়াছে…সে আর মা…এ পথে একা কখনও আসে নাই, পথ সে চিনিতে পারিতেছে না…ও কাস্তে হাতে কাকা, শুনচো, নিশ্চিন্দিপুরের পথটা এটু বলে দ্যাও না আমাদের? যশড়া-নিশ্চিন্দিপুর, বেত্রবতীর ওপারে?

তাহার মা ঘরে ঢুকিয়া বলিল-হ্যাঁরে ওঠ, ও অপু, বেলা যে আর নেই, বললি যে কোথায় খেলতে যাবি?-ওঠ-ওঠ।

সে মায়ের ডাকে ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া চারিদিকে চাহিল-উঃ কি বেলাই গিয়াছো… রোদ একেবারে কোথায় উঠিয়া গিয়াছে? তাহার মা বলিল-বললি যে কোথায় খেলতে যাবি, তা গেলি কই? অবেলায় পড়ে পড়ে কি ঘুমটাই দিলি? দেবো তোর সেই বাঁশিটা বের করে?

তোরঙ্গ হইতে বাহির করিয়া বাঁশিটি মা বিছানার কোণে রাখিয়া দিল বটে, সে কিন্তু রেফারিগিরি করিতে যাওয়ার কোনো উৎসাহ দেখাইল না। ঘরের ভিতর এরই মধ্যে অন্ধকার! উঠিয়া আসিয়া জানালার কাছে অন্যমনস্কভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। বেলা একেবারে নাই। এক অসহ্য গুমোট! আস্তাবলের ড্রেনের গন্ধটা যেন আরও বাড়িয়াছে। ফটকের পেটাঘাঁড়িতে ঠং ঠাং করিয়া বোধ হয় ছটা বাজাইতেছে।

ওই আস্তাবলের মাথাব্য যে আকাশটা, ওরই ওপারে পূর্বদিকে বহুদূরে তাঁহাদের নিশ্চিন্দিপুর।

আজ কতদিন সে নিশ্চিন্দিপুর দেখে নাই-তি-ন বৎসর! কতকাল!

সে জানে নিশ্চিন্দিপুর তাহাকে দিন রাতে সব সময় ডাকে, শাঁখারিপুকুর ডাক দেয়, বাঁশবনটা ডাক দেয়, সোনাডাঙার মাঠ ডাক দেয়, কদমতলার সায়েবের ঘাট ডাক দেয়, দেবী বিশালাক্ষী ডাক দেয়।

পোড়ো ভিটার মিষ্ট লেবু ফুলের গন্ধে সজনেতলার ছায়ায় ছায়ায় আবার কবে গতিবিধি? আবার কবে তাহদের বাড়ির ধারের শিরীষ সৌদালি বনে পাখির ডাক?

এতদিনে তাহদের সেখানে ইছামতীতে বর্ষার ঢল নামিয়াছে। ঘাটের পথে শিমুল তলায় জল উঠিয়াছে। ঝোপে ঝোপে নাটা-কাঁটা, বনকলমির ফুল ধরিয়াছে। বন অপরাজিতার নীল ফুলে বনের মাথা ছাওয়া।

তাহাদের গ্রামের ঘাটটাতে কুঁচ-ঝোপের পাশে রাজুকাকা হয়তো এতক্ষণে তাহার অভ্যাসমতো

মাছ ধরিবার দোয়াড়ি পাতিয়াছে, আজ সেখানকার হাট-বার, ঠাকুরঝি-পুকুরের সেই বটগাছটার পিছনে দিগন্তের কোলে রাঙা আগুনে, এফনার মতো সূর্য অস্ত যাইতেছে, আর তাহারই তলাকার মেঠোপথ বাহিয়া গ্রামের ছেলে পটু, নীলু, তিনু, ভোলা সব হাট করিয়া ফিরিতেছে।

এতক্ষণে তাদের বনে-ঘেরা বাড়িটার উঠানটাতে ঘন ছায়া পড়িয়া আসিতেছে, কিচ্ কিচ্ করিয়া পাখি ডাকিতেছে, সেই মিষ্ট নিঃশব্দ শান্ত বৈকাল-সেই হলদে পাখিটা আজও আসিয়া পাচিলের উপরের কঞ্চির ডালটাতে সেই রকমই বসে, মায়ের হাতে পোতা লেবুচারাটাতে হয়তো এতদিনে লেবু ফলিতেছে।.

আরও কিছুক্ষণ পরে তাহাদের সে ভিটায় সন্ধ্যার অন্ধকার হইয়া যাইবে, কিন্তু সে সন্ধ্যায় সেখানে কেহ সঁজ জ্বলিবে না, প্রদীপ দেখাইবে না, রূপকথা বলিবে না। জনহীন ভিটার উঠানভরা কালমেঘের জঙ্গলে ঝিঝি পোকা ডাকিবে, গভীর রাত্রে পিছনের ঘন বনে জগড়ুমুর গাছে লক্ষ্মীপেচার রব শোনা যাইবে…কেহ কোনোদিন সেদিক মাড়াইবে না, গভীর জঙ্গলে চাপা-পড়া মায়ের সে লেবুগাছটার সন্ধান কেহ কোনোদিন জানিবে না, ওড়া-কলমির ফুল ফুটিয়া আপনাআপনি ঝরিয়া পড়িবে, কুল নোনা মিথ্যাই পাকিবে, হলদে।-ডানা তেড়ো পাখিটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিবে।

বনের ধারে সে অপূর্ব মায়াময় বৈকালগুলি মিছামিছিই নামিবে চিরদিন।

ওবেলা এক উঠান লোকের সম্মুখে বিনাবিচারে মারা খাইয়াও তাহার চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল বাহির হয় নাই, কিন্তু এখন নির্জন ঘরের জানালোটাতে এক-একা দাঁড়াইয়া হঠাৎ সে কাঁদিয়া আকুল হইল, উচ্ছ্বসিত চোখের জল ঝর-ঝর করিয়া পড়িয়া তাহার সুন্দর কপোল ভাসাঁইয়া দিতেই চোখ মুছিতে হাত উঠাইয়া আকুল সুরে মনে মনে বলিল-আমাদের যেন নিশ্চিন্দিপুর ফেরা হয়ভগবান-তুমি এই কোরো, ঠিক যেন নিশ্চিন্দিপুর যাওয়া হয়-নইলে বাঁচবো না-পায়ে পড়ি তোমার–

পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন-মুর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলায় কি ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায়? তোমাদের সোনাডাঙা মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতী পার হয়ে, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বোত্রাবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে, পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে, শুধুই সামনে…দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে, সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে, জানার গণ্ডী এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশে…

দিন রাত্রি পার হয়ে, জন্ম মরণ পার হয়ে, মাস, বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে চলে যায়… তোমাদের মর্মর জীবন-স্বপ্ন শ্যাওলা-ছাতার দলে ভরে আসে, পথ আমার তখনও ফুরোয় না…চলে…চলে…চলে…এগিয়েই চলে…

অনির্বাণ তার বীণা শোনে শুধু অন্যন্ত কাল আর অনন্ত আকাশ….

সে পথের বিচিত্র আনন্দ-যাত্রার অদৃশ্য তিলক তোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায় ঘরছাড়া করে এনেছি!…

চল এগিয়ে যাই।